# ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ

স্নানযাত্রা, ১৩৭২

প্রকাশক : রণজিৎ সাহা, নবভারত পাবলিশার্স, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : আর. সাহা, প্যারট প্রেস, ৭৬/২ বিধান সরণী, ( ব্লক কে-ওয়ান ) কলিকাতা-৬

# প্রস্তাবনা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে—সংঘমধ্যে যিনি প্রায়শঃ 'মহারাজ' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন—আমি দর্শন করি বাগবাজারে শ্রীবলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর পূর্বকার পৌষমাসের এক সকালে। বড়দিনের ছুটি তখন। তিনি শিশুদের সাথে ক্রীড়ারত ছিলেন, এবং আমরা চারিপাঁচ জন যাইয়া উপস্থিত হইবামাত্র আমাদের দিকে ঘুরিয়া কয়েক পা আগাইয়া আসিয়াছিলেন। অপরের কথা বলিতে পারি না, আমার মনে আছে প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র তিনি নীরবে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়াছিলেন। তাঁহার কথা অনেক শুনিবার জানিবার পর মনে হইয়াছে, ঐ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে তিনি আমার ভিতরবাহির, এমনকি জন্মান্তরীণ সংস্কাররাশিকেও দেখিয়া নিতেছিলেন। এই নগণ্য বালক একদিন লেখনীমুখে তাঁহার লীলাকথা বলিবার দুঃসাহস করিবে—ইহাও তিনি ঐকালে দেখিতে পাইয়াছিলেন কি ?

জনৈক ভক্ত তাঁহাকে অনেকবার দর্শন করিয়াছে শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, একবার দেখলেই হল। তাঁহার এই আশ্বাসবাণী আমার একমাত্র ভরসা।

প্রথমতঃ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর (১৯৩৭), ও ইহার অনেককাল পরে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের (১৯৫৫) জীবনকথা গ্রথিত করিবার পর, আর কখনো বই লিখিতে কলম ধরিব না, মনে এইরূপ সংকল্পের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু ঘটনাচক্র আমাকে সংকল্পে স্থির থাকিতে দিল না। ভুল বুঝিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু আমি ইহাকে ভগবদিচ্ছা বলিয়াই মানিয়া লইয়াছি। আর ইহাতে খুবই লাভবান হইয়াছি বলিয়াও মনে হইয়াছে। আরো মনে হইয়াছে যে, দুরবগাহ শ্রীরামকৃষ্ণলীলার রসমাধুরীর চাতুরী ধরিতে বুঝিতে হইলে 'ব্রজের রাখালে'র চরিতানুধ্যান অপরিহরণীয়।

তাঁহার লীলাকথা সংকলনের আহ্বান আগেও একবার আসিয়াছিল 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী' প্রকাশিত হওয়ার সমকালেই। ঐ কার্য আমার পক্ষে অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় তখন উহাতে কর্ণপাত করি নাই। কে জানিত যে, আমার বিপর্যস্ত জীবনের শেষ অঙ্কে সেই আহ্বানই আবার আসিবে ও দুরতিক্রমণীয় হইবে! তিন বৎসর পূর্বে হঠাৎ একদিন দক্ষিণ কলিকাতা হইতে বনহুগলীতে আসিয়া সুহৃদ্বর শ্রীশশিভূষণ রায় জানান যে, ঈশ্বর মহারাজ অদূরে বনহুগলীতেই বাস করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে আমার মিলিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ঈশ্বর (মুক্তেশ্বরানন্দ) শ্রীমহারাজের বিশেষ প্রিয়-পাত্র, এবং সেবকরূপে তাঁহার শেষের দিকের লীলাসমূহের দ্রষ্টা। মহারাজের ভালবাসায় আত্মদান করিয়া, যাহা কিছু দেখিয়াছিলেন শুনিয়াছিলেন তিনি, স্মৃতির মণিসম্পুটে সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর ভগ্নদশায় পড়িয়াছে, আর সেইজন্যই স্বয়ং সেই সঞ্চিত ধনের সদ্ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারিতে-ছিলেন না।

'লীলাকথা'র বেশীর ভাগ উপাদান তাঁহারই দান। অন্যান্য সেবকগণের নিকট হইতে সংগৃহীত উপাদানের পরিমাণও উপেক্ষণীয় নহে। মহারাজের নিত্যলীলায় প্রবেশের অল্পকাল পরেই আমি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগদান করি। সেই সময় হইতে তাঁহার লোকাতীত চরিত্র সম্বন্ধে নানাকথা প্রাচীন সাধু ও ভক্তগণের মুখে শুনিয়া আসিতেছিলাম। ঐসকল কথার অধিকাংশই গ্রন্থের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণলীলার ব্যাখ্যাতা স্বামী সারদানন্দ বলিয়াছিলেন, মহারাজের জীবনী লেখা কঠিন। ঠাকুরের অপরাপর ত্যাগী সন্তানগণের মত মহারাজের জীবন ধরাবাঁধা নিয়মসীমায় আবদ্ধ ছিল না। এক ভাগবত জীবনগঙ্গা-প্রবাহ সচ্চিদানন্দ-গোমুখী হইতে উদ্গত হইয়া, গৃহী-সন্ন্যাসী-সাধক-সিদ্ধ-সিদ্ধের সিদ্ধ—নানা খাতে বহিয়া, পদে পদে বৈচিত্র্যময় তরঙ্গরাজি বিস্তার করিয়া, কূলে কূলে তাপদগ্ধ নরনারীর প্রাণের জ্বালা জুড়াইয়া, খেলিতে খেলিতেই যেন, সচ্চিদানন্দ-সাগর-সঙ্গত হইয়াছে। এইরূপ ধারণাবশেই আমরা তাঁহার

জীবনের বিভিন্ন দিক্ নিয়া, পরিজ্ঞাত ঘটনাবলীর সাহায্যে, কতকগুলি চরিত-চিত্র আঁকিতেই বিশেষভাবে প্রয়াস পাইয়াছি, জীবনচরিত লেখার গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করি নাই।

সংক্ষিপ্ত জীবনী, লীলার প্রকাশবৈচিত্র্য ও অন্ত্যলীলা—এই তিন ভাগে বিভক্ত গ্রন্থখানির মধ্য ও অন্ত্যভাগে ছোটবড় ছাব্বিশটি নিবন্ধ রহিয়াছে। ঐ সকল নিবন্ধের বিষয়বস্তু কোথাও বহুলাংশে, কোথাও বা সর্বাংশে নূতন। আদ্য ভাগ রচনায় পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থসমূহের সাহায্য লইতে হইয়াছে, কিন্তু তথ্য ও তত্ত্বের বিচারে উহার মধ্যেও নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে।

মহারাজের আবির্ভাবের শততম বর্ষ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। লীলাকথা তাঁহার শতবার্ষিক পূজার উপচাররূপে পরিকল্পিত। উপচারটি ক্ষুদ্র ও ত্রুটি-পূর্ণ; তথাপি ভরসা আছে যে, মরমের দরদ দিয়া গড়া, আঁখিজলে উৎসর্গ করা আমাদের এই নৈবেদ্য তিনি গ্রহণ করিবেন। ইতি।

গ্রন্থকার

# সূচীপত্র

# ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা

## সংক্ষিপ্ত জীবনী

কালিন্দীফুল্লকমলে মাধবেন ক্রীড়ারত।
ব্রহ্মানন্দ নমস্তুভ্যং সদ্‌গুরো লোকনায়ক ॥[১]

যমুনার জলে প্রস্ফুট পদ্মের উপরে হাতধরাধরি করিয়া সখা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একটি শিশু নৃত্য করিতেছে, শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্ষে দর্শন করেন। এই ক্রীড়ারত বালকরূপটিই স্বামী ব্রহ্মানন্দের সত্যকার রূপ বা সিদ্ধরূপ। তাঁহার মাতৃদত্ত নাম রাখালচন্দ্র। কৃষ্ণভক্তিপরায়ণা জননী দৈবপ্রেরিত হইয়াই যেন পুত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন। কীর্তন শুনিতে শুনিতে রাখালকে ঠাকুর ব্রজমণ্ডলের ভিতর দেখিয়াছিলেন।

ভগবান নরলীলা করিতে ভালবাসেন। লীলা মানে খেলা। সখ্য-বাৎসল্যাদি বিবিধ ভাবের খেলা খেলিবার জন্য, খেলার চমৎকারিতায় ও মাধুর্যে মোহিত করিয়া মানুষের মন আকর্ষণ করিবার জন্য, এবং সেই সেই ভাবে ভাবিত করিয়া তাহাকে আপ্তকাম করিবার জন্য, যুগে যুগে মানুষের সাজে মানুষের মাঝে তিনি আসেন। অবতার না হইলে জীবের বাসনা পূর্ণ হয় না, ঠাকুর বলিয়াছেন। আর যখন তিনি আসেন, তাঁহার খেলুড়ে বা লীলাপরিকরদিগকেও সঙ্গে আনয়ন করেন। সমধর্মী সমানস্তরের লোকের

---

১ পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে পূর্ণাভিষিক্ত করিবার কালে পূজনীয় শরৎ মহারাজ (সারদানন্দ) মুখে মুখে রচনা করিয়া পাঁচটি প্রণামশ্লোক পাঠ করাইয়াছিলেন। এই শ্লোকটি উহাদের অন্যতম।

সঙ্গে না হইলে খেলা ভাল হয় না, খেলা জমে না। 'রাখাল নিত্যসিদ্ধের থাক, ঈশ্বরকোটি'—ঈশ্বরের নিজের স্তরের ও ঘরের লোক।

অবতারলীলার দুইটি বিশেষ দিক্ আছে। একটি সেই পুরুষোত্তমের নিজের দিক্—খেলার মাধ্যমে নিজেরই রসাস্বাদন বা রসসম্ভোগ; অপরটি জীবের বা জগতের দিক্—জগৎকল্যাণে অবিরাম কার্য করিয়া যুগধর্মপ্রবর্তন, ধর্মসংস্থাপন। এই উভয়বিধকার্যে লীলাপরিকরগণই তাঁহার প্রধান সহায়। একএক পরিকরের অভিনয়াংশে বা ভূমিকায় একএক ভাবের প্রাধান্য। 'ঠাকুরের দিক্ থেকে রাখালের স্থান অতি ঊর্ধ্বে'—স্বামিজী বলিয়াছেন। বালকভাবাপন্ন রাখালকে লইয়া মাতৃভাবে ভাবিত ঠাকুরের বাৎসল্যরসের সম্ভোগ।

জেলা চব্বিশ পরগণা, মহকুমা বসিরহাটের অন্তর্গত শিকরাকুলীনগ্রামে পিতা শ্রীআনন্দমোহন ঘোষ ও মাতা শ্রীমতী কৈলাসকামিনীর প্রথম সন্তান-রূপে শ্রীমান্ রাখালচন্দ্র আবির্ভূত হন। সেদিন ১২৬৯ সালের ৮ই মাঘ, মঙ্গলবার; ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী; শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি।

আনন্দমোহন বিষয়ী লোক, জমিদার। পাঁচ বৎসর বয়সে রাখালের মাতৃবিয়োগ হইলে তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন।

বালকের কমনীয় রূপ ও স্বভাবমাধুর্যে কেহই আকৃষ্ট না হইয়া পারিত না। এই সময়ের কোন কোন ঘটনায় তাহার প্রেমপূর্ণ কোমল হৃদয়েরও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠশালায় পড়িবার কালে, কোন ছাত্রের অঙ্গে বেত্রাঘাত হইতে দেখিলেই সমবেদনায় তাহার চক্ষু আর্দ্র হইয়া যাইত। তাহার প্রতি স্নেহপরায়ণ শিক্ষকেরা ইহা লক্ষ্য করিয়া বেত্রদণ্ড রহিত করিয়া দেন।

বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে তাহার হৃদ্গত দেবভক্তিরও বিকাশ ঘটিতে থাকে। স্বহস্তে কালীপ্রতিমা গড়িয়া, সঙ্গীদের লইয়া কখন কখন সে পূজা-পূজা খেলা করিত। বৈষ্ণব ভিখারীর কণ্ঠে কৃষ্ণলীলাগান শুনিয়া অনায়াসে তাহা শিখিয়া

লইত। এইভাবে রামপ্রসাদের অনেকগুলি শ্যামাসঙ্গীতও সে আয়ত্ত করিয়াছিল। সন্ধ্যাকালে গৃহসংলগ্ন বোধনতলায় ছোট ছোট ভাইভগিনী-দিগকে লইয়া সে হরিনাম কীর্তন করিত। তাহারই শিক্ষামত তাহাকে ঘেরিয়া হাততালি দিতে দিতে তাহারা গাহিত—'জয় রাধে রাধে গোবিন্দ জয়, জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র।' একএক বার তাহাদের সঙ্গে সে নিজেও গাহিত, কখনো কখনো বা শুনিতে শুনিতে স্থির হইয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়া থাকিত। বাড়ীর দক্ষিণে এক মাইল ব্যবধানে প্রান্তরমধ্যে একটি পীরের দরগা আছে; কখন কখন সে সঙ্গীদের লইয়া সেখানে যাইত ও তাহাদের সঙ্গে মিলিতকণ্ঠে শ্যামাসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া পড়িত।

ফলফুলের বাগান করা, ছিপে মাছ ধরা, এই দুইটি ব্যাপার তাহার কিশোর মনকে প্রভাবিত করিয়াছিল। মাছ ধরিবার জন্য ছিপ হাতে করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাকে পুকুরপাড়ে নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত।

গ্রামের পাঠশালায় রাখালের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ হইয়া গেলে আনন্দমোহন পুত্রকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন, এবং কাঁসারীপাড়া বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে নিজের দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুরের আবাসে স্বজনপরিবেশে তাহাকে রাখিয়া নিকটবর্তী ট্রেনিং একাডেমিতে ভর্তি করিয়া দিলেন। রাখালের বয়স তখন বারো বৎসর। পল্লীপ্রান্তরের মুক্ত বায়ুতে স্বাধীন বিহঙ্গের মত যে খেলিয়া বেড়াইত, নগরের কৃত্রিমতাপূর্ণ জীবনযাত্রা ও রাজসিক ভাব যে তাহার তেমন প্রীতিকর হইবে না ইহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। যাহা হউক, ক্রমশঃ সে ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া উঠিল, এবং বিদ্যালয় অপেক্ষাও বিদ্যালয়সংলগ্ন ব্যায়ামাগারটিই তাহার প্রিয়তর হইয়া দাঁড়াইল।

কাঁসারীপাড়ার পাশেই সিমলা। সিমলার অধিবাসী নরেন্দ্রনাথ (উত্তর-কালে স্বামী বিবেকানন্দ) রাখালের সমবয়স্ক, রাখাল অপেক্ষা মাত্র নয় দিন বড়। পরস্পর নিকট প্রতিবাসী হওয়ায় এই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে মিলন সংঘটিত হয়। পাড়ার কিশোরবয়স্ক ছেলেরা নরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব মানিয়া চলিত, রাখালও বহুগুণে গুণী নরেন্দ্রনাথের বন্ধুত্ব স্পৃহনীয় জ্ঞান করিতেন।

কলিকাতা এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-আন্দোলনে তরঙ্গায়িত হইতেছে। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্রের বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্বে মোহিত হইয়া দলে দলে নব্য যুবকেরা ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লেখাইয়া নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছে। সহজাত ঈশ্বরানুরাগের প্রেরণায় নরেন্দ্রনাথ ও রাখাল উহার প্রার্থনাসভাসমূহে যোগদান করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া পড়িলেন এবং সহসা একদিন কেবলমাত্র নিরাকার ব্রহ্মেরই উপাসনা করিবেন এই মর্মে সমাজের অঙ্গীকার-পত্রে সহি করিয়া দিলেন। তাঁহার পরামর্শে রাখালও সহি করিয়াছিলেন। "শিশুর ন্যায় কোমলপ্রকৃতিসম্পন্ন নির্ভরশীল রাখালচন্দ্র যে নরেন্দ্রনাথের সপ্রেম ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সর্ববিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হইবেন ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে।" [লী] পরে ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়া তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিয়াছেন, 'রাখালের সাকারের ঘর—নিরাকারের কথা শুনলে উঠে যাবে।' [ক ৪।১০] ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনাসঙ্গীতসমূহে কিন্তু আজীবন তাঁহার অনুরাগ পরিলক্ষিত হইয়াছে।[২]

মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে সেই সময়ে অম্বিকাচরণ গুহ নামক এক ভদ্রলোকের কুস্তির আখড়া ছিল, নিয়মিতভাবে নরেন্দ্রনাথ ও রাখাল তথায় ব্যায়ামচর্চা করিতে যাইতেন। ব্যায়ামচর্চা করিয়া সুস্থসবল শরীর গঠন, আহারে বিহারে সংযত থাকিয়া ব্রহ্মচর্যব্রত পালন ও সমাজের উপাসনায় যোগদান—এইগুলিই রাখালের জীবনের প্রধান করণীয় হইয়া দাঁড়াইল এবং লেখাপড়াটা সেই

---

২ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ লিখিয়াছেন: "তিনি [শ্রীরাখাল মহারাজ] মিষ্টিকথায় শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশবাণী আমাদের নিকট কতই না বলিয়াছেন। দেবদেবীর বিষয়ে তিনি বলিতেন যে তাঁহারা সত্যসত্যই আছেন। কল্পনার কথা নহে। তিনি তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎ দর্শন করিতেন ও তাঁহাদের সহিত কথা বলিতেন ও তাঁহাদের প্রত্যুত্তর শুনিতেন। একদিকে স্বামিজীর নিরাকার অনুভূতি, আর একদিকে রাখাল মহারাজের দেবদেবীর দর্শন,এই দুইয়ের মধ্য দিয়াই ঈশ্বরের সম্যকরূপ উপলব্ধি করা যায় এইরূপ আমার মনে হয়।"—ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

পরিমাণে গৌণ বিষয় হইয়া গেল। তাঁহার অভিভাবকেরা ইহা লক্ষ্য করিয়া চিন্তিত হইলেন এবং জাগতিক বিষয়ে তাঁহার মনকে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য সত্বর তাঁহাকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। রাখালের নিজের দিক্ হইতে ইহাতে কোন আপত্তি উঠিয়াছিল বলিয়া জানা যায় না, উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান লইতেও কাহাকেও বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই; সহজেই কোন্নগরের অধিবাসী শ্রীমনোমোহন মিত্রের সেজ ভগিনী শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরীর সহিত রাখালচন্দ্রের পরিণয় সুনিষ্পন্ন হইয়া গেল। রাখালের বয়স তখন কিঞ্চিদধিক আঠার বৎসর, বিশ্বেশ্বরীর কিঞ্চিদধিক এগার।

বিবাহ হইল বটে, কিন্তু রাখালের স্বভাবগত বাল্যভাবের কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। মনোমোহনবাবু ইতঃপূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের অভয়াশ্রয়ে আসিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন, তাঁহার আশীর্বাদ লাভের জন্য তিনিই এখন ভগিনী-পতিকে সঙ্গে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। ইহাই রাখালচন্দ্রের জীবনে প্রথম শ্রীগুরুদর্শন।

তাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুর নিম্নোক্ত কথাগুলি বিভিন্ন সময়ে বলিয়াছিলেন: "রাখাল আসিবার কয়েকদিন পূর্বে দেখিতেছি, মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) একটি বালককে আনিয়া সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, এইটি তোমার পুত্র। শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, সেকি, আমার আবার ছেলে কি? তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, সাধারণ সংসারি-ভাবে ছেলে নহে, ত্যাগী মানসপুত্র। তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরেই রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম এই সেই বালক।"

"তখন তখন রাখালের এমন ভাব ছিল, ঠিক যেন তিনচারি বৎসরের ছেলে। আমাকে ঠিক মাতার মত দেখিত। থাকিত থাকিত, সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তনপান করিত! বাড়ী ত দূরের কথা, এখান হইতে কোথাও এক পা নড়িতে চাহিত না। তাহার বাপ পাছে এখানে না আসিতে দেয় সেজন্য কত বলিয়া বুঝাইয়া

একএক বার বাড়ীতে পাঠাইতাম। বাপ জমিদার, অগাধ পয়সা, কিন্তু বড় কৃপণ ছিল। প্রথম প্রথম নানারূপে চেষ্টা করিয়াছিল যাহাতে ছেলে এখানে আর না আসে; পরে যখন দেখিল এখানে ধনী বিদ্বান লোক সব আসে, তখন আর ছেলের আসায় আপত্তি করিত না। ছেলের জন্য কখন কখন এখানে আসিয়াও উপস্থিত হইয়াছিল। তখন রাখালের জন্য তাহাকে বিশেষ আদরযত্ন করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম।

"শ্বশুরবাড়ীর তরফ হইতে কিন্তু রাখালের এখানে আসা সম্বন্ধে কখনও আপত্তি উঠে নাই। কারণ মনোমোহনের মা, স্ত্রী, ভগ্নীরা, সকলের এখানে আসা যাওয়া ছিল। রাখাল আসিবার কিছুকাল পরে যেদিন মনোমোহনের মাতা রাখালের বালিকা বধূকে সঙ্গে লইয়া এখানে আসিল সেদিন মনে হইল বধূর সংসর্গে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হইবে না ত?—ভাবিয়া, তাহাকে কাছে আনাইয়া পা হইতে মাথার কেশ পর্যন্ত শারীরিক গঠনভঙ্গী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম এবং বুঝিলাম ভয়ের কারণ নাই, দেবীশক্তি, স্বামীর ধর্মপথের অন্তরায় কখনও হইবে না। তখন সন্তুষ্ট হইয়া নহবতে (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীকে) বলিয়া পাঠাইলাম, টাকা দিয়া যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।

"আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালক-ভাবের আবেশ হইত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তখন যে-ই তাহাকে ঐরূপ দেখিত, সে-ই অবাক হইয়া যাইত। আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীরননী খাওয়াইতাম, খেলা দিতাম। কত সময় কাঁধেও উঠাইয়াছি! তাহাতেও তাহার মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসিত না। তখনি কিন্তু বলিয়াছিলাম বড় হইয়া স্ত্রীর সহিত একত্র বাস করিলে তাহার এই বালকের ন্যায় ভাবটি আর থাকিবে না।" [লী]

রাখাল বিহনে যেন গাভী বৎসহারা।
হইল রাখাল দুটি নয়নের তারা॥

গোপাল গোপাল বলি কতই আদর।
আলিঙ্গন বসাইয়া কোলের উপর ॥
ভাবেতে কখন প্রভু এতই উন্মত্ত।
কাঁধেতে করিয়া তায় করিতেন নৃত্য ॥ [শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে আছে ঃ

"ঠাকুর ছোট খাটটির উপর গিয়া নিজের আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সর্বদাই ভাবে পূর্ণ। ভাবচক্ষে রাখালকে দর্শন করিতেছেন। রাখালকে দেখিতে দেখিতে বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইলেন, অঙ্গে পুলক হইতেছে। .. সমাধিস্থ হইলেন। [৪।১]

"রাখালকে বাৎসল্যভাবে দেখিতে লাগিলেন ও গোবিন্দ গোবিন্দ এই নাম প্রেমভরে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।...সব স্থির। [১।৫]

"রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। রাখালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—আমি অনেকদিন এখানে এসেচি, তুই কবে এলি ? [৪।৫]

হামেশাই এইরূপ ঘটিত। অবিচ্ছিন্নভাবে না হইলেও, প্রায় তিন বৎসর কাল প্রেমলীলার এইরূপ অভিনয় চলিয়াছিল।

রাখাল ঠাকুরের পুত্র; ব্রজের রাখাল—সাক্ষাৎ নারায়ণ—পুত্ররূপে। তাই শয়নে অশনে সকল বিষয়ে তাঁহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। অপর ভক্তেরা ঠাকুরেব সম্মুখে মেজেয় বসিতেন, রাখাল কোলের কাছে; তাঁহারা মেজেয় শুইতেন, রাখাল ক্যাম্প খাটে; তাঁহাদের জন্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ভাত বা রুটি রান্না করিতেন, রাখালের জন্য খিচুড়ি।

পুঁথিকার বাৎসল্যরসলীলার এই দিব্য অভিব্যক্তির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরাখালের স্বরূপগত নিত্যসম্বন্ধ দেখিতে পাইয়াছেন ঃ

স্বভাবে স্বভাব থাকে স্বভাবের প্রথা।
বীজের ভিতরে যেন ফলফুলপাতা ॥

সম্পর্ক সমানভাবে বাঁধা চিরকাল।
এখন রাখাল যিনি পূর্বেও রাখাল ॥
ভবিষ্যতে তিনিই রাখাল পুনঃ পরে।
রাখালের রাখালত্ব কিসেও না মরে ॥
প্রভুর গোপাল তাঁর গুণান্তর নাই।
গোসাঁইর শ্রীরাখাল তাঁহার গোসাঁই ॥

এইকালের প্রথমদিকের একটি ঘটনা মহারাজ তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন : তখন বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট থেকে ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করি। একদিন দুপুর বেলা গেছি, মা-কালীর মন্দির বন্ধ, ঠাকুর খেয়ে বিশ্রাম করচেন। আমি যেতেই ওঁর বিছানায় বসালেন; একথা সেকথার পর বলচেন, একটু পায়ে হাত বুলিয়ে দে তো। আমি বল্লুম, মশায়, ঐটি মাপ করবেন;' আমারই পায়ে কে হাত বুলিয়ে দেয় তার ঠিক নাই। বেশ তো গল্প করছিলেন, গল্প করুন। তথাপি সানুনয়ে তিনি আবার বল্লেন, দে না, সাধুসেবার ফল আছে। দুতিন বার বলার পর পায়ে হাত দিতেই অবাক কাণ্ড! আমি তো তাজ্জব! লোকটা কি ভৌতিক জানে? সাদা চোখে দেখলুম, মা-কালী সাত আট বছরের মেয়েরূপে তীরবেগে ঘরে ঢুকলেন, ওঁর তক্তাপোশের চারধারে কয়েকবার ঘুরপাক খেলেন, পায়ে মল বাজচে, শেষে ওঁর বুকে মিলিয়ে গেলেন। মুচকি হাসতে হাসতে তিনি বল্লেন, দেখলি হাতে হাতে সাধুসেবার ফল?[৩]

কৌতুকমিশ্র ভাষার আবরণে বর্ণিত হইলেও, রাখালচন্দ্রের মনে ঘটনাটি যে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই ঃ আর ইহা লিখিতে যাইয়া স্বতই আমাদের মনে সমুদিত হইতেছে সিদ্ধকবি রামপ্রসাদের এই ভণিতাটি—

প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
চাতরে কি ভাঙব হাঁড়ি, বুঝ না রে মন ঠারেঠোরে ॥

৩ নির্লেপানন্দ-কথিত।

আর একদিনের ঘটনার কথায় তিনি বলিয়াছিলেন: জান জ্ঞানানন্দ, আমরা যেমন কাদামাটি নিয়ে ইচ্ছামত পুতুল গড়ি, ঠাকুর তেমনি আমাদের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন। আমি একদিন নিজের হাতে করে প্রসাদী মাখন তুলে খেয়েছিলুম, তার জন্যে ঠাকুর আমাকে গালমন্দ করেন। আমি বল্লুম, খিদে পেয়েচে, খাব না তো কী করব, আপনি তো আমার জন্যেই রেখেছিলেন। প্রসাদ নিজ হাতে নিয়ে খেতে নাই, তাতে লোভ হয়—এই বলে আরো গালমন্দ করেন। আমি তখন রাগ করে, আমার কি বাড়ী নেই, আপনার এখানে থেকে শুধু গালমন্দ শুনব? আমি চল্লুম—বলেই হন হন করে গেটের দিকে চল্লুম। কিন্তু গেট পর্যন্ত গিয়ে গেট পার হতে আর পারলুম না, কে যেন আমার ঘাড় ধরে ফিরিয়ে ঠাকুরের ঘরে এনে হাজির করল। ঠাকুর বল্লেন, কই, যাবি বলেছিলি, গেলি না যে? আমি ভ্যাং করে কেঁদে ফেল্লুম![৪]

নিত্যসিদ্ধ পার্ষদভক্তগণের কথায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন: ওদের কেমন জান,—ফল আগে, তারপর ফুল। আগে দর্শন, তারপর গুণমহিমা শ্রবণ, তারপর মিলন। [ক ৪।২৩]

ঠাকুরের কাছে আসার স্বল্পকালের মধ্যেই রাখালচন্দ্র ঈশ্বরীয় ভাবে আবিষ্ট হন। ঠাকুর বলিতেছেন—এইখানে বসে পা টিপতে টিপতে রাখালের প্রথম ভাব হয়েছিল। একজন ভাগবতের পণ্ডিত এই ঘরে (দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে) বসে ভাগবতের কথা বলছিল। সেইসকল কথা শুনতে শুনতে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠতে লাগল; তারপর একেবারে স্থির। [১৮৮১]

'দ্বিতীয়বার ভাব বলরামের বাটীতে—ভাবেতে শুয়ে পড়েছিল।' [ক ৪।২০] এই দ্বিতীয়বারের ভাবাবস্থা কথামৃতকার শ্রীম দেখিয়াছিলেন, ঠাকুর তখন

৪ ডাক্তার কাঞ্জিলালের কাছেও মহারাজ ঘটনাটি বলিয়াছিলেন, তিনি বলেন, আর একটু অতিরিক্ত আছে—গেট পার হতে যখন যাবেন, দেখলেন প্রকাণ্ড দুটো হাত তাঁর সামনে, গেট আগলে আছে।

রাখালের বুকে হাত দিয়া শান্ত হও, শান্ত হও, বলিতেছিলেন। [ দোলযাত্রা। ১১ই মার্চ, ১৮৮২ ]

শ্রীম আর একদিন তাঁহার ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিতেছেন ( ৯ই আগষ্ট, ১৮৮৫ ) : রাত নয়টা হইল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসিয়া আছেন। মহিমাচরণের সাধ—ঘরে ঠাকুর থাকিবেন, ব্রহ্মচক্র রচনা করিবেন। তিনি রাখাল, মাষ্টার, কিশোরী ও আর দুএকটি ভক্তকে লইয়া মেজেতে চক্র করিলেন। সকলকে ধ্যান করিতে বলিলেন। রাখালের ভাবাবস্থা হইয়াছে। ঠাকুর নামিয়া আসিয়া তাহার বুকে হাত দিয়া মার নাম করিতে লাগিলেন। রাখালের ভাব সম্বরণ হইল। [ক ৪।২৪]

বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে, রাখালচন্দ্রের প্রথমদিনের ভাবাবেশ কৃষ্ণ-গুণ-মহিমা শ্রবণে, আর শেষোক্তটি জগন্মাতার অনুধ্যানে। উত্তরকালে কৃষ্ণ ও কালী-নামগুণকীর্তন শ্রবণে মুহুর্মুহুঃ তাঁহাকে ভাবাবিষ্ট হইতে দেখা যাইত। একাধিকবার অনেকেই ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। শ্যাম-শ্যামা উভয়েই তাঁহার ইষ্ট দেব-দেবী ছিলেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মন্ত্রগ্রহণের কথা আসিয়া পড়ে। দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্পকাল মধ্যেই ঠাকুর তাঁহার বালককে মন্ত্রদীক্ষিত করিয়া থাকিবেন। কারণ, ঐ সময় হইতেই রাখাল সর্বক্ষণ জপ করিতেন, সর্বাবস্থায় তাঁহার ঠোঁট নড়িতেছে দেখিতে পাওয়া যাইত, আর একএক সময়ে তাহা লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেন। 'রাখাল জপ করতে করতে বিড়বিড় করত। আমি দেখে স্থির থাকতে পারতুম না। একেবারে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়ে বিহ্বল হয়ে যেতুম।' [ক ২।৬]

শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমণ্ডলীমধ্যে রাখালচন্দ্রের জপনিষ্ঠা অতুলনীয়। 'জপাৎ সিদ্ধিঃ' এই শাস্ত্রবাক্যের মূর্ত প্রমাণ ছিলেন তিনি। আজীবন তাঁহার জপনিষ্ঠা অব্যাহত ছিল। 'আর আছে ত্রিগুণাতীত ভক্ত। তার বালকের স্বভাব। ঈশ্বরের নাম করাই তাঁর পূজা—শুদ্ধ তাঁর নাম।' [ক ২।১০]

দিনের পর দিন অহেতুককৃপাসিন্ধু শ্রীগুরুর সাহচর্যে থাকিয়া, তাঁহার সেবা করিয়া ও তাঁহার উপদেশানুযায়ী চলিয়া রাখাল অভীষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে ছিলেন। অন্তর্জগতের এই ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাস সম্পূর্ণরূপে জানিবার উপায় নাই। তবে পরবর্তী কালে সাধককল্যাণে উচ্চারিত তাঁহার শ্রীমুখের বাণী-সমূহ হইতে ইহার কিছুটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

কেবলমাত্র কতকগুলি নিয়ম বা কঠোর অনুশাসনের বাঁধনে না রাখিয়া, হাস্যপরিহাস কৌতুকাভিনয়ের মধ্য দিয়া, শুভসংস্কারসমূহকে জাগ্রত ও সক্রিয় তথা অশুভসংস্কাররাশিকে নিস্তেজ ও পরিক্ষীণ করিয়া ঠাকুর তাঁহার বালক শিষ্যদিগকে ঈশ্বরের পথে পরিচালিত করিতেন। আর অন্তর্জগতের ন্যায় বহির্জগতেও যাহাতে তাহারা সকল অশুভশক্তির আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারে সেই বিষয়েও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণলীলার 'জটিলাকুটিলা' হাজরা মহাশয় একদা মুরুব্বিয়ানা করিয়া সরলবুদ্ধি রাখাল ও লাটুর মনে অহেতু সংশয়ের বীজ বপন করেন। এতদিন ঠাকুরের কাছে থাকিয়াও তাহাদের কোনই উন্নতি হয় নাই, খাইয়া খেলিয়া শুধু সময় নষ্ট হইয়া যাইতেছে, না চাহিলে তিনি কিছুই করিয়া দিবেন না, এবং একথা ঠাকুরকে জানানো তাহাদের অবশ্যকর্তব্য : তাঁহার এই সকল কথায় বিচলিত হইয়া লাটু ও রাখাল ঠাকুরের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

কেশকণ্ডূয়ন সহ জড়জড় স্বর।
রাখাল কহেন কথা প্রভুর গোচর ॥
এতদিন এইখানে দিবা বিভাবরী।
কি হইল ফল কিছু বুঝিতে না পারি ॥
শুনি বাণী রাখালের প্রভু গুণধর।

... ... ...

চমকিয়া উঠিয়া কহেন সেইক্ষণে।
অনিমিখে নিরখিয়া রাখালের পানে ॥

কেবা দিল হেন শিক্ষা ভীষণ বারতা।
এ নহে তোদের নিজ অন্তরের কথা॥
নিরমলচিত্ত তোরা অন্তর সরল।
তাহে কে ঢালিয়া দিল ভীষণ গরল॥
জড়স্বরে শিরে হাত বুদ্ধি আলথাল।
হাজরার শিক্ষা ইহা কহেন রাখাল॥
গরজিয়া প্রভুদেব কেশরীর ন্যায়।
দ্রুতপদে ধাইলেন হাজরা যেথায়॥
কর্কশ ভাষায় কত তিরস্কার তারে।
পশ্চাৎ কহেন তুমি যাও স্থানান্তরে॥
কত কষ্টে লালিপালি ছাবাল আমার।
বিনষ্ট কারণে দেহ শিক্ষা কদাকার॥ [পুঁথি]

এইরূপে প্রতিপদে রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া ঠাকুর তাঁহার প্রিয় মানসপুত্রকে তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদের যোগ্য উত্তরাধিকারীরূপে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। আর দিনে দিনে রাখালচন্দ্রও কিরূপ অন্তর্মুখ হইয়া পড়িতেছিলেন ঠাকুরের একটি উক্তি হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। 'রাখালের এমনি স্বভাব হয়ে দাঁড়াচ্চে যে তাকে আমার জল দিতে হয়। সেবা করতে বড় পারে না।' [ক ৪।১৪ ঃ ২০শে জুন ১৮৮৪]

শৈশবে মাতৃহারা ও স্বভাবতঃ বালকভাবাপন্ন রাখাল ঠাকুরের কাছে আসিয়া এমন এক মাতৃস্নেহের আস্বাদ পাইয়াছিলেন যাহার তুলনা জগতে মিলে না। একান্ত নির্ভরতার সহিত সেই মাতৃত্বের কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই অ-মায়িক মাতৃত্ব যে বিশ্বমাতৃত্ব যাহা অপার প্রেমে তাঁহার মত সকল সন্তানেরই জন্য কোল প্রসারিত রাখিয়াছে, এই কথাটি তিনি তখন বুঝিয়াও যেন বুঝিতেছিলেন না। ফলে ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া একটা স্বার্থপর অহংতা ও মমতা তাঁহার মধ্যে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

আর ইহার প্রতিকারের জন্য কিছুদিন তাঁহাকে ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে সরিয়া থাকিতেও হইয়াছিল। ঠাকুর বলিয়াছেন ঃ

"রাখালের মনে তখন বালকের ন্যায় হিংসাও ছিল। তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি ভালবাসিলে সে সহ্য করিতে পারিত না। অভিমানে তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাহাতে আমার কখন কখন তাহার নিমিত্ত ভয় হইত। কারণ মা যাহাদের এখানে আনিতেছেন তাহাদের উপর হিংসা করিয়া পাছে তাহার অকল্যাণ হয়।

"এখানে আসিবার প্রায় তিন বৎসর পরে রাখালের শরীর অসুস্থ হওয়ায় সে বলরামের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে গিয়াছিল। উহার কিছু পূর্বে দেখিয়াছিলাম, মা যেন তাহাকে এখান হইতে সরাইয়া দিতেছেন। তখন ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম—মা, ও ছেলেমানুষ, বুঝে না, তাই কখন কখন অভিমান করে। যদি তোর কাজের জন্য ওকে এখানে হইতে কিছুদিনের জন্য সরাইয়া দিস, তাহা হইলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে রাখিস।...

"বৃন্দাবনে থাকিবার কালে রাখালের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া কত ভাবনা হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। কারণ ইতিপূর্বে মা দেখাইয়াছিলেন, রাখাল সত্যসত্যই ব্রজের রাখাল। যেখান হইতে যে আসিয়া শরীর ধারণ করিয়াছে সেখানে যাইলে প্রায়ই তাহার পূর্বকথা স্মরণ হইয়া সে শরীর ত্যাগ করে। সেইজন্য ভয় হইয়াছিল, পাছে শ্রীবৃন্দাবনে রাখালের শরীর যায়। তখন মার নিকট কাতর হইয়া কত প্রার্থনা করি এবং মা অভয় দানে আশ্বস্ত করেন।" [লী]

রাখালের দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া জ্বর হইয়াছে জানিয়া ঠাকুর এতই বিচলিত হন যে, হাজরার কাছে 'কী হবে' বলিয়া অসহায় বালকের মত ক্রন্দন করেন ও তাহার রোগমুক্তির জন্য মা-চণ্ডীর কাছে মানসিক করেন। ঠাকুরের উদ্বেগ দর্শন করিয়া অধর সেন রাখালকে রেজিষ্ট্রী করিয়া পত্র দিয়াছিলেন।

বৃন্দাবনে যাইয়া রাখালচন্দ্রের হৃদয়স্থিত আনন্দের উৎস যেন খুলিয়া গিয়াছিল। কথামৃতকার শ্রীমকে পত্র লিখিয়াছিলেন, 'এ বড় উত্তম স্থান, আপনি আসবেন। ময়ূর ময়ূরী সব নৃত্য করচে, আর নৃত্যগীত, সর্বদাই

আনন্দ!' প্রেমের লীলাভূমিতে বহুবল্লভ শ্রীগোবিন্দের উদ্দীপনা বহুবল্লভ শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহার নিজের অজ্ঞাতসারেও তাঁহাকে সাহায্য করিয়া থাকিবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন ব্যক্তিত্ব এইকালেই বিশেষভাবে তাঁহার প্রতীত হইয়া থাকিবে। প্রায় তিনমাস ব্রজে বাস করিয়া যখন তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন তখন তাঁহার পূর্ব মনোভাব আর নাই। ভক্ত ছেলেদের তো কথাই নাই, পতিত তাপিত যেকেহ ঠাকুরকে দেখিতে আসে, ঠাকুরকে কিছুমাত্র ভালবাসে, তাহাদের সকলেরই জন্য তাঁহার মন এখন সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ। ঠাকুর তাঁহাকে কৃপা করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন, 'মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু!'—জানাইয়া দিয়াছেন, তিনি সকলেরই জন্য আসিয়াছেন।

বৃন্দাবনগমনের পূর্ব হইতেই ঠাকুর তাঁহার মানসপুত্রকে আর এক দিক্ দিয়া সম্পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাকে দিয়া কিছুদিন সংসারলীলার অভিনয় করাইয়া সংসারী জীবের যাবতীয় অবস্থা তাঁহাকে উপলব্ধি করাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। উত্তরকালে মহারাজ যখন কাশীতে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে ছিলেন (১৯২১) সেই সময় তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া একটা দিব্য আনন্দের প্রবাহ বহিতে থাকিত, প্রাণে প্রাণে অনেকেই ইহা অনুভব করিয়াছেন। সেই আনন্দের আকর্ষণে নিত্য নূতন লোকের সমাগম হইতেছিল, আর আশ্রমটিও উৎসবমুখর হইয়া উঠিয়াছিল। মহারাজের এই বিভূতি-প্রকাশে বিস্মিত হইয়া তাঁহার এক ভগিনী পূজনীয় হরি মহারাজকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন—মহারাজকে সেই ভগিনী এক সময়ে সংসারী দেখিয়াছিলেন। হরি মহারাজ (তুরীয়ানন্দ) বলেন: ছোলাবীজ সারকুঁড়েই পড়ুক, আর যেখানেই পড়ুক, ছোলাগাছই হবে। ওঁরা হলেন আচার্যশ্রেণীর মানুষ। সবরকমের সংস্কার না থাকলে উপযুক্ত আচার্য হওয়া যায় না, তাই মহারাজের বিবাহ। লোকশিক্ষার জন্যে ঐ সংস্কারটুকুও থাকা আবশ্যক। তা না হলে বিভিন্নশ্রেণীর লোককে ঠিক ঠিক শিক্ষা দেবেন কী করে?[৫]

---

৫ ভবেশানন্দ-কথিত।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় হইতে রাখালচন্দ্র মাঝে মাঝে বাড়ীতে যাইয়া বাস করিতেন। ঠাকুরের ঐসময়কার দুইএকটি উক্তি হইতে ইহা জানা যায়। উক্তিগুলি এইরূপ :

'রাখালের জ্ঞান অজ্ঞান বোধ হয়েচে—সৎ অসৎ বিচার হয়েচে। এখন তাকে বলি, বাড়ীতে যা; কখনো এখাঁনে এলি, দুইদিন থাকলি। [ক ৪।১৩ : ২৫শে মে ]

'রাখাল এখন ঘরের ছেলের মত আছে। জানি, আর ও আসক্ত হবে না। বলে, ওসব আলুনি লাগে। ওর পরিবার এখানে এসেছিল, চৌদ্দ বৎসর বয়স। এখান হয়ে কোন্নগরে গেল। তারা ওকে কোন্নগর যেতে বল্লে, ও গেল না। বলে, আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগে না।' [ক ৪।১৪ : ২০শে জুন ]

ইহার কিছুকাল পরে রাখাল বৃন্দাবনে চলিয়া যান। তাঁহার বৃন্দাবনবাসের সময়ে ঠাকুর একদিন বলিয়াছিলেন, 'সে ( রাখাল ) যে আমার উপর সব নির্ভর করেছিল—বাড়ী ঘর সব ছেড়ে! তার পরিবারের কাছে তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতাম—একটু ভোগের বাকি ছিল।' [ক ৪।২০ : ১৯শে সেপ্টেম্বর ]

শ্রীগুরুপ্রসাদে স্বল্পদিনের মধ্যেই ভোগের বাকিটুকু শেষ হইয়া আসিল। ঠাকুর বলিতেছেন : ( সহাস্যে ) রাখাল এখন পেনসান খাচ্চে, বৃন্দাবন থেকে এসে এখন বাড়ীতে থাকে। বাড়ীতে পরিবার আছে। কিন্তু আবার বলেচে, হাজার টাকা মাহিনা দিলেও চাকরি করবে না। এখানে শুয়ে শুয়ে বলত, তোমাকেও ভাল লাগে না—এমনি তার একটি অবস্থা হয়েছিল। [ক ৩।১২ : ৭ই মার্চ ]

'...একটি ছেলে বুঝি তার হবে শুনলাম!'

[ক ৩।১৩ : ৬ই এপ্রিল, ১৮৮৫

অতঃপর রাখালচন্দ্রের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে।[৬]

---

৬ ছেলেটির জন্মতারিখ জানা যায় নাই। ২৩শে অক্টোবর ( ১৮৮৫ ) তারিখে শ্রীমনোমোহন মিত্র লিখিয়াছেন, 'বিসা ( বিশ্বেশ্বরী ) এবং তার ছেলে ভাল আছে এবং ভাল থাকিবে জানিয়াছি।'—ভক্ত মনোমোহন।

অভিনয়কালে অভিনেয় ভাবের আবেশ না হইলে উহা যন্ত্রক্রিয়াবৎ প্রাণহীন হইয়া পড়ে, দর্শকগণেরও চিত্তহারী হয় না। রাখালচন্দ্রের সংসারলীলার অভিনয়টিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতে ঠাকুরই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রযত্নপর ছিলেন, নিরপেক্ষ দ্রষ্টামাত্র ছিলেন না।

রাখাল বিশাই দুয়ে নিজের প্রভুর।
দিনেকে দুজনে পেয়ে লীলার ঠাকুর॥
জিজ্ঞাসা করিলা দোঁহে সহাস্য আননে।
কাহার বাসনা কিবা আছে মনে মনে॥
দীনক্ষীণ মৃদুভাবে কহিল বিশাই।
হৃদয়ে বাসনা মোর কিছুমাত্র নাই॥
জানিতে বারতা কিবা রাখালের মনে।
প্রভুর কটাক্ষপাত হৈল তাঁর পানে॥
সংকেতে অঙ্গুলি এক তুলিয়া তখন।
প্রার্থনা করিলা এক পুত্রের কারণ॥
সত্বর পাইবে পুত্র পূর্ণ হবে সাধ।
এত বলি ঠাকুর করিলা আশীর্বাদ॥ [ পুঁথি ]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্বামী সারদানন্দ অনেকগুলি ঘটনার সারসংক্ষেপ নোটবুকে টুকিয়া রাখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যে নোটগুলি তাঁহার লেখায় ব্যবহৃত হয় নাই উহাদের একটি অবিকল এইরূপ :

ঠাকুর পাকে-প্রকারে বলেছিলেন অধর সেনই রাখালের ছেলে হয়ে এসেছিল। যোগীন-মা, বলরামবাবু ইত্যাদির সামনে ঐ কথা বলেন। গৌরদাসী দক্ষিণেশ্বরে। বিশ্বেশ্বরী এলো ও সেদিন রইল। ঠাকুর বিশ্বেশ্বরীকে সকালে ডেকে আনতে বল্লেন। বিশ্বেশ্বরীর লজ্জা, আসবেই না, অনেক করে বকে ঝকে ঠাকুরের সামনে নিয়ে এলো। ঠাকুর রাখালকেও ডাকিয়ে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দুজনকে আশীর্বাদ কল্লেন, দুজনের হাতে মিছরি মাখন খাবার দিলেন; বিশ্বেশ্বরীর মুখের ঘোমটা খুলে দিতে বল্লেন, পা থেকে মাথা পর্যন্ত

দেখে বল্লেন—কেমন সব লক্ষণ দেখেচ, আগা গোড়া সব ভাল, রাখালের যত কিছু ভক্তি ভালবাসা সব এর জন্যে। বিশ্বেশ্বরীর গর্ভাবস্থা থেকে ঠাকুরের ভাবনা ও যোগীন-মার সঙ্গে পরামর্শ, করে প্রসব হতে কোন্নগরে আনা ভাল ইত্যাদি। বিশ্বেশ্বরীর ছেলে হলে, ছেলে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে আসা। ঠাকুর ছেলে কোলে নিয়ে, টাকা দিয়ে চুমু খাওয়া ও শ্রীমাকে বলে পাঠান, টাকা দিয়ে দেখতে।

অধর সেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিকে ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি আমার আত্মীয়। রাখাল-চন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল, মাঝে মাঝে তাঁহাকে বেনে-টোলায় নিজের বাড়ীতে আনিয়া রাখিতেন। সহসা ইষ্টদর্শন হইয়া, বেসামাল অবস্থায় ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া অধর দেহত্যাগ করেন ( ১৪ই জানুয়ারী, ১৮৮৫ )। ঠাকুর তাঁহাকে ঘোড়ায় চড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

সমস্ত ব্যাপার অনুধাবন করিয়া দেখিলে চমৎকৃত না হইয়া পারা যায় না। আর সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না—কেন ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যেরা রাখালপুত্র সত্যচরণকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, কেন পূজনীয় শশী মহারাজ ( রামকৃষ্ণানন্দ ) বরাহনগর মঠে কিছুদিন তাহাকে পড়াইয়াছিলেন, কেনই বা সে বড় হইয়া উঠিলে স্বামিজী তাহাকে মঠে আনিয়া সাধু করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেন।

খেলিতে খেলিতে মাটিতে পোঁতা খুঁটির উপর পড়িয়া গিয়া সত্যচরণ বুকে দারুণ আঘাত পায় এবং উহারই পরিণামে, অনেকদিন ভুগিয়া সে দেহত্যাগ করে ( ২০শে এপ্রিল, ১৮৯৬ )। ইহার প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্বে শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী স্বর্গতা হইয়াছিলেন; অনেকদিনের মধ্যে মহারাজের কোনই সংবাদ না পাইয়া, এবং স্বপ্নে পর্বতচূড়া হইতে তাঁহার পতন ও মৃত্যু সন্দর্শন করিয়া বিশ্বেশ্বরী আত্মহত্যা করেন।[৭]

---

৭ বিশ্বেশ্বরীর এই স্বপ্নদর্শনের কথা তাঁহার শ্বশুর-পরিবারের লোকরা বলিয়া থাকেন। মহারাজ সেই সময়ে লাহোরে ছিলেন।

কাশীপুরে ঠাকুর একদিন গিরিশবাবুকে বলিয়াছিলেন: রাখাল টাখাল এখন বুঝেচে, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মিথ্যা। ওরা যে সংসারে গিয়ে থাকে, সে জেনে শুনে। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েচে, কিন্তু বুঝেচে যে সব মিথ্যা, অনিত্য। রাখাল টাখাল এরা সংসারে লিপ্ত হবে না। যেমন পাঁকাল মাছ—পাঁকের ভিতর বাস, কিন্তু গায়ে পাঁকের দাগটি পর্যন্ত নাই। [ক ২।২৬ : ১৬ই এপ্রিল, ১৮৮৬]

এমন একটা অবস্থা আছে যে, মন বুঝিলেও প্রাণ বুঝে না। সংসারটা মায়ার খেলা জানিয়াও তাহাতে একেবারে নির্লিপ্ত উদাসীন থাকা যায় না। মহৎ হৃদয়ের বেদনা সাধারণ মানুষের দুঃখের অনুভূতি হইতে বহুগুণে অধিক। ভাইপো অক্ষয়ের মৃত্যুতে স্বয়ং ঠাকুর মর্মাহত হইয়াছিলেন, পুত্রবিয়োগে মহারাজকেও তাঁহার গুরুভাইরা বিষাদিত দেখিয়াছিলেন।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে ঠাকুরের আগমনের পরেও কিছুদিন পর্যন্ত রাখালচন্দ্র মধ্যে মধ্যে বাড়ীতে যাইয়া থাকিতেন, এইরূপ অনুমিত হয়। অতঃপর অপরাপর ত্যাগী গুরুভাইদের মত তিনিও সংসার ছাড়িয়া আসিয়া কায়মনোবাক্যে শ্রীগুরুসেবায় ও সাধনভজনে আত্মনিয়োগ করেন।

ভাবঘনবিগ্রহ ঠাকুরকে বক্ষে ধরিয়া বৃহৎ উদ্যানবাটী তখন তাঁহারই দিব্য ভাবরাজির স্পন্দনে ভরপুর, উহার আকাশে বাতাসে অনুক্ষণ অনুরণিত হইতেছে বৈরাগ্য ও ভজনের সুর। সহজ প্রেরণার বশে, ঈশ্বরদর্শনের আকুল আগ্রহে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা তখন তাঁহারই নির্দেশমত সাধনার পর সাধনা করিয়া যাইতেছিলেন।

সবলহস্তে সাধনপথের সকল বিঘ্ন বিদূরিত করিয়া ঠাকুর তাঁহার শিষ্যগণকে অধিকারিভেদে ব্রহ্মবিজ্ঞানের উচ্চ উচ্চতর ভূমিতে আরূঢ় করাইতেছিলেন, তাঁহার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তাঁহার মানসপুত্র রাখালচন্দ্রের তো কথাই নাই। "মনোরথে প্রভুদেব যাহার সারথি, শত জনমের পথে এক পলে গতি।" [পুঁথি] দক্ষিণেশ্বরে শ্রীগুরুসঙ্গে মিলনের সময় হইতে যে সাধনার

সূত্রপাত, কাশীপুরে উহারই পরিণতি, কিন্তু উহার পরিসমাপ্তি নহে। কারণ, ঠাকুরের তিরোভাবের পরেও বহু বৎসর ধরিয়া তাহাদিগকে কঠোর সাধনায় নিয়োজিত দেখিতে পাই।

মহারাজের উত্তরকালীন তপস্যা সম্বন্ধে পূজনীয় খোকা মহারাজ (সুবোধানন্দ) একদিন বলিয়াছিলেন: সেই সময় মহারাজের সঙ্গে আমি কিছুদিন ছিলাম। বাবা কী তপস্যা! আহারনিদ্রার কথা তাঁর মনেই থাকত না। কেবল ধ্যানজপ, কেবল ধ্যানজপ। একদিন তো বলেই ফেল্লুম, আপনি এত ধ্যানজপ করেন কেন, আপনাকে তো ঠাকুর সবই করে দিয়েচেন, তবে এত সাধনা কিসের জন্যে? একথায় মহারাজ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন, খানিকটা চিন্তিতভাবেই বল্লেন, ওরে খোকা, তিনি যে জিনিস দিয়েচেন, যে সম্পত্তির অধিকারী করেচেন, সেটা তো আমাকে বুঝে নিতে হবে? শ্রীবৃন্দাবনে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর অনুরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, তাঁর কৃপায় যেসব দর্শন বা অনুভূতি হয়েচে সেগুলি এখন আয়ত্ত করবার চেষ্টা করচি মাত্র।

এই দর্শন বা অনুভূতি আয়ত্ত করা বলিতে আমরা কী বুঝিব? দর্শন ও অনুভূতি পুনঃপুনঃ ঘটাইয়া সেই সেই অবস্থায় মনের সহজ গতিশক্তি লাভ করা? অথবা, দর্শনানুভূতিকালীন উচ্চস্তরে মনের স্বাভাবিক স্থিতি-বিধান? যাহাই হউক না কেন, উত্তরকালে যাঁহাদেরই কিছুদিন অন্তরঙ্গভাবে মহারাজের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহারা বলেন, মহারাজ তাঁহার শ্রীগুরুদেবেরই মত ভাবরাজ্যে বাস করিতেন, আর তাঁহার মনের কিয়দংশমাত্র বহির্জগতে থাকিয়া যাবতীয় কার্য নিষ্পন্ন করিত।

উচ্চাবচ ও বিচিত্র ভাবের জগতেই তাঁহার অনুভূতি সীমাবদ্ধ ছিল এরূপ মনে করিবারও কারণ নাই। বরং জগৎকারণের সাকার-নিরাকার যাবতীয় ভাব উপলব্ধি করিবার পরে তিনি সাকারে নিষ্ঠা করিয়া থাকিতেন, এইরূপই মনে হয়।

প্রতি বৎসর গঙ্গাসাগরযাত্রী সন্ন্যাসীরা কলিকাতায় আসেন। বুড়ো-গোপালের ইচ্ছা, তাঁহাদিগকে বস্ত্রদান করিবেন। সেই কথা শুনিয়া ঠাকুর তাঁহার সন্নিহিত সেবকগণকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, এদের মত সাধু কোথায় পাবে তুমি? তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী বুড়োগোপাল নির্দিষ্টসংখ্যক গৈরিক বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা আনিয়া দিলে তিনি এগার জন সেবকশিষ্যের প্রত্যেককে এক-খানি করিয়া বস্ত্র ও একগাছি করিয়া রুদ্রাক্ষের-মালা দান করেন। শ্রীগুরুর হাত হইতে ঈশ্বরার্থে সর্বত্যাগের প্রতীক গৈরিক গ্রহণ করিয়া রাখালচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনের গতিপথ চিরতরে নির্দিষ্ট হইয়া গেল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিতে লেখা আছে যে, লীলাসম্বরণের পূর্বে ঠাকুর ঐ এগারজন শিষ্যকে ক্রিয়াপূর্বক সন্ন্যাসও দিয়াছিলেন।

আর দিন বিধিমত ক্রিয়া সমাপনে।
সন্ন্যাস দিলেন প্রভু ভক্ত দশ জনে॥

*　　*　　*

রাখাল না ছিলা আজি গিয়াছিলা ঘরে।
পশ্চাতে সন্ন্যাস প্রাপ্ত আইলে গোচরে॥
এই একাদশে আজ্ঞা দিলা গুণমণি।
যার তার খাস তোরা হইবে না হানি॥

যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে এই ক্রিয়াপূর্বক-সন্ন্যাস তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত সন্ন্যাস বলিয়াই আমাদের ধারণা জন্মিয়াছে। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালেই ঠাকুর রাখালচন্দ্রকে পূর্ণাভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

প্রথম হইতেই তিনি তাঁহার মানসপুত্রের জীবন সন্ন্যাসের অভিমুখে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছিলেন। অহঙ্কার অভিমান দূর করিবার জন্য ধনীর দুলালকে দিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করাইয়াছেন। উদ্দেশ্যবিশেষ সিদ্ধ করিবার জন্য মাঝে কিছুদিন তাঁহাকে দিয়া সংসারলীলার অভিনয় করাইয়া নিয়াছিলেন, এইমাত্র। কিন্তু সেই অভিনয়কালে যে অভিনিবেশ ঘটে, আর তাহার ফলে যেসব নূতন সংস্কার অর্জিত হয় ও যেসব নূতন বন্ধনের সৃষ্টি হয় সেইগুলিকে

বাধা অতিক্রম করিতে কী ভীষণ প্রয়াসই না তাঁহাকে করিতে হইয়াছে![৮] সেই প্রয়াস—সেই সুতীব্র তপস্যা—তাঁহার জীবনকে গভীর হইতে গভীরতর করিয়াছে, এবং পরিশেষে গভীরতম আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-সংঘের শীর্ষদেশে তাঁহার আসন নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে। তাঁহার জীবনের ঐ দিক্‌টা চিন্তা করিলে বাঙ্গলার আর এক ধনীর দুলাল দাস রঘুনাথের কথা স্বতই মনে সমুদিত হয়।

তাঁহার জীবনের ব্যবহারিক দিক্‌টাও যে অনন্যসাধারণ হইবে ইহা অপরে তৎকালে বুঝিতে না পারিলেও সর্বদর্শী ঠাকুরের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। আর সেইজন্য লীলাসম্বরণের প্রাক্কালে, যে সময়টায় ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার ত্যাগী সন্তানমণ্ডলীকে কিভাবে পরিচালনা করিতে হইবে তাহা উপদেশ করিতেছিলেন সেইকালে, বলিয়াছিলেন, রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, সে একটা রাজ্য চালাতে পারে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট ঠাকুরের তিরোভাব ঘটিলে ভক্তেরা শোকের পাথারে দিশাহারা হইলেন। 'তোমরা রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে তাই শরীর ছাড়তে একটু কষ্ট হচ্ছে।' ভক্তবৎসল ঠাকুর আগেই একথা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন।

কাশীপুরের ভাড়াটে বাড়ী শীঘ্রই ছাড়িয়া দিতে হইল ও ঠাকুরের ত্যাগী শিষ্যেরা যে যেদিকে পারিলেন সরিয়া পড়িতে লাগিলেন। কেহ কেহ শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন; কেহ কেহ অনিচ্ছাসত্ত্বেও সাময়িকভাবে গৃহে যাইয়া রহিলেন; আর রাখালচন্দ্র রহিলেন বসু-

---

৮ উমেশ দত্ত নামে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর জনৈক গৃহী শিষ্য একদা মহারাজকে বলিয়াছিলেন, সংসারে আমাদের যে সংগ্রাম করতে হয় তার কিছুই তো আপনারা বুঝলেন না। মহারাজ উত্তর দেন, আমাদের যে সংগ্রাম করতে হয় তার শতভাগের একভাগও যদি আপনাদের করতে হত।

বলরাম-ভবনে।[১] মানসিকদ্বন্দ্বসমাকুল একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে প্রায় দুইমাস কাটিয়া যাইবার পরে, অক্টোবর মাসের প্রথমদিকে বরাহনগরে এক পুরাতন জীর্ণ দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের গোড়াপত্তন হইল। স্বামিজীর আহ্বানে ক্রমে ক্রমে সকলেই সেই বাড়ীতে আসিয়া জুটিলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হইল এক দুশ্চর তপস্যা, অধ্যাত্মজগতে সংঘ-জীবনের ইতিহাসে যাহার তুলনা নাই। অনাহারে, অর্ধাহারে বা একাহারে থাকিয়া, শুধুভাত, নুনভাত বা তেলাকুচাপাতার ঝোল সহযোগে ভাত খাইয়া দিন কাটিতেছে, আর দিবারাত্রির প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই চলিয়াছে ধ্যানজপ, ভজনকীর্তন, শাস্ত্রপাঠ। ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহারা প্রায় সকলেই উত্তম স্বাস্থ্য লইয়া সংসারে আসিয়াছিলেন, ব্যায়ামাদি করিয়া শরীরটাকে যথাসম্ভব দৃঢ়সবল করিয়াও রাখিয়াছিলেন, আর অন্তরে তাঁহাদের জ্বলিতেছিল বৈরাগ্যের দীপ্ত বহ্নি, নতুবা দীর্ঘকাল ধরিয়া এতটা কঠোরতা সহ্য করা সম্ভব হইত না।

এই সময় আনন্দমোহন একদিন তাঁহার এক জ্ঞাতিভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়া পুত্রকে সংসারে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিতে আসেন। রাখালচন্দ্র সবিনয়ে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'কেন আপনারা কষ্ট করে আসেন? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্বাদ করুন, যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই!' [ক]

১৮৮৭, জানুয়ারী মাসের শেষার্ধে শ্রীগুরুর পাদুকার সম্মুখে বিরজাহোম করিয়া নরেন্দ্রনাথপ্রমুখ গুরুভাইরা আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাসাশ্রম ও তদুচিত নাম গ্রহণ করেন। রাখালচন্দ্রের নাম হয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামিজী পূর্ব হইতেই তাঁহাকে আদর করিয়া 'রাজা' সম্বোধন করিতেন বলিয়া সংঘমধ্যে তিনি সাধারণতঃ 'রাজা' বা শুধু 'মহারাজ' নামে অভিহিত হইতে থাকেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সঙ্গে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ পুরী যান এবং ১ই

---

১ রাখাল এই সময়ে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন ও কয়েক মাস ছিলেন—কথামৃতে এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। [ক ২। পরিশিষ্ট]

নভেম্বর হইতে অন্যূন দুইমাস সেখানে বাস করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।[১০] পুরীধামে যাওয়ার পূর্ব হইতেই তাঁহার মন কোন এক জনবিরল স্থানে, বিশেষতঃ নর্মদাতীরে, যাইয়া তপস্যা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। ১৮৮৯, ডিসেম্বরের প্রারম্ভে তিনি সুবোধানন্দকে সঙ্গে নিয়া বরাহনগর মঠ হইতে বহির্গত হন, এবং চারি বৎসরাধিক কাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটনে ও তপস্যায় অতিবাহিত করেন। বৃন্দাবন হইতে ১৮৯০, ৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় শ্রীবলরাম বসুকে তিনি যে পত্র লেখেন তাহাতে তাঁহার প্রথম দুইমাস পর্যটনের বিবরণ পাওয়া যায়। উহার কিয়দংশ এইরূপ ঃ

"আমাদের কাশীধাম হইতে একটি সঙ্গী জোটে, তাহার সহিত নর্মদা যাই। নর্মদায় স্নানাদি করিয়া…ওঙ্কারনাথ দর্শন করিয়া সেখানে কিছুদিন থাকা যায়। ওঙ্কারনাথ স্থানটি অতি উত্তম—নর্মদার ধারে, অনেক সাধু এবং বাবাজী আছেন, থাকিবার খুব সুবিধা। আমরা একটি মঠে ছিলাম। চতুর্দিকে খুব পাহাড় এবং নির্জন স্থান, অতি চমৎকার দৃশ্যসকল আছে। কিছুদিন বেশী তথায় থাকিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রারব্ধ কোথা হইতে কোথায় লইয়া যায়। তাহার পর…গোদাবরীর ধারে দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটীর বন দর্শন করি। তথায় ২।৩ দিবস থাকি। তথায় থাকিবার সুবিধাও বেশ আছে। তবে সেখানে সংসারী লোক অনেক বাস করে…। বনের নাম মাত্র নাই, তবে চতুর্দিকে ভারি ভারি পাহাড় আছে। তথা হইতে বোম্বে যাই। বোম্বাই শহরে আমরা

---

১০ গৌরীশানন্দ বলেন : পুরীতে মহারাজের অবস্থান কালে পূজনীয় হরি মহারাজ তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন ও উভয়ে কঠোর তপস্যায় কালাতিপাত করিতে থাকেন। সেই সময়ে এমার মঠের মোহন্তের সঙ্গে হরি মহারাজের খুব মেলামেশা হয়। বুদ্ধিমান মোহন্ত হরি মহারাজকে ব্র হ্মণশরীর, শুদ্ধাচারী ও শাস্ত্রজ্ঞ জানিয়া বিপুলৈশ্বর্য এমার মঠের গদীর উত্তরাধিকারী করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। পাছে হরি মহারাজ এই প্রলোভনে পড়িয়া যান সেই ভয়ে মহারাজ ঠাকুরের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছিলেন। তাঁহার প্রাণের আবেগ উপলব্ধি করিয়াই যেন হরি মহারাজ কহিলেন, মহারাজ, আর এখানে নয়, চল অন্য কোনও স্থানে যাওয়া যাক।

৭।৮ দিন ছিলাম, কোনরূপ অসুবিধা বোধ করি নাই।...বোম্বে হইতে একটি শেঠ আমাদিগকে দ্বারকা যাইবার জন্য জাহাজের টিকিট দেয়। জাহাজে ৪৭ ঘণ্টা প্রায় থাকিতে হয়...। দ্বারকাধীশের মন্দির প্রায় সমুদ্রের সন্নিকট এবং মন্দির বড় কম নয়। সেখান হইতে ১৪ মাইল ভেটপুরী নামক স্থানে যাই! সেখানে খুব জাঁকজমক আচারে মন্দিরের সেবাকার্য করিয়া থাকে।...পুনরায় দ্বারকা আসিয়া জাহাজে চড়িয়া সুদামাপুরী নামক স্থানে আসি। তথা হইতে জুনাগড়...। সেখান হইতে গির্ণারের পাহাড় ৭ মাইল,...। গির্ণারের পাহাড অত্যন্ত উচ্চ, খাড়া চড়াই ১০ মাইল। আমাদের উঠিতে অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল, ৩।৪ দিবস গায়ের ব্যথা ছিল। তথা হইতে...আমেদাবাদ...পরে ৺পুষ্করতীর্থে আসি। ৺পুষ্করতীর্থে ৮।৯ দিন ছিলাম। তথায় একটি বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী আছেন। তিনি আমাদের থাকিতে স্থান দেন—অতি ভদ্রলোক। তথায় আমাদের সঙ্গী লোকটির জ্বর হয়।...আমরা দুজনে তাহাকে আজমীঢ় হাসপাতালে লইয়া আসি। তথাকার ডাক্তার বলিলেন, ইহার নিউমোনিয়া হইয়াছে, সেজন্য তাহাকে হাসপাতালে রাখিয়া আমরা দুইজনে বৃন্দাবনধামে চলিয়া আসিয়াছি।”[১১]

এই পত্রখানির প্রথমদিকে মহারাজ বলরামবাবুর দেহপীড়ার জন্য স্বীয় মনোবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন; আর উহার শেষের দিকে আছে: ‘মাতা-ঠাকুরাণী কেমন আছেন? তাঁহাকে আমার সংখ্যাতীত প্রণাম জানাইবেন। যোগেন কোথায় এবং কেমন আছে, শরৎ প্রভৃতি হৃষীকেশে কেমন আছে, নরেন কেমন আছে এবং কোথায়, অনুগ্রহ করিয়া সত্বর পত্র লিখিবেন। আর আপনি আমার নমস্কার জানিবেন। সত্বর পত্রের জবাব দিবেন।’ একএক বার ঐশ্বরিক ভাবে মগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য মনের আকুলিবিকুলি, আবার সেই ভাব হইতে ব্যুত্থিত হইয়াই সমানপ্রেমে ঠাকুরের স্বগণের জন্য ভাবনা—তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের এই স্বভাবধর্মটিও লক্ষণীয়।

---

১১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বৃন্দাবনে মহারাজ এইবারে প্রায় আটমাস ছিলেন। এমন অকিঞ্চন ভাবে থাকিতেন যে, দেহের বিশ্রামের পক্ষে অত্যাবশ্যক একটা মশারীও তাঁহার ছিল না। তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন (মার্চ, ১৮৯০)। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই সময়ে ব্রজবাস করিতেছিলেন, মহারাজের পীড়ার সংবাদ পাইয়াই দেখিতে আসেন, দড়ি-পেরেক সহ একটা মশারী আনিয়া স্বহস্তে খাটাইয়া দেন, এবং ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়া স্বয়ং তাঁহার চিকিৎসা করেন। ইহার কিছুদিন পরে সুবোধানন্দ উত্তরাখণ্ড অভিমুখে চলিয়া যান ; মাধুকরী করিয়া তিনিই এতদিন মহারাজের তপস্যাব আনুকূল্য করিয়া আসিতেছিলেন।

১৩ই মে তারিখে মহারাজ হঠাৎ দেখিতে পান, বলরামবাবু যেন জ্যোতির্ময়দেহে হাসিতে হাসিতে দিব্যধামে চলিয়া যাইতেছেন। পরদিন কলিকাতা হইতে তারযোগে তাঁহার দেহত্যাগের খবর আসে। পরমাত্মীয়-বিয়োগে মহারাজ হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে তিনি পদব্রজে হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছিয়া, কনখলের এক নিভৃত অংশে পর্ণকুটীরে থাকিয়া যখন তিনি আত্মোপলব্ধির সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন, স্বামিজী, শবৎ মহারাজ, হরি মহারাজ প্রভৃতি তাঁহাব অপর গুরুভ্রাতারা সেই সময়ে হৃষীকেশে, হিমালয়ের গাম্ভীর্যময় পরিবেশে, অনুরূপ তপস্যায় নিরত ছিলেন। হৃষীকেশে জ্বর হইয়া স্বামিজীর জীবনসংশয় হইয়াছিল। তিনি কিছুটা সুস্থ হইয়া উঠিতেই গুরুভাইরা তাঁহাকে লইয়া নীচে নামিয়া যাইবার সংকল্প করেন ও কনখলে আসিয়া মহারাজের সঙ্গে মিলিত হন। কনখল হইতে সকলে একযোগে মীরাটে গমন করেন। পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ (অখণ্ডানন্দ) তখন মীরাটে ছিলেন ও মহারাজ তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বহু গুরুভ্রাতার একত্র মিলনে তাঁহাদেব আবাসগৃহখানি দ্বিতীয় বরাহনগর মঠে পরিণত হইল এবং ধ্যানভজন শাস্ত্রচর্চা ও সমাগত লোকজনকে শিক্ষাদানের ভিতর দিয়া প্রায় ছয়মাস পবমানন্দে কাটিয়া গেল।

কাহাকেও কিছু না বলিয়া, মীরাট হইতে স্বামিজী হঠাৎ একদিন দিল্লীতে

চলিয়া গেলে গুরুভাইরা উদ্বিগ্ন হইয়া সেখানেও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। ভিতর থেকে একাকী থাকার প্রেরণা পাচ্চি, ইত্যাদি কথা বলিয়া স্বামিজী তাঁহাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করেন।

তুরীয়ানন্দকে সঙ্গী করিয়া মহারাজ অতঃপর জ্বালামুখী, কাংড়া, বৈজনাথ, পাঠানকোট, গুজরানওয়ালা, লাহোর, মণ্টগুমারী, মুলতান, সাধুবেলা, করাচী ও বোম্বাই পরিভ্রমণ করেন। সাধুবেলা মঠের মোহন্ত তাঁহাদিগকে বিশেষ সমাদরে রাখেন ও কিছুদিন তথায় থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। সাধুবেলা সক্কর জেলায় সিন্ধুনদের গর্ভস্থ একটি দ্বীপ; এইরূপ জনশ্রুতি যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তিরোভাবের পর শ্রীমতী রুক্মিণী ও শ্রীমতী সত্যভামা এই দ্বীপের সন্নিকটে একস্থানে থাকিয়া তপস্যায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন।

বোম্বাই শহরে অপ্রত্যাশিতভাবে ঠাকুরের ভক্ত কালীপদ ঘোষের বাসায় স্বামিজীর সঙ্গে তাঁহাদের মিলন সংঘটিত হয়। স্বামিজী তখন আমেরিকা গমনে কৃতসংকল্প হইয়া, যাত্রার প্রাক্কালে খেতড়ীর রাজার নবজাত কুমারকে আশীর্বাদ করিতে যাইতেছিলেন। আবুরোড ষ্টেশন পর্যন্ত স্বামিজীর সঙ্গে যাইয়া, এবং খেতড়ী হইতে স্বামিজীর প্রত্যাগমনকালে তথায় তাঁহার সঙ্গে পুনর্মিলিত হইয়া, তাঁহারা পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিলেন। আবুপাহাড়ে মহারাজ পুনরায় কঠোর সাধনায় নিরত হইলেন। সেই সময় তুরীয়ানন্দ তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইতেন ও যোধপুরের দেওয়ান শরচ্চন্দ্র চৌধুরী তাঁহাদের যত্ন লইতেন।

আবুপাহাড়ে প্রায় তিনমাস থাকিয়া তাঁহারা আবুরোডে নামিয়া আসেন। মহারাজের আহ্বানে বোম্বাই হইতে আসিয়া অখণ্ডানন্দ আবুরোডে তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হন, এবং তিনজন একযোগে আজমীঢ় ও জয়পুর পরিভ্রমণ করেন। জয়পুরে স্বামিজীর অনুরাগী ভক্ত সর্দার হরি সিং তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজগৃহে লইয়া যান। পক্ষকাল জয়পুরে থাকিয়া তাঁহারা শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউ দর্শনাদি করেন। দিনের পর দিন জীবন্ত বিগ্রহ গোবিন্দজীউর দিব্য দর্শন স্বভাবতই মহারাজের মনে বৃন্দাবনের উদ্দীপনা আনিয়া দিল, এবং

তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে নিয়া তিনি বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন (জুলাই, ১৮৯৩)। অখণ্ডানন্দ তখন খেতড়ীতে চলিয়া গিয়াছেন।

বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াই তুরীয়ানন্দ কহিলেন, আজ আর ভিক্ষায় বেরুব না, দেখি রাধারাণী খেতে দেন কিনা। এইরূপ সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া উভয়েই জপধ্যানে মগ্ন রহিলেন। দিন ও রাত্রি একই ভাবে কাটিয়া গেল। পরদিন সকালে এক ব্যক্তি তাঁহাদের জন্য প্রচুর খাদ্যদ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইলে শ্রীরাধারাণীর জয়কার দিয়া হৃষ্টমনে তাঁহারা আহারে বসিলেন।

কিছুদিন পরে তাঁহারা ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় বাহির হইলেন। রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্ধন, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লীলাস্থলী সন্দর্শন করিয়া, নিজেদের তপস্যার অনুকূল বিবেচনায় কুসুমসরোবরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কুসুমসরোবর রাধাকুণ্ডের একমাইল ব্যবধানে, রাধাকুণ্ড ও গিরিগোবর্ধনের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে তুরীয়ানন্দ ভিক্ষা করিয়া মহারাজকে খাওয়াইতেন, আর এক উদারচেতা বৈষ্ণব, শ্যামদাস বাবাজী, তাঁহাদের যত্ন লইতেন। একদিন ভিক্ষায় শুষ্ক রুটি ভিন্ন আর কিছু না পাইয়াও তাহাই মহারাজকে খাইতে দিয়া তুরীয়ানন্দের চক্ষে অশ্রু ঝরিয়াছিল।[১২]

এইরূপে কয়েকমাস অতিবাহিত হইলে, মঠের কাজে সাহায্য করিবার জন্য তুরীয়ানন্দের নিকট আহ্বান আসিতে লাগিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ তখন আলমবাজারে স্থানান্তরিত হইয়াছে ; মঠে ভক্তসমাগম বাড়িয়াছে ; স্বামিজীকে

---

১২ গৌরীশানন্দ বলেন : ভরতপুরের কোন মহারাজার অস্থি সমাহিত করিতে ব্রজধামে আসিয়া রাণীরা কুসুমসরোবরে মহারাজের সৌম্যমূর্তি দর্শনে আকৃষ্ট হন ও অতিবৃহৎ একটি লাড্ডু তাঁহাকে উপহার দেন। তাঁহাদের আগ্রহাতিশয্যে কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণ করিয়াই মহারাজ লাড্ডুটি পরিত্যাগ করিলেন দেখিয়া রাণীরা তাঁহাকে ঐরূপ করিতে বারণ করিলেন, আর ইহাও জানাইলেন যে, এ লাড্ডুর ভিতরে একটি মোহর রাখা আছে যাহা তাঁহার কাজে লাগিবে। লাড্ডুটি ভাঙ্গিবামাত্র উহার মধ্যে রক্ষিত মোহরটি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং লাড্ডু ও মোহরের প্রলোভন দূরে পরিহার করিয়া, হরি মহারাজকে সঙ্গে নিয়া, মহারাজ সেই স্থান হইতে সরিয়া পড়েন।

নিমিত্ত করিয়া পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সনাতন ধর্মের জয়পতাকা উড়িয়াছে। তুরীয়ানন্দ মঠে ফিরিয়া গেলেন। বিজনবাসী হইয়া মহারাজ তপস্যার কঠোরতা আরও বাড়াইয়া দিলেন।

অজগরবৃত্তি অবলম্বনপূর্বক তিনি তখন মৌনভাবে অবস্থান করিতেন। "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'—এই ভগবৎপ্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করিতেই বুঝি বা এক ব্রজবাসী প্রায় প্রত্যহই তাঁহাকে আহার্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। একদিন এক শেঠ একখানি কম্বল দিয়া গেল, খানিক বাদে আর এক ব্যক্তি আসিয়া, তাঁহাকে কিছু না বলিয়াই, কম্বলখানি লইয়া সরিয়া পড়িল! তিনি দ্রষ্টামাত্র।

তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হইল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে একদিন তিনি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজাকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া আলমবাজার মঠে তাঁহার গুরুভাইরা উৎফুল্ল হইলেন। পূর্ণকাম মহাপুরুষের প্রীতিপ্রসন্ন আননে ও ধ্যানস্তিমিত নয়নে পরিব্যক্ত হইতেছিল যে চিত্তপ্রশান্তি তাহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার দেবদুর্লভ সঙ্গ স্বতই সমাগত ধর্মপিপাসুদের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে লাগিল। সময়ে সময়ে ঠাকুরের ও ভজনসাধনের প্রসঙ্গ করিয়া তিনি তাহাদিগকে গতিপথের নির্দেশও দিতে লাগিলেন। সংঘবদ্ধ হইয়া ঠাকুরেব ভাবরাশি প্রচার করিবার জন্য দূরদেশ হইতে স্বামিজী যে প্রেরণা দিয়া আসিতেছিলেন, মহাবাজকে কেন্দ্র করিয়া সেই কাজই প্রকৃতপক্ষে সুরু হইয়া গেল।

লোকহিতে ধর্মজগতে যেসকল মহাপুরুষ কাজ করিয়া যান তাঁহাদের সকলেই একপর্যায়ভুক্ত 'নহেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অপরোক্ষানুভূতিসম্পন্ন হইয়া প্রায়শঃ ভাবজগতে বিচরণ করেন তাঁহাদের সত্ত্বপ্রধান দেহমন রজোবহুল কাজের উপযোগী হয় না। কিন্তু ইচ্ছা করিলে তাঁহারা সমর্থ কর্মীর দল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে দিয়া ইচ্ছানুরূপ কাজ করাইয়া লইতে পারেন। মহারাজ যে এইরূপ একজন মহাপুরুষ ছিলেন, শ্রীশ্রীমাতা-

ঠাকুরাণীর একটি উক্তি হইতে তাহা জানা যায়। 'রাখালের সে ভাব নয়, ঝঞ্ঝাট বইতে পারে না। মনে মনে পারে, কি কারুকে দিয়ে করাতে পারে— রাখালের ভাবই আলাদা।' তথাপি মঠের প্রাথমিক নির্মাণ ও সংগঠনের সময়ে হাতে নাতে অনেক কাজই তাঁহাকে করিতে হইয়াছে।

তাঁহাকে দিয়া অধিক কায়িক পরিশ্রমের কাজ, যেমন হাঁড়ি মাজা ইত্যাদি, যাহাতে না করানো হয় তজ্জন্য স্বামিজী রামকৃষ্ণানন্দপ্রমুখ গুরুভ্রাতাদিগকে লিখিয়াছিলেন, 'রাখাল ঠাকুরের ভালবাসার জিনিস— একথা ভুলো না।' অথচ স্বামিজীর প্রতি প্রেম ও আনুগত্যবশতঃ আবশ্যকমত সকলপ্রকার কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের কাজই তিনি করিয়াছেন। ইহ সংসারে গুরুভাইদের মধ্যে ঈদৃশ প্রেম ও আনুগত্য তুলনারহিত; শ্রীরামকৃষ্ণ-সংঘের সমুন্নতি ও বিস্তারের বীজও ইহারই মধ্যে নিহিত।[১৩]

য়ুরোপ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া স্বামিজী বাগবাজারে পশুপতি বসুর ভবনদ্বারে উপনীত হইলে মহারাজ স্বহস্তে তাঁহাকে মাল্যভূষিত করিলেন, আর 'গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু' বলিয়া স্বামিজী তাঁহার পদবন্দনা করিবামাত্র 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা' বলিয়া প্রতিপ্রণাম করিলেন। সে কী সুন্দর দৃশ্য!

স্বামিজীর অভিপ্রায় অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতিরূপে মহারাজ উহার সাপ্তাহিক অধিবেশনগুলি পরিচালনা করিতেছেন; মিশন প্রতিষ্ঠার সমকাল হইতেই স্থানে স্থানে আর্ত-ত্রাণ কার্যও সুরু হইয়া গিয়াছে, তিনি অর্থাদি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেছেন ও

---

১৩ ১৮৯৫, ২২শে ডিসেম্বর তারিখের এক পত্রে মহারাজের তৎকালীন কর্মব্যস্ততার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। বিহিয়া (Behea) নামক স্থান হইতে তিনি লিখিয়াছেন: তোমার পত্রের জবাব দিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, তাহার কারণ কলিকাতা হইতে যোগেন মহারাজ কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেন, সেই সবগুলির জবাব দিতে আমি বড় ব্যস্ত ছিলাম…আমার শরীর ২।১ দিন ভাল ও ২।৪ দিন মন্দ, এইরূপ অবস্থায় চলিতেছে। বোধ করি কোন কারণ-বশতঃ আমাকে কলিকাতায় সত্বর যাইতে হইবে।…আজও ব্যস্ত, অনেক পত্রের জবাব দিতে হইবে।

কর্মস্থলে সেবককর্মী পাঠাইতেছেন ; মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়াই স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য স্বামিজী আলমোড়া চলিয়া গিয়াছেন, তিনি মঠ ও মিশন সংক্রান্ত কাজের রিপোর্ট প্রতি সপ্তাহে স্বামিজীর নিকট প্রেরণ করিতেছেন। দিন দিন কাজ এইরূপে বাড়িয়াই চলিল, যতদিন পর্যন্ত না আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া সারদানন্দ বহু কর্মের ভারই নিজের স্কন্ধে তুলিয়া নিলেন। 'এই ৮।৯ মাস তুমি যে কাজ করেছ, খুব বাহাদুরী দেখিয়েছ'—মহারাজকে স্বামিজী লিখিয়াছিলেন ( ৩০শে নভেম্বর, ১৮৯৭ )।

কাজের ভার অনেকটা লাঘব হইলেও, গুরুদায়িত্বপূর্ণ কাজগুলি হইতে তিনি শীঘ্র রেহাই পাইলেন না। বেলুড়ে জমি কেনা হইয়া মঠের নির্মাণকার্য চলিয়াছে ; স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহাকে পরামর্শ দিয়া ও তাঁহার পরামর্শ লইয়া, মহারাজ যাবতীয় কাজ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। ট্যাক্স মকুব করিতে নারাজ হওয়ায় পৌরপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মঠের মকদ্দমা বাঁধিয়াছে ; উকিল এটর্ণীর বাড়ীতে ছুটাছুটি করিয়া তিনি সেই মকদ্দমার তদ্বির করিতেছেন। আবার মঠের তহবিল তাঁহারই জিম্মায় আছে ; দেশে ফিরিয়া স্বোপার্জিত সকল অর্থই স্বামিজী তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন।[১৪] ১৮৯৮ হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচখানি তাঁহার স্বহস্তলিখিত ডায়েরীতে ঐ সময়ের বিভিন্ন কাজে আয়ব্যয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব সংরক্ষিত আছে।

অনেকদিন অসুখে ভুগিয়া শ্রীশ্রীমার একান্তসেবক স্বামী যোগানন্দ সমাধিযোগে দেহত্যাগ করেন ( ২৮শে মার্চ, ১৮৯৯ )। গভীর শোকে মহারাজ

---

১৪ আমেরিকা হইতে ফিরিয়াই কিছু টাকা ( দশ হাজার ) মহারাজের হাতে দিয়া স্বামিজী বলিয়াছিলেন, রাখাল, এই টাকাটা তুই মাকে দিয়ে আয়। মাকে তোমার নিজের হাতে দেওয়া উচিত—মহারাজের এই কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন, না, তুইই দিয়ে আয়, আমি দিলে লোকে মনে করবে মা-ভাইদেব না জানি কত টাকাই দিয়েচে, মঠকে আর কী দিয়েচে ! [ হরিহরানন্দ-কথিত ]

একাদিক্রমে চারিমাস নিরামিষ আহার করিয়াছিলেন; যোগানন্দের সঙ্গে তিনি প্রগাঢ় সখ্যপ্রেমে আবদ্ধ ছিলেন।

নিজস্ব বাড়ীতে মঠ উঠিয়া আসিবার পর একদিন বহু উপচারে মহারাজকে ভোজন করাইয়া যুক্তকরে স্বামিজী বলিয়াছিলেন, 'রাজা, তোর আদর ঠাকুর জানতেন, আমরা কী জানি যে, তোর আদর করব?' পরে একদিন মহারাজের নামে মঠ ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিয়া সেইদিনই তিনি আমেরিকা যাত্রা করেন (২০শে জুন, ১৮৯৯)। এই অর্পণনামায় অপর গুরুভ্রাতারা সাক্ষীরূপে সহি করিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজ তাহা মানিয়া লইতে সম্মত হইলেন না। অতঃপর স্বামিজী তাঁহার গুরুভ্রাতাদের এগার জনকে বেলুড় মঠ ঠাকুরবাটীর ট্রাষ্টী নিযুক্ত করিতেছেন এই মর্মে দলিল নিষ্পাদিত হয়, এবং ঐ দলিল রেজিষ্ট্রী হওয়ার চারিদিন পরে আহূত ট্রাষ্টী-দিগের প্রথম সভায় মহারাজ মঠের সভাপতি নির্বাচিত হন (১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০১)। স্বামিজী সভায় উপস্থিত ছিলেন; রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সভাপতির পদ হইতে নিজেকে অপসারিত করিয়া পূর্বেই তিনি সেই পদেও মহারাজকেই মনোনীত করিয়াছিলেন।

স্বামিজীর শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। অভীষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করিয়া, নিঃশেষে নিজের সুবিপুল তপঃশক্তি জগৎকল্যাণে ব্যয়িত করিয়া, 'অখণ্ডের ঘর' ঋষি এখন ঘরমুখো। বাজে গল্পগুজব করিয়া, কতকটা ছেলে-ভুলানোর মত, মহারাজ তাহার ধ্যাননিষ্ঠ মনকে বহির্জগতে ধরিয়া রাখিতে সচেষ্ট থাকিতেন, ঠাকুরই নাকি ঐরূপ করিবার নির্দেশ তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণে চটিয়া গিয়া স্বামিজী যখন অকথ্য গালি-গালাজ করিতে থাকিতেন, কোমলপ্রকৃতি মহারাজ উহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি সেস্থান হইতে সরিয়া পড়িতেন; কখনো বা নিজের ঘরে দরজা ভেজাইয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতেন, আর উত্তেজিত হওয়ার ফলে স্বামিজীর শরীর আরও খারাপ হইবে ভাবিয়া চিন্তাকুল হইতেন। রাগ পড়িয়া গেলে স্বামিজী হয়তো ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, আর কত কী বলিয়া

মার্জনা চাহিতে লাগিলেন—রাজা ভিন্ন অপর কেই বা তাঁহার বদ্‌মেজাজের বকুনি সহ্য করিবে!

স্বয়ং উপযাচক হইয়া রাজাও একএক দিন স্বামিজীর সঙ্গে কলহ বাঁধাইয়া বসিতেন। স্বামিজীর পালিত, তাঁহার আদরের মটরু, হংসী (ভেড়া, হরিণ) প্রভৃতি মহারাজের বাগানের সীমার ভিতর অনধিকার প্রবেশ করিলেই ঐ প্রেমকন্দলের সূত্রপাত হইত, আর যেকেহ তাঁহাদের এই বালকবৎ আচরণ লক্ষ্য করিত সেই মুগ্ধ না হইয়া পারিত না।

স্বামিজী প্রতিমায় দুর্গাপূজা করিতে ইচ্ছা করিলে, অত্যল্প কালের মধ্যেই উহার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া গুরুভাইরা তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। স্বামিজীর যেকোন আদেশ পালন করিতে, যেকোন ইচ্ছা পূর্ণ করিতে তাঁহারা যেমন তৎপর থাকিতেন, স্বামিজীও তেমনি ব্যক্তিগত ব্যাপারে, যেমন চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থায়, তাঁহাদের কথা মান্য করিয়া চলিতেন। স্বামিজীর দেহে শোথের বাহুল্য ঘটিলে বিষম চিন্তিত হইয়া মহারাজ কবিরাজী চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন, এবং স্বয়ং তাঁহার সেবায় ব্রতী হইয়া তাঁহাকে কতকটা সুস্থ করিয়াও তুলিলেন। কিন্তু এত করিয়াও তাঁহাকে রাখিতে পারিলেন না।

স্বয়ং দিন নিরূপণ করিয়া স্বামিজী মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন, এবং পূর্বাহে কাহাকেও কিছুমাত্র বুঝিতে না দিয়া রাত্রি ৯টা ১৫ মিনিট সময়ে মহাসমাধিমগ্ন হইলেন (৪ঠা জুলাই, ১৯০২)। সংবাদ পাইয়া, গভীর রাত্রে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া, শোকাবেগে মহারাজ তাঁহার প্রিয়তম ভ্রাতার দেহের উপর লুটাইয়া পড়িলেন!

স্বামিজীর তিরোভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালনার সমুদয় দায়িত্ব মহারাজ ও তাঁহার সহকর্মিগণের, বিশেষতঃ যাহাদিগকে স্বামিজী ট্রাষ্টী করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের উপর বর্তাইল। আর স্বামিজীর বিয়োগজনিত দুঃখ অপগত না হইতেই, ঐ উদীয়মান মহাসংঘের নেতৃত্বের প্রতিস্পর্ধী হইয়াই যেন,

পরপর দুইটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়া গেল। ঐ দুইটি ঘটনার একটি বিস্মৃতির গর্ভে বিলীনপ্রায় হইয়াছে, অপরটিকে অর্বাচীন লেখকগণের যথেচ্ছ লেখনী চালনা কিছুটা মুখর করিয়া তুলিয়াছে।

স্বামিজীর শিষ্যা আইরিশ মহিলা মিস্ মার্গারেট নোবল, যিনি সিষ্টার নিবেদিতা নামে সমধিক পরিচিতা, নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ করার সংকল্প লইয়া তাঁহার গুরুদেবের সঙ্গে ভারতে আসেন, এবং আন্তরিক চেষ্টায় এদেশের ভাবধারা ও জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে অনেকটা খাপ খাওয়াইয়া লইতেও সমর্থ হন। এই প্রতিভাশালিনী মহিলার লেখনীমুখে হিন্দুর ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, শিল্পকলা—এককথায় তাহার সংস্কৃতি—যেমন অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা অনবদ্য। আবার সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্পকলার ক্ষেত্রে যাঁহারা এদেশে অগ্রণী তাঁহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া তিনি প্রেরণা দিয়াছেন, সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করিয়া কাহারও বা পেছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। স্বামিজীর গুরুভাইরা নিবেদিতাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে ভালবাসিতেন।

ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করিয়া নিবেদিতাকে স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত করিয়া নিয়াছিলেন। মঠের অঙ্গগণের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান দূরের কথা, মঠে রাজনীতিচর্চাও তিনি নিষিদ্ধ করিয়া যান। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কূটনীতিচর্চা প্রশ্রয় পাইলে স্বভাবতই আধ্যাত্মিকতার অপমৃত্যু ঘটে, এবং ধর্মের খোলসটি মাত্র বজায় রাখিয়া উহা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ভারতপ্রেমিকা নিবেদিতা স্বভাবতই এদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্না ছিলেন এবং ঐ আন্দোলনের সঙ্গে গোপনে যোগ রক্ষা করিয়াও চলিতেন। স্বামিজীর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সেই গোপনতার আড়াল তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলেন, এবং অশ্বিনীকুমার দত্ত-প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে থাকেন। মহারাজ ও তাঁহার সহ-কর্মীরা যখন নানা ভাবনাচিন্তায় বিমূঢ় ও ব্যতিব্যস্ত, সেই দুঃসময়ে নিবেদিতার আচরণ তাঁহাদিগকে আরও ভাবাইয়া তুলিল। দুইদিন তাঁহারা এই বিষয়

নিয়া নিবেদিতার সঙ্গে আলোচনা করিলেন, নিবেদিতা ব্যক্তিগত অখণ্ড স্বাধীনতার দাবি করিয়া বসিলেন। এই অবস্থায় অগোণে তাঁহার দাবি পূর্ণ করিয়া দেওয়াই সঙ্গত বিবেচিত হইল ; নিবেদিতার ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের জন্য মঠের কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না, এই মর্মে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইল ( ১৯শে জুলাই, ১৯০২ )।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী নিবেদিতাকে স্বামিজী কাশী হইতে পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি ব্যক্তিবিশেষকে সহকর্মীরূপে গ্রহণ করিতে নিবেদিতাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, আর সকল ব্যাপারে কেবলমাত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দের উপদেশ ও সাহায্য লইয়া চলিতে বলিয়াছিলেন। নিবেদিতা ঐ দুইটি কথার একটিও রক্ষা করিতে পারেন নাই।[১৫]

অনুমান করা কঠিন নহে যে, নিবেদিতা-ঘটিত ব্যাপার তৎকালে মঠের ভিতরে ও বাহিরে কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। নিবেদিতার ব্রাহ্মবন্ধুরা তাহাতে মঠের ধ্বংস-সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া উল্লসিত হইয়াছিলেন।[১৬] আর

---

১৫ স্বামিজীর পত্রের কিয়দংশ এইরূপ :

My dear Margo.

... ... ...I recommend you none—not one—except Brahmananda. That "old man's" judgment never faild—mine always do. If you have to ask any advice or to get anybody to do your business Brahmananda is the only one I recommend, none else, none else. With this my conscience is clear.

[ স্বামী নির্লেপানন্দ হইতে প্রাপ্ত ]

১৬ নিবেদিতার ঘটনা উপলক্ষ করিয়া 'ভারতী' পত্রিকায় ( ভাদ্র, ১৩০৯ ) নিম্নোক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশিত হয় :

"কালব্যাধি-আক্রান্ত বিবেকানন্দ স্বামী তাঁহার সমস্ত কল্পনা অসিদ্ধ রাখিয়াই অকালে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "মিশন" এখনও ভাগীরথীতীরে সৌধ নির্মাণ করিয়া খাড়া রহিয়াছে। সেই সৌধ বা 'মঠ'বাসী পুরুষগণের উপর আমাদের এখনও অনেক ভরসা। তাঁহারা নামে সন্ন্যাসী, গৃহস্থাশ্রম বর্জন করিয়াছেন, মুক্ত। অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-মাতা-পিতা-আত্মীয়-পরিবার প্রতিপালনের কর্তব্য হইতে নিজেদের বিমুক্ত করিয়াছেন,

স্বামিজীর শিষ্যগণের কেহ কেহ—তন্মধ্যে গৃহস্থশিষ্যও আছেন—'আমাদের গুরুর মঠ, আমরাই স্বামিজীর ম্যাণ্ডেট (আদেশ) কাজে পরিণত করব' ইত্যাদি ধ্বনি তুলিয়া একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছিলেন। মঠের

---

সাধারণ গৃহীর যে দায়িত্বভার ততটুকু দায়িত্বও তাঁহাদের নাই। কিন্তু সেই ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত দায়িত্বের পরিবর্তে কোন্ বৃহৎ জাতীয় দায়িত্বভার তাঁহারা স্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছেন? দেশের লোকের তাঁহাদের প্রতি এপ্রশ্ন করিবার অধিকার আছে।

"সর্বসাধারণের ন্যায় প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান, চাযোগ, স্বেচ্ছামত কিছু অধ্যয়নাদি বা অনধ্যায়, স্নানাহার, দিবানিদ্রা, সান্ধ্যবিহার, গোসগল্প, আহার ও শয়ন—ইহার বেশী তাঁহাদের জীবনচরিতের বর্ণিতব্য বিষয় যদি কিছু না থাকে তবে ঐ মঠভানী সৌধ ভাগীরথী-জলে লীন হইয়া গেলেও দেশের কোন ক্ষতি নাই।

"একবার একজন ইংরাজ ললনার উৎসাহে ও উত্তেজনায় রামকৃষ্ণ মিশনের দুই একজন সন্ন্যাসী প্লেগের সময় অনেক প্রকৃত কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু উঁহার স্বদেশে অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনও নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তর্হিত করিয়াছিল। উক্ত ইংরাজ ললনা পুনরাগতা; তাঁহার ধনজন, শরীর ও মন সমস্তই আমাদের দেশের কল্যাণোদ্দেশ্যে সৎসর্গ করিয়া, একান্ত নিষ্ঠার সহিত তিনি আমাদের মধ্যে আমাদেরই মত করিয়া বাস করিয়া কাজ করিতেছেন, তাঁহাকে দেশের সকল সদনুষ্ঠানেই সর্বত্রই দেখিতে পাইতেছি,—এবার দেখিতেছি না তাঁহার পার্শ্বে, পার্শ্বচর রামকৃষ্ণ-সন্ন্যাসীদের। বিবেকানন্দ স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে তিনি প্রকাশ্যতঃ সংবাদপত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধবিচ্ছেদ ঘোষণা করিয়াছেন।

"ভালই। বিদেশীয়া রমণীর অঞ্চল ধরিয়া লোকসমাজে উপস্থিত না হইয়া, রামকৃষ্ণ মিশন নিজের পুরুষকারে নিজের উপর ভর করিয়া আসিয়া দাঁড়াক। দেশে এই মিশনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা সপ্রমাণ করুক। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীর দল ভাগীরথী-তীরের নিষ্কর্মা অলসজীবন ছাড়িয়া নিষ্কামকর্ম জগতে নামিয়া আসুন।......মঠধারী [মঠের অধ্যক্ষ?] ও তাঁহার অনুচরগণ যদি এখনও কূর্মের ন্যায় নিজেদের আত্মশরীরে লুপ্ত ও গুপ্ত রাখেন—কর্মীর অপ্রতিহত তেজে বাহির হইয়া না আসেন, তবে এই হতভাগ্য দেশকে ধিক্।"

প্রাঙ্গণে কাঁঠালতলায় তাঁহাদের দুইএকটা মুখর ভাষণও যে না হইয়াছিল এমন নহে।[১৭]

তুরীয়ানন্দ এই সময়ে আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। আমেরিকার কাজ সম্বন্ধে স্বামিজীর সঙ্গে পরামর্শ করাই ছিল তাঁহার এই ভারতাগমনের উদ্দেশ্য। রেঙ্গুনে পৌঁছিয়া, জাহাজে থাকিয়াই তিনি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় স্বামিজীর মহাসমাধির খবর বড় বড় হরফে মুদ্রিত দেখিতে পান। স্তম্ভিত ও অভিভূত হইয়া আমেরিকায় ফিরিবার সকল ইচ্ছা তিনি মন হইতে মুছিয়া ফেলেন, এবং কলিকাতায় পৌঁছিয়া, জাহাজ হইতে অবতরণের পূর্বেই ঘড়ি ইত্যাদি মূল্যবান জিনিসগুলি গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করেন। মঠে আসিয়াই তিনি বৃন্দাবনে চলিয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু মহারাজ তাঁহাকে দিন কয়েক বিশ্রাম না করিয়া যাইতে দিলেন না। কয়েকদিন পরে মহারাজও তাঁহার অনুগমন করিলেন, এবং বৃন্দাবনে উভয়ে একই বাড়ীতে থাকিয়া পূর্ববৎ জপধ্যান করিতে লাগিলেন। মহারাজ কি তাঁহার এই প্রিয় গুরুভ্রাতার মনের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, অতিকঠোরতায় তাঁহার দেহত্যাগ সম্ভাবনা আশঙ্কা করিয়াছিলেন? বৃন্দাবনে তিনি তৈজসপত্রাদি আনাইয়া, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলালকে দিয়া রান্না করাইয়া খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, এবং কিছুকাল পরে বৃন্দাবন হইতে চলিয়া আসিবার সময় কৃষ্ণলালকে তথায় রাখিয়াও আসেন। তিনি চলিয়া আসিবার পরেই কিন্তু তিতিক্ষামূর্তি তপস্বী আর কাহারও সেবা গ্রহণ করিলেন না, তিনি পূর্ববৎ মাধুকরী করিয়াই খাইতে লাগিলেন। বিন্ধ্যাচলে আসিয়া মহারাজ তাঁহাকে পত্র লিখিলেন: "আপনার সঙ্গে বৃন্দাবনে যে আনন্দ পাইয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। পূর্বকথা সব জাগরূক হইয়াছিল। আবার কর্মের ভিতর যাইয়া পড়িব। পুনরায় আপনার সঙ্গলাভের জন্য মন উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।"[১৮]

---

১৭ স্বামী শুদ্ধানন্দের নিকট অনেকে এই ঘটনাটি শুনিয়াছিলেন। শুদ্ধানন্দজী সরল স্পষ্টবক্তা ছিলেন, এই সাধুচিত সদ্‌গুণের জন্য মহারাজও তাঁহাকে ভালবাসিতেন।

১৮ হরি মহারাজের সেবক ভবেশানন্দ হইতে প্রাপ্ত।

সবার অলক্ষ্যে 'ব্রজের রাখাল' বৈরাগ্যের গলায় অনুরাগের ডুরি পরাইয়া রাখিলেন। এই ডুরির আকর্ষণে, আট বৎসর পরে হইলেও, তুরীয়ানন্দ মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

বৃন্দাবন হইতে মহারাজ নূতন শক্তি ও প্রেরণা লইয়া ফিরিলেন। ঠাকুর যে তাঁহার এই মানসপুত্রের ভিতর প্রকট রহিয়াছেন, তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার গুরুভাইরা এখন হইতে ইহা বিশেষভাবে অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই প্রকট মহাশক্তির চরণে বিদ্রোহীদের শির আপনা হইতেই অবনত হইল, আনুগত্য স্বীকার করিয়া কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পরিচালিত হইতে তাহাদের মনে আর দ্বিধা রহিল না। এইরূপই যে ঘটিবে স্বয়ং ঠাকুরই তাহা জানাইয়া দিয়াছিলেন; মহারাজের মুখে এই কথাটি তখন কেহ কেহ শুনিতে পাইয়াছেন—'ঠাকুর বল্লেন, শালারা সব কেঁচো হয়ে যাবে।'

গুরুদায়িত্বভার স্কন্ধে নিয়া কর্মক্ষেত্রে নামিবার মুখেই এই যে তিক্ত অভিজ্ঞতাটি হয়ে গেল, মহারাজ তাহা বিস্মৃত হন নাই। গুরুভক্তির তথাকথিত আতিশয্যে গুরুকে কেন্দ্র করিয়া—সেই গুরু শক্তিমান মহাপুরুষই হউন বা সাধারণ মানুষই হউন—শিষ্যদের দলবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা সকল সময়েই আছে, আর এই দলবদ্ধতা অনৈক্য সৃষ্টি করিয়া সহজেই ধর্মসংঘকে দুর্বল করিয়া ফেলিতে পারে। তাঁহার নিজের শিষ্যদের বেলায়ও ঐরূপ ঘটার সম্ভাবনা একেবারেই নাই কি? হয়তো নাই। কিন্তু তাঁহার ইহজীবনের শেষের দিকে দেখা গেল, তাঁহার প্রত্যক্ষ সেবকদের চারিজনের মধ্যে তিনজনই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য; আর তাঁহার নিজের প্রিয় শিষ্যেরা, যাঁহারা দীর্ঘকাল সেবা করিয়া তাঁহার সন্তোষবিধান করিয়াছেন তাঁহারা দূরে দূরে থাকিয়া তপস্যায় নিরত!

গুরুকে কেন্দ্র করিয়া দলবদ্ধ হওয়ার প্রয়াস পরেও মঠে দুইএক বার হইয়াছে, সে প্রয়াস যতই তুচ্ছ হউক না কেন; আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মহারাজের নীতি অনুসরণ করিয়া সূচনাতেই কর্তৃপক্ষ তাহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। মহারাজের দূরদৃষ্টির, তাঁহার রাজবুদ্ধির ইহা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে, ঠাকুরের জন্মোৎসবের পরে, মহারাজ সান্নিপাতিক জ্বরে আক্রান্ত হন, এবং চিকিৎসা ও পথ্যের সুবন্দোবস্তের জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় বসু-ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। সেই সময়ে তাঁহার তত্ত্বাবধানে মঠের পোস্তা নির্মিত হইতেছিল, আর মঠের তহবিলও তাঁহারই জিম্মায় থাকিত। শরৎ মহারাজ মঠের যাবতীয় কাজ পরিদর্শনের ও টাকাকড়ির সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিন বৎসরের জন্য বুড়োবাবার (দীনু মহারাজের) উপর ন্যস্ত করেন।

দীর্ঘ একচল্লিশ দিন পরে জ্বরের উপশম হয়। এই অসুখ হইতে মহারাজের জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বালকভাবটিও বিশেষ-ভাবে প্রকট হইয়া উঠে। জ্বর আর হয় না, অন্নপথ্যও করিয়াছেন, কিন্তু স্নানের নামটিও নাই ; স্নানের কথা কেহ বলিলেই কেমন যেন ভয় পাইয়া যান —শরীরে জলস্পর্শ ঘটিলেই জ্বর ফিরিবে! গঙ্গার নির্মল নির্মুক্ত হাওয়া স্বাস্থ্যলাভের অনুকূল, কিন্তু গাড়ীতে করিয়া অদূরবর্তী গঙ্গাতীরে যাইতেও নারাজ—গাড়ী চলিতে সুরু করিলেই নাড়ী ছাড়িয়া যাইবে! বলিয়া কহিয়া সাহস দিয়া ও হাতে ধরিয়া আনিয়া শরৎ মহারাজ তাঁহাকে ছোট ছেলেটির মত নাওয়াইতেন, এবং ঐ একই ভাবে গাড়ীতে তুলিয়া গঙ্গার ধারে বেড়াইতেও লইয়া যাইতেন। কিছুদিন এইভাবে চলিবার পর তাঁহার ভয়ের ভাবটি কাটিয়া যায়। শিশু যেমন একটুতেই ভয় পায়, কিন্তু মুরুব্বি কেহ হাত ধরিবামাত্র নিশ্চিন্ত হয়, মহারাজের ভাবও ছিল অনেকটা সেই রকম।[১৯]

জীবনসায়াহ্নে, বেলুড় মঠে দোতলার বারান্দায় বসিয়া, সেবকদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন : জ্বর তো সেরে গেল, কিন্তু একটা দারুণ নাস্তিক্যভাব এসে পীড়া দিতে লাগল। দেবতাদের, এমনকি ঠাকুরের উপরেও আর বিশ্বাস হয় না! এমনই যন্ত্রণাদায়ক সে অবস্থা যে, আর কিছুদিন এভাব থাকলে শরীর থাকত না। শরৎকে একথা বলাতে সে বল্ল, এ জ্বরের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়, অনেকদিন ভুগেচ কিনা—টাইফয়েড জ্বরে মস্তিষ্ক বড় দুর্বল

১৯ এই সময় হইতে শেষ পর্যন্ত তিনি নিত্য স্নান করিতেন না ও সবদা গরম জল ব্যবহার করিতেন।

করে দেয়। সে ব্যবস্থা করে, একপ্রকার জোর করেই আমাকে পুরীতে নিয়ে গেল। সেখানে কিছুদিন জগন্নাথ দর্শন করে ও মহাপ্রসাদ খেয়ে খেয়ে নাস্তিক্যভাবটা ক্রমশঃ কেটে যায়।

পুরী হইতে ফিরিয়া আসিবার পর হইতে মহারাজ একসঙ্গে অধিকদিন বেলুড় মঠে থাকিতেন না, থাকিতে গেলেই তাঁহার শরীর খারাপ হইত। সেজন্যই পাঁচসাত দিন মঠে থাকিয়াই বসু-ভবনে চলিয়া যাইতেন। বলরাম-বাবুর পুত্র রামবাবু ( রামকৃষ্ণ বসু ) একান্ত ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করিতেন। কদাচিৎ শীতকালে ও ঠাকুরের জন্মোৎসবের সময় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিত—একনাগাড়ে কিছু বেশীদিন তিনি মঠে বাস করিতেন।

জীবনের অবশিষ্ট আঠারো বৎসর কাল বহিরঙ্গ কাজের ঝঞ্ঝাট হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিয়াও মহারাজ সকল কাজের প্রেরণাস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতেন। তাঁহার পরামর্শ না নিয়া মঠ ও মিশনের কোনও গুরুতর কার্যই নিষ্পন্ন হইত না। যে বিষয়ে কর্তৃপক্ষীয় সকলে একমত হইতে বা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে না পারিতেন, সেই বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাঁহারা মহারাজের মুখাপেক্ষী হইতেন, আর তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিতেন নির্বিচারে তাহাই মানিয়া লইতেন। ইহার ফল ভাল বই মন্দ কখনো হয় নাই।

মঠের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায় বা মিশন সংক্রান্ত কাজগুলির ব্যবস্থাপনায় বাবুরাম মহারাজ ও শরৎ মহারাজের কাজে কখনও কোনওরূপে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় না। বরং সর্বতোভাবে তাঁহাদের কাজ সমর্থন করিয়াই গিয়াছেন, আর তাঁহাদের মত সমর্থ সহকর্মীর বিশ্বস্ততায় নিজেও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিয়াছেন। বিগত দিনের কথা স্মরণ করিয়া স্বল্পভাষী শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, মহারাজের অধীনে কাজ করা সুখের ছিল।

ময়মনসিংহে অবস্থানকালে ( জানুয়ারী, ১৯১৬ ) কথায় কথায় বাবুরাম মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন, আমি যে মঠে নবাগত ছেলেদের শাসন করি,

গালমন্দ করি, তাতে তারা আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট। মহারাজ কহিলেন, তুমি যে গালমন্দ কর এ তাদের মহাসৌভাগ্য। স্বামিজী আমাদের যে গালমন্দ করতেন, আমরা যদি তার শতাংশের একাংশও করতুম তা হলে কবে তারা মঠ থেকে পালিয়ে যেত।

রামকৃষ্ণ মিশনের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান কাশী সেবাশ্রমের অভ্যন্তরে গোলযোগ চলিতেছে খবর পাইয়া শরৎ মহারাজ স্বয়ং কাশীতে যাইয়া উপস্থিত হন, এবং অনুসন্ধানে সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া, উহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নূতন বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভব করেন। তাঁহার প্রণীত নূতন বিধিগুলির মধ্যে সেবাশ্রমের ভিতরের ও বাহিরের সাধুদের লইয়া একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করার কথাও ছিল। ব্যক্তিবিশেষের পরিবর্তে সমিতির কর্তৃত্ব মানিয়া লইতে অনিচ্ছুক হইয়া কর্তা,ব্যক্তিদের কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, মহারাজ যদি বলেন তবে আমরা একথা মেনে নিতে সম্মত আছি। নিরভিমান শরৎ মহারাজ অমনি বলিলেন, ঠিক কথা বলেচ, আমরা সকলেই যখন মহারাজকে মানি তখন তিনি যা বলবেন তাই হবে। মহারাজের নিকট হইতে পত্র আসিল: 'শরৎ যাহা করিতেছে তাহা আমার ব্যবস্থা বলিয়া জানিবে।'

কর্তৃত্বের অহমিকা অনাত্মদর্শী জীবকে নিষ্কৃতি দিতে চাহে না। বৎসরান্তে খবর আসিল, সেবাশ্রমের গোলযোগ মিটে নাই, নূতন বিধি অনুযায়ী কাজও হয় নাই। মহারাজকে সঙ্গে নিয়া শরৎ মহারাজ আবাব কাশীতে আসিলেন, আরও অনেক সাধু এবং গৃহস্থ ভক্তেরাও তাঁহাদের সঙ্গে আসিলেন ( ২০শে জানুয়ারী, ১৯২১ )। কাজকর্মের কোনও কথাই হইল না, রাতদিন ভগবৎপ্রসঙ্গ ও সাধনভজনের একটানা স্রোত বহিয়া চলিল। আনন্দনগরী কাশীতে আনন্দময়বিগ্রহ মহারাজকে কেন্দ্র করিয়া এক অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্ট হইল। সেই পবিবেশের প্রভাবে প্রায় সকলেরই মন যখন ঊর্ধ্বমুখী, মহারাজের ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়া সকল অশান্তির কারণীভূত ব্যক্তিরা— তন্মধ্যে কেহ কেহ সন্ন্যাস লইয়া—দূরে সরিয়া পড়িলেন, এবং শরৎ মহারাজের কৃত ব্যবস্থাগুলিও সম্পূর্ণরূপে প্রবর্তিত হইল। মহারাজকে সম্বোধন করিয়া

শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, সাধু না হয়ে তোমার রাজা হওয়া উচিত ছিল; আমি আর হরি মহারাজ দুজনের মিলিত বুদ্ধিতেও যেখানে কূল দেখতে পাচ্ছিলুম না, কত সহজে তার কিনারা করে দিলে! হরি মহারাজ তখন কাশীতেই থাকিতেন।

ভাবময়বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জীবনের শেষ আঠারো বৎসর পুরীধামে বাস করিয়া ক্ষেত্রমাহাত্ম্য পরিবর্ধিত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরাজ্যের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী মহারাজও জীবনের শেষার্ধে বহুবার পুরীতে আসিয়াছেন ( ১৯০৪-১১, ১৫, ১৭, ২০ ), এবং একনাগাড়ে ছয় মাস ধরিয়াও ক্ষেত্রবাস করিয়াছেন। পুরীতে থাকিবার কালে, কিংবা যাতায়াতের পথে, কখন কখন তিনি বলরামবাবুদের জমিদারী কোঠারে ও ভদ্রকে যাইয়া কিছুদিন বাস করিতেন। সাধারণতঃ রথযাত্রার পূর্বে, মে মাসে তিনি পুরীতে যাইতেন। একবারের রথযাত্রা সম্বন্ধে সেবক বলিতেছেন :

যথাসম্ভব সত্বর খাওয়াদাওয়া সারিয়া মহারাজ ও হরি মহারাজকে নিয়া আমরা এমার মঠের বাগানে গেলাম। ঐ বাগান গুণ্ডিচাবাড়ী যাইবার পথের বাঁধারে। মহারাজ ও হরি মহারাজের জন্য এমার মঠের মোহন্ত দুইখানি আরাম কেদারা ও আমাদের জন্য সতরঞ্চের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হরি মহারাজের গায়ে ছিল একটি ফতুয়া ও একখানি চাদর; চাদরখানি কোমরে জড়াইয়া, মালকোঁচার ঢঙে কাপড়খানি পরিয়া, ছেলেমানুষের মত দৌড়াইয়া গিয়া রথের রজ্জু ধরিলেন। মহারাজ কহিলেন, তোরা একজন হরি মহারাজের কাছে যা, ভিড়ের চাপে যদি পড়ে টড়ে যান। দুইজন ছুটিয়া গিয়া হরি মহারাজকে আগলাইতে লাগিল। মহারাজ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রোমাঞ্চিত হইতেছিল তাঁহার শরীর, মাথাটা ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছিল আপনা হইতে। হাত দুইটি অঞ্জলিবদ্ধ। রথ কাছে আসিতেই আমরা আগাইয়া গেলাম ও মহারাজের হাতে রজ্জু ধরাইয়া দিলাম। অল্পদূর গিয়াই তিনি রজ্জু ছাড়িয়া দিলেন। হরি মহারাজ কিন্তু রজ্জু ধরিয়া অনেক-

দূর চলিয়া গিয়াছিলেন। এমনি করিয়া তিনখানি রথই টানা হইল। ইহার কয়েক দিন পরে গুণ্ডিচাবাড়ীতে আমাদের প্রসাদ পাওয়ার ব্যবস্থা হয়। একখানি ঘরে ভোগের মহাপ্রসাদ সব পাণ্ডারা সাজাইয়া দিয়াছিল। একটি বড় পলাশ পাতায় অন্ন ঢালা হইল, অপর একটিতে কাণিকা প্রসাদ। দুইটি হাঁড়িতে ছিল ডাল, আর ছিল অনেক রকমের ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি। মহারাজ ও হরি মহারাজ মাটিতেই বসিয়া পড়িলেন ও আমাদিগকে বলিলেন, তোরা চারধার দিয়ে বস্। তাঁহারা খাইতে আরম্ভ করিলেন ও আমাদিগকে বলিলেন, তোরাও খা, একসঙ্গে মহাপ্রসাদ খেতে হয়।

ভুবনেশ্বর মহাতীর্থে, নির্জনবাস ও তপস্যার অনুকূল স্থানে, একটি মঠ করিতে অভিলাষী হইয়া মহারাজ জমি দেখিবার জন্য অমূল্য মহারাজকে তথায় পাঠাইয়া দেন, এবং দুর্গাপূজার পরে স্বয়ং জমিটি দেখিতে আসিয়া তিনদিন তথাকার স্যানিটোরিয়ামে বাস করেন (১৯১৭)।[২০] যে জমিটি ক্রয় করার কথা হইতেছিল তাহা আম, নিম, কুঁচিলা ও বুনো গাছে পরিপূর্ণ —একটা ছোটখাট বন বলিলেই হয়। তিনি জমি পছন্দ করিলেন, এবং অমূল্য মহারাজের তত্ত্বাবধানে দুই বৎসরের মধ্যেই বাসোপযোগী নির্মাণকার্য সম্পূর্ণপ্রায় হইলে, গৃহপ্রবেশ করিলেন (৩১শে অক্টোবর, ১৯১৯)। এই সময় হইতে পুরীর পরিবর্তে তিনি ভুবনেশ্বরেই বাস করিতেন। মধ্যে একবার

২০ স্যানিটোরিয়ামে এই সময়ে মহারাজের পূর্বপরিচিত এক ভদ্রলোক বায়ুপরিবর্তনে আসিয়াছিলেন; তিনি ব্রাহ্মভাবাপন্ন। মহারাজ তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ভাবের অনুকূল প্রসঙ্গ করিতেন। রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা—এই কথায় তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হৃদয়মধ্যে যিনি বাস করেন, দেহরথে যিনি সদা আসীন, তাঁকে যাঁরা দর্শন করেন তাঁদের আর জন্ম হয় না।

পুরীর পুলিশ অধিকর্তা সখিচাঁদবাবু একবার ভুবনেশ্বরে মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। সেবক ভবানীচরণকে মহারাজ কহিলেন, একটা গান গাও, সৃষ্টির গানটা। ভবানী গাহিলেন, 'একরূপ অরূপ-নাম-বরণ।' সখিচাঁদবাবু জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন।

মাত্র দুইতিন সপ্তাহের জন্য পুরীতে গিয়াছিলেন (১৯২০)। গৃহপ্রবেশের পরের বৎসর ভুবনেশ্বর মঠে প্রতিমায় কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।[২১]

তিনবার মহারাজ দক্ষিণদেশ পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন, এবং প্রথমবারে প্রায় দশ মাস (১৯০৮-৯), দ্বিতীয়বারে প্রায় নয় মাস (১৯১৬-১৭), ও তৃতীয়বারে প্রায় সাত মাস (১৯২১) মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোর মঠে থাকিয়া ঐদেশের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থসমূহ সন্দর্শন করেন।

প্রথমবারে পূজনীয় শশী মহারাজ তাঁহাকে পুরী হইতে মাদ্রাজে আনয়ন করেন। সেখান হইতে তিনি মাদুরা ও রামেশ্বরে যান এবং ঐ দুই তীর্থের প্রত্যেকটিতে ত্রিরাত্র বাস করেন। মাদুরায় ৺মীনাক্ষীদেবীর জীবন্ত দর্শন লাভে তাঁহার গভীর সমাধি হয় ও জনতার ভিড়ের মধ্যে একঘণ্টা কাল শশী মহারাজ তাঁহার দেহ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। রামেশ্বরে সোনা রূপা ও তামার অষ্টোত্তরশত বিল্বপত্র দিয়া তিনি শিবের অর্চনা করিয়াছিলেন। ২০শে জানুয়ারী তিনি নবনির্মিত বাঙ্গালোর মঠের দ্বারোদ্ঘাটন করেন ও মে মাসের প্রারম্ভে পুরীতে ফিরিয়া যান।

দ্বিতীয়বারে পূজনীয় তুলসী মহারাজ (নির্মলানন্দ) তাঁহাকে কলিকাতা হইতে সঙ্গে লইয়া যান। মাদ্রাজে নূতন মঠবাড়ীর ভিত্তিস্থাপন করিয়া তিনি বাঙ্গালোরে আসেন (১২ই আগষ্ট) ও তিন মাসের অধিককাল সেখানে বাস করেন। বাঙ্গালোর হইতে বিভিন্ন সময়ে যাইয়া শ্রীসম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থ মেলকোট, শিবসমুদ্রে কাবেরীজলপ্রপাত ও কন্যাকুমারী দর্শন করেন, এবং কন্যাকুমারীর পথে ত্রিবান্দ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করিয়া যান। অতঃপর মাদ্রাজে পুনরাগমন করিয়া, ও সেখান হইতে বিভিন্ন সময়ে যাইয়া, পেরেমবদুর, শ্রীরঙ্গম, ত্রিচিনাপল্লী, কাঞ্চী ও তিরুপতি দর্শন করেন। মাদ্রাজে

---

২১ পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, সুধীর মহারাজ (শুদ্ধানন্দ) প্রভৃতি তখন ভুবনেশ্বর মঠে ছিলেন।

নূতন মঠবাড়ীর প্রতিষ্ঠা ও রামকৃষ্ণ মিশন ছাত্রাবাসের ভিত্তিস্থাপন করিবার পর মে মাসের প্রথম দিকে তিনি পুরীতে চলিয়া আসেন।

তৃতীয়বারে পূজনীয় মহাপুরুষকে ( শিবানন্দ ) সঙ্গে নিয়া তিনি ভুবনেশ্বর হইতে মাদ্রাজ যান ( ২৫শে এপ্রিল )। মাদ্রাজে ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাঙ্গালোরে আসেন ও অধিকাংশ সময় সেখানেই বাস করেন। মাদ্রাজে প্রত্যাগমন করিয়া মহারাজ সেখানে বাঙ্গলাদেশের মত দুর্গাপূজা করাইয়াছিলেন। কালীপূজার পরে তিনি ভুবনেশ্বরে চলিয়া আসেন ( ২০শে নভেম্বর )।

সেবাশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করিতে আহূত হইয়া ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মহারাজ কাশীতে যান ও তিন সপ্তাহ সেখানে থাকিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তাঁহাকে স্বামিজী ঐ প্রতিষ্ঠানের উপর দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া গিয়াছিলেন ; তাঁহারই পরিকল্পনা লইয়া সেবাশ্রমের ওয়ার্ডগুলি নির্মিত হইয়াছিল।

এই সময়ের একটি ঘটনা। মহারাজ ৺বিশ্বনাথ-দর্শনে গিয়াছেন, ঝাড়ুদার উঠান ঝাঁট দিতেছিল, তাহার ঝাড়ুটি দিয়া স্বয়ং ঝাঁট দিতে লাগিলেন। কাজটিতে কিছুমাত্র কৃত্রিমতা না থাকায় কী সুন্দরই যে দেখাইতেছিল। তাঁহার দেখাদেখি একজন ভক্তও ঝাড়ু হাতে নিলেন, কিন্তু ভক্তটির কাজে তেমন স্বাভাবিকতা নাই।[২২]

ইহার প্রায় চারিবৎসর পরে তিনি কনখল সেবাশ্রমে যান ( মার্চ, ১৯১২ ) হরি মহারাজ ও মহাপুরুষকে সঙ্গে করিয়া ; রামলালদাদাকেও[২৩] দক্ষিণেশ্বর হইতে আনাইয়াছিলেন চিঠি লিখিয়া। সেখানে গরমের সময় কোন কোন দিন গভীর রাত্রে তিনি বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া থাকিতেন, রাত্রির নিস্তব্ধতার মধ্যে কোন রোগী যন্ত্রনায় আর্তনাদ করিলে সমবেদনায় আঃ-আঃ বলিয়া উঠিতেন।

---

২২ বিশুদ্ধানন্দ-কথিত।

২৩ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল চট্টোপাধ্যায়। মহারাজ তাঁহাকে ভালবাসিতেন।

হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কনখল জগন্মাতা সতীর আবির্ভাব ও তিরোভাবভূমি বলিয়া কথিত হয়; মহারাজ সেখানে প্রতিমায় দুর্গাপূজা করাইয়াছিলেন। পূজার পরেই তিনি সকলকে লইয়া কাশীতে নামিয়া আসেন। সপরিকর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এই সময় কাশীতে শুভাগমন করায় নিত্যোৎসবের সূত্রপাত হয়। দুই মাসেরও অধিককাল ধরিয়া ভক্তেরা সেই আনন্দ সম্ভোগ করেন। সুবিখ্যাত সুরশিল্পী অঘোরনাথ চক্রবর্তী এই সময়ে প্রায় প্রত্যহ সকালবেলা আসিয়া মহারাজকে গান শোনাইয়া যাইতেন; রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে জামতলায় রকের উপর চেয়ারে বসিয়া তিনি গাহিতেন।[২৪]

ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে মহারাজ সদলবলে অযোধ্যায় যান এবং প্রশস্ত দালান ও চত্বরবিশিষ্ট এক রামমন্দিরে ত্রিরাত্র বাস করিয়া কাশীতে প্রত্যাবর্তন করেন।[২৫]

সেবাশ্রমবাটীর দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘরটিতে মহারাজ সেইবারে দুই বৎসর বাস করেন। তাঁহার চেষ্টায় এই সময়ের মধ্যে সেবাশ্রমের বিবিধ উন্নতি

---

২৪ যে তিনখানি গান তিনি সাধারণতঃ গাহিতেন: 'আনন্দবন গিরিজাপতিনগরী', 'বিফল জনম বিফল জীবন জীবননাথে না হেরে', 'গোবিন্দ-মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারে'।

২৫ বরদানন্দ বলেন: উকিল বাবু শম্ভুনাথ আমাদের অযোধ্যায় থাকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমাদের দলে শুকুল মহারাজ (আত্মানন্দ) ও চন্দ্র মহারাজ (নির্ভরানন্দ) এবং হরিমতি ও অনুমতি নামে মহারাজের শিষ্যা দুই ভগিনীও ছিলেন। আমরা রাত্রে ঝুলন দেখিতে বাহির হইতাম। হনুমানগড়িতে একদিন রামনাম কীর্তন হয়। একদিন মহারাজ ও আমরা এক আখড়ায় দাঁড়াইয়া ভজন শুনিতেছিলাম যখন, খুব বৃষ্টি সুরু হইল। মোহন্ত আমাদের সকলকে আহ্বান করিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া বসাইলেন। ভিতরের দেয়ালগুলি সব রামলীলার ছবিতে ভরা—মোহন্তের এক শিষ্য (তখন স্বর্গত) আঁকিয়াছেন; গুরুর উপদেশে কয়েকদিন ধ্যান করিয়া তিনি রামচন্দ্রের 'রাজীবলোচন' আঁকিয়াছিলেন।

সাধিত হয়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ' নামক গ্রন্থখানির সংকলনকার্যও এই সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়।[২৬]

মহারাজ অনেকদিন বেলুড় মঠের বাহিরে থাকায় সাধুদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠে যে, রাগ করিয়াছেন বলিয়াই তিনি মঠে আসিতেছেন না—যদিও এই তথাকথিত রাগের কারণ বুঝিতে পারা গেল না। অলোকসামান্য ব্রহ্মানন্দ-চরিত্রের ইহাও এক বিশেষত্ব যে, তাঁহার কোন কোন আচরণের রহস্য তৎক্ষণাৎ ভেদ করিতে পারা যাইত না। এই আপাত-অবোধ্য ব্যাপারের পেছনে গভীর উদ্দেশ্য নিহিত থাকিত বলিয়া বাবুরাম মহারাজ ও শরৎ মহারাজ বিশ্বাস করিতেন। ব্যক্তিবিশেষ মঠে থাকিলে তিনি মঠে আসিবেন না শুনিয়া, শরৎ মহারাজের পরামর্শ লইয়া বাবুরাম মহারাজ ঐ ব্যক্তির কাশীতে থাকার ব্যবস্থা করিলেন, এবং নিজে মহারাজকে লইয়া আসিতে কাশীতে ছুটিলেন।[২৭] বাবুরাম মহারাজ আসিতেছেন জানিতে পারিয়া মহারাজও বৃন্দাবন যাত্রার উদ্যোগ করিয়া বসিলেন। কাশী হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত বাবুরাম মহারাজ তাঁহার সঙ্গে চলিলেন, এবং তথায় ত্রিরাত্র বাসের পর একপ্রকার জোর করিয়াই তাঁহাকে মঠে লইয়া আসিলেন (২৫শে নভেম্বর, ১৯১৪)।

ইহার কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর পরে মহারাজ আর একবার কাশীতে গিয়াছিলেন, একথা আগেই বলা হইয়াছে। সেইবারে মাসাধিক (২০শে জানু—

---

২৬ এই সংকলনকালে মহারাজ বলিয়া যাইতেন ও দেবানন্দ (দেবেন্দ্র গুপ্ত) নামে মাতাঠাকুরাণীর এক ত্যাগী শিষ্য লিখিতেন। দেবানন্দ ব্যতীত অপর কাহাকেও তিনি সেই সময়ে তাঁহার ঘরে থাকিতে দিতেন না। অসাধারণ সত্যনিষ্ঠ ঠাকুর কাহারও মুখে শোনা কথা বলিবার সময় 'বৈষ্ণবচরণ বলত' 'গৌরী বলত' এইরূপ মুখবন্ধ করিয়া তবে বলিতেন। ঐরূপ কোন একটি কথা ঠাকুরের নিজের উপদেশবাক্যরূপে লিখিত হইয়া যায় ও মহারাজকে দেখা দিয়া ঠাকুর বলেন, 'ওরে, এটি আমার কথা নয়, অমুক বলত।'

[জগদানন্দ-কথিত]

২৭ যে সাধুটির কাশীবাসের ব্যবস্থা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে সুদীর্ঘকাল জপধ্যানে মগ্ন থাকিয়া তিনি তাঁহার জীবন মহিমান্বিত করিয়াছিলেন।

২৫শে ফেব্রু, ১৯২১ ) তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে বাস করেন। এই সময়ের মধ্যে অদ্বৈতাশ্রমে ঠাকুরের নূতন পট প্রতিষ্ঠা হয়। নীচেকার ঠাকুরঘরে কম্পিতহস্তে ঠাকুরকে বসাইয়া ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মহারাজ কর্পূর-আরতি করেন ; তারপরে চামরবীজন করিতে করিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসেন। তাঁহার অঙ্গে তখন কম্প আর পুলক* হইতেছিল। গান চলিয়াছে ঃ 'এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে'। সেই গানের তালে তালে তিনি নৃত্য করিতে থাকেন। ইতোমধ্যে শরৎ মহারাজ ও হরি মহারাজ আসিয়া পড়েন ও সেই নৃত্যে যোগদান করেন মহারাজের দুইপাশে থাকিয়া। এই ব্যাপার চলিয়াছিল অনেকক্ষণ ধরিয়া।

ঢাকা ও ময়মনসিংহের ভক্তগণের আগ্রহে ও আমন্ত্রণে বাবুরাম মহারাজ ও অপর দশজনকে সঙ্গে নিয়া মহারাজ একবার পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণে গিয়াছিলেন ( জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬ )। কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমতঃ তিনি কামাখ্যা মহাপীঠে আসেন এবং তথায় ত্রিরাত্র বাস ও কুমারীপূজাদি ক্ষেত্রকর্মসকলের অনুষ্ঠান করেন। মহাপীঠের আধ্যাত্মিক ভাবগাম্ভীর্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি সেখানে একটি মঠ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।[২৮]

কামাখ্যাধাম হইতে ময়মনসিংহ শহরে শুভাগমন করিয়া তিনি শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য জিতেন্দ্র দত্তের গৃহে পাঁচদিন অবস্থান করেন। এখানে ব্রহ্মপুত্রতীরে বেড়াইতে বাহির হইয়া, দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, আমার মন অনন্তে মিশে যাচ্ছে !

---

২৮ স্বামিজীর কামাখ্যার পাণ্ডা শিবকান্তের নিকট শ্রুত। শিবকান্তের নিকট হইতে স্বামিজীর মূল অভিজ্ঞানপত্রখানি মহারাজ চাহিয়া লন ও কলিকাতায় ফিরিয়া উহার একহাজার মুদ্রিত কপি তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন।

ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় আসিয়া ৯ নম্বর ট্রেনিং কলেজ রোডে অবস্থিত কাশিমপুরের জমিদার বাটীতে তিনি দুই সপ্তাহ বাস করেন,[২৯] এবং রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার পর সপরিকর কাশিমপুরে চলিয়া যান। তখনকার দিনে জয়দেবপুর ষ্টেশন হইতে কাশিমপুর পর্যন্ত তিনক্রোশ পথ হাতীর উপর চড়িয়া যাইতে হইত; মহারাজের সম্মানার্থে ঐ পথের স্থানে স্থানে বৃহৎ তোরণসমূহ নির্মিত হইয়াছিল।[৩০] কাশিমপুরে তিনচারি দিন থাকিয়া, ঢাকা হইয়া তিনি নারায়ণগঞ্জে আসেন ও দুইদিন তথাকার পাট-ব্যবসায়ী নিবারণ চৌধুরীর গৃহে অবস্থান করেন। ঢাকা হইতে মহারাজ নারায়ণগঞ্জে আসিয়াছিলেন রাত্রিবেলা। পরদিন সকালে তিনি ও বাবুরাম মহারাজ অতর্কিতে তথাকার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে উপস্থিত হন ও মহারাজ বলেন, আমরা সারপ্রাইজ ভিজিট দিতে এলুম! বাবুরাম মহারাজ বলেন,

২৯ মহারাজকে আনন্দে রাখিবার জন্য কাশিমপুরের জমিদার সারদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী চেষ্টার ক্রটি করিতেন না। তাঁহার আয়োজিত গানের আসরে একদিন ঢাকার যাবতীয় সঙ্গীত ও বাদ্যবিশারদগণের সমাবেশ হয়; ভগবান-ইন্দ্রমোহন-শ্যাম সেতারীরা তিন ভাই, গাইয়ে এমদাদ, গাইয়ে ও এসরাজ-বাজিয়ে মহতাব, তবলাবাদক গোলাপ—সকলেই তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। স্বয়ং সারদাবাবুও একজন বড় তবলাবাদক ছিলেন। 'ঢাকায় কী দেখে এলেন নূতনত্ব?' গৌরীশানন্দের এই প্রশ্নের উত্তরে বেলুড় মঠে মহারাজ বলিয়াছিলেন, ওস্তাদ ভগবান দাসের সেতার বাজনা—ঋষির মত সৌম্য মূর্তি—কী মীড়-মূর্ছনা! এখনো কানে লেগে আছে। এর আগে এত সুন্দর সেতার বাজনা কোথাও শুনি নি। আর ওস্তাদ গোলাপ তবলচীর বাজনা। ভারতের বহু স্থানে বহু তবলচীর বাজনা শুনেচি, তবুও আমার মনে হত, তবলা কি একটা বাজনা? গোলাপের বাজনা শুনে আমার সেই ধারণা পালটে গেল। যা বলা তাই তবলায় তুলে দেন।

৩০ কাশিমপুরে দ্বিতীয়দিন সকালে গ্রামসংলগ্ন তুড়াগ নদীতে মাছধরা দেখিবার জন্য মহারাজকে লইয়া যাওয়া হয়। একবার জাল ফেলিতেই শতাবধি চিতল মাছ উঠিল দেখিয়া ছোট ছেলের মত আনন্দিত হইয়া হাসিতে হাসিতে তিনি বলিয়াছিলেন, আজ ধ্যান করবার সময় এই চিতল মাছই প্রথম মনে উঠবে। মাছগুলিকে আগের দিনই বেড়াজালে ঘেরাও করিয়া রাখা হইয়াছিল। গোটা ছয় বড় বড় মাছ রাখিয়া বাকিগুলি ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

এখানে দুখানি বড় ঘর ছিল, একখানিতে তুমি আর আমি, আর একখানিতে ছেলেরা থাকতে পারত—এখানে এলেই ভাল হত। তাঁহাদের দয়া দেখিয়া আশ্রম-পরিচালক ধীরেন্দ্র সোমের চোখে জল আসে, তাঁহাদের আশ্রমে থাকার ব্যবস্থাই তিনি করিতে চাহিয়াছিলেন।

নারায়ণগঞ্জের অদূরে দেওভোগ গ্রাম মহাতপা নাগ মহাশয়ের জন্মস্থান; সংকীর্তন-দলের সঙ্গে পদব্রজে মহারাজ দেওভোগ গিয়াছিলেন। অতঃপর নারায়ণগঞ্জ হইতে ষ্টীমারে যাত্রা করিয়া তিনি সদলবলে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।[৩১]

মহারাজ যখন ঢাকায় ছিলেন সেই সময় ধর্ম ও সমাজের বিবিধ সমস্যা নিয়া কেহ কেহ তাঁহার সঙ্গে আলোচনার সুযোগ পাইয়াছিলেন। সেই আলোচনা কালে তিনি যেসকল অভিমত ব্যক্ত করেন উহাদের কয়েকটি নিম্নোক্তরূপ ঃ[৩২]

(১) হিন্দুধর্ম বেদমূলক বিধায় সনাতন ধর্ম। রামকৃষ্ণ মিশন এই সনাতন ধর্মকেই শুধু প্রচার করিবে। গোঁড়ামি বা একদেশী মত প্রচার উহার লক্ষ্য নয়।

(২) যথার্থ ত্যাগী সন্ন্যাসীরাই আচার্য বা ধর্মশিক্ষক হইতে পারেন। বংশানুক্রমিক গুরুগিরি আমরা সমর্থন করি না।

(৩) নানা কারণে হিন্দুধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে যাহারা, তাহাদিগকে নিজধর্মে ফিরাইয়া আনিতে হইবে; কিন্তু তাহা সময়সাপেক্ষ।[৩৩]

(৪) এই যুগে স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রবল হইবে, স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশা কতকটা অবাধ হইবে, সমাজে কিছু দোষও ঢুকিবে। আমরা গয়াপিণ্ডের ব্যবস্থা হাতে

৩১ বারেন্দ্রনাথ বসু-কথিত। বীরেনবাবুই মহারাজকে ঢাকায় লইয়া গিয়াছিলেন।

৩২ অতুলচন্দ্র চৌধুরী হইতে প্রাপ্ত।

৩৩ দাক্ষিণাত্যে পরিভ্রমণ কালে ঐদেশের বহুলোক ধর্মান্তরিত হইয়াছে দেখিয়া মহারাজ বলিয়াছিলেন, আমার ইচ্ছা হয়, গঙ্গাজল ছিটিয়ে আর জগন্নাথের মহাপ্রসাদ খাইয়ে এদের আবার হিন্দুসমাজে তুলে নিই।

রাখিয়াছি, তাহার ফলে, বৌদ্ধযুগে যেমন অধঃপতন হইয়াছিল সেইরূপ কিছু হইবে না।[৩৪]

সঙ্গীতে সুরময় হইয়া শব্দব্রহ্ম সাধকের চিত্তবৃত্তির তন্ময়তা সাধন করেন। যুগে যুগে সঙ্গীত সেই কারণেই ভক্তিপথের সাধকদের বিশেষভাবে অবলম্বনীয় হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘে যেভাবে সঙ্গীতে সাধন বা সমবেত ভজন প্রচলিত আছে, প্রবর্তক না হইলেও, বিশেষভাবে উহার সংগঠক ছিলেন মহারাজ। এই সংগঠন কার্যে তাঁহার প্রিয়শিষ্য নীরদ (অম্বিকানন্দ) তাঁহাকে সর্বাধিক সাহায্য করেন।[৩৫] যেখানেই মহারাজ যাইতেন, দুইএক জন গায়ক তাঁহার সঙ্গে যাইতেন, আর গানের সরঞ্জামের মধ্যে ছোট একটি হারমোনিয়ামও সঙ্গে যাইত।

এতদ্ব্যতীত মনুসংহিতা (স্মৃতি), কাশীখণ্ড (পুরাণ) ও মহানির্বাণতন্ত্র—এই গ্রন্থগুলি সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিত ও যেখানেই যাইতেন সঙ্গে যাইত। শেষাশেষি কয়েক বৎসর এই বইগুলির পুঁটুলি কখনো খোলা হইত না বটে, কিন্তু তৎপূর্বে, বিশেষতঃ মাদ্রাজে বাঙ্গালোরে ও পুরীতে অবস্থানকালে

---

৩৪ বৌদ্ধযুগের অধঃপতন প্রসঙ্গে, ভুবনেশ্বর মঠে একদিন সন্ধ্যার পর কবি নরেন্দ্র দেবকে মহারাজ বলিয়াছিলেন—নরেন্দ্র দেবের সঙ্গে তাঁহার দুইএক জন সাহিত্যিক বন্ধুও ছিলেন—বিরাট উত্থানের পর বিরাট পতনের সূচনা দেখা যায়। এই উত্থান-পতনের ভিতর দিয়েই জগৎ এগিয়ে চলেছে।

৩৫ নীরদ মহারাজ কাশিমবাজারে থাকিয়া গান শিখিতেন, বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কালোয়াত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে। একাদিক্রমে আট বৎসর তিনি গোসাঁইজীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। গোসাঁইজী বলিয়াছিলেন, আপনি সন্ন্যাসী, ধরে রাখতে পারবেন, আপনাকেই আমার সব বিদ্যা দিয়ে যাব।

(১৯১৬-১৭), একসঙ্গে কিছুদিন ধরিয়া, বিকালে চারিটার সময় পুঁটুলিটি খুলিয়া তিনি পড়িতে বসিতেন ও ন্যূনাধিক আধ ঘণ্টা পাঠ করিতেন।[৩৬]

ঠাকুরঘরে নারায়ণশিলার পাশে বেদও পূজিত হউক—স্বামিজী এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছে ও পূজার মর্যাদা পাইয়াছে স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র। বেদোক্ত ব্রহ্মতত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার পথে হিন্দুর ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে এই শেষোক্ত গ্রন্থগুলিই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে বহুশত বৎসর ধরিয়া। একই ভূমা-বস্তু বহুনামে বহুরূপে বহুভাবে বহুবিচিত্র মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন পুরাণ ও তন্ত্রসমূহে; আর এইরূপ প্রকাশের ভিতর দিয়াই বহুবিচিত্র রুচি ও সংস্কার-বিশিষ্ট গণমানসের ধরিবার বুঝিবার, উপলব্ধি ও সম্ভোগ করিবার উপযোগিতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বেদ—আদি প্রেরণা; স্মৃতি-পুরাণ-তন্ত্র সেই প্রেরণাসঞ্জাত বিধান, বিকাশ ও সৃষ্টি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের বা মঠ ও মিশনের মূল প্রেরণা আসিয়াছে স্বামিজীর ভিতর দিয়া; সেই প্রেরণা বিকাশ ও বিস্তার লাভ করিয়াছে মহারাজের ভিতর দিয়া।

---

৩৬ মহারাজের ঘরে বইয়ের পুঁটুলিটির পাশেই থাকিত কাঠের ঠোলার মধ্যে জপের মালা, কুম্ভীরচর্মনির্মিত আমেরিকান ব্যাগে কতিপয় ঔষধ, কানখুশকি, কানে দেবার পালক, আর একটা আবদ্ধমুখ ঘটিতে গঙ্গাজল।

# লীলার প্রকাশবৈচিত্র্য

## প্রেরণা দান ঈশ্বরের পথে

রতিকান্ত মজুমদারের কথা ঃ

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের রথযাত্রার পরে, আমি তখন পুরীতে। চারিজন সৌম্য-মূর্তি সন্ন্যাসী ষ্টেশনের প্লাটফরমে ঘুরিয়া বেডাইতেছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা এখানে ঘুরে বেড়াচ্চেন কেন? উত্তর হইল—আমরা অভেদানন্দ-স্বামীকে রিসিভ (অভ্যর্থনা) করতে এসেচি, তিনি মাদ্রাজ মেলে আসবেন। 'মাদ্রাজ মেল একঘণ্টা লেট আছে, আপনারা এই সেলুনের ভিতর বসুন।' 'আমরা এখানে বসলে যদি কেউ আপত্তি করে?' 'আমি এখানকার ডাক্তার, আমি বসালে কেউ কিছু বলবে না।'

সকলে সেলুনে বসিলেন। যাঁহার সঙ্গে আমি কথা কহিতেছিলাম, পরে জানিয়াছি, তাঁহার নাম স্বামী ব্রহ্মানন্দ। অপর তিনজন—শিবানন্দ, অখণ্ডানন্দ ও প্রেমানন্দ। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বলিলাম, আপনারা দেখচি অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী, আপনারা তবে কাঠের তৈরি জগন্নাথ মানেন কেন? ব্রহ্মানন্দ কহিলেন, ঐ জগন্নাথকেই আমরা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলে জানি। কথাটি সোজা আমার অন্তরে গিয়া বিদ্ধ হইল। ব্রাহ্মসঙ্গে মিশিয়া ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়াছিলাম, ঈশ্বর সাকার হইতে পারেন না—এই ধারণাটাই পাকা করিয়া রাখিয়াছিলাম। যুক্তিতর্ক জীবনে অনেক হইয়াছে, ধারণা পালটায় নাই। কিন্তু আজ ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসীর একটিমাত্র কথায় কাঠের জগন্নাথ কী অপূর্ব অভিনব মূর্তিতেই না মানসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন! স্থির হইয়া বসিয়া রহিলাম। আর প্রশ্ন করিলাম না, করিবার প্রবৃত্তিও হইল না।

নিজেই জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি আমার সাংসারিক সমুদয় খবর জানিয়া নিলেন। আমি বিপত্নীক এবং আমার বয়স মাত্র ৩৯ বৎসর হইলেও

দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক জানিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। উপদেশচ্ছলে কিছু কথা বলিলেন, এবং বাসায় ফিরিয়া একখণ্ড কথামৃত আমাকে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্যামানন্দের বর্ণনা ঃ

বেলুড় মঠে মহারাজের ভীষণ জ্বর, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন। রাত্রিকাল। একএক বার ঘরে যাইয়া বিছানায় শুইতেছেন, আবার পরক্ষণেই বারান্দায় আসিয়া আরামকেদারায় শুইতেছেন। সেবকদের কেহ পাখা নিয়া হাওয়া করিতেছে, কেহ পায়ে, কেহ বা মাথায় হাত বুলাইতেছে। ঘড়ির শব্দ শুনিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কটা বাজল? সেবকেরা কহিল, দুটো। 'তোদের কষ্ট হচ্চে না?' আমি বলিলাম, কী আর কষ্ট মশাই? সবাই তো এইরকম করে; আমরা আপনার জন্যে করচি এই যা আমাদের ভাগ্য। মহারাজ কহিলেন ঃ দেখ্, আমার যা কিছু আছে সব তোদের দিতে পারি, কিন্তু ভগবান দিতে পারি না। ঠাকুর আমাদের সব দিতে পারতেন, কিছুই তাঁর অদেয় ছিল না, তবু রাত্রিবেলা ঘুম ভাঙিয়ে আমাদের ধ্যান করাতেন। বলতেন, ওরে, দিনে খাবি আর রেতে ঘুমুবি তো ভগবান লাভ করবি কী করে?

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। মহারাজ রোজই রাত্রি প্রায় তিনটার সময় নিদ্রা হইতে উঠিতেন। তাঁহাকে তামাক দিয়া আমি তাঁহার সম্মুখে মেজেয় বসিতাম। তিনি বলিতেন, তুই বল্—

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন। গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥

( রাধার মদনমোহন, বল ভাই মদনমোহন )।

সুর করিয়া আমি আবৃত্তি করিতাম—সুর তিনিই শিখাইয়া দিয়াছেন—আর তামাক খাইতে খাইতে তিনি শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে বাহ্যহারা হইয়া যাইতেন, নলটি মুখ হইতে খসিয়া পড়িত। কখনো আমি থামিয়া গেলে তিনি বলিয়া উঠিতেন, চলুক, চলুক। তখন পূর্ববৎ আবৃত্তি করিতে থাকিতাম।

একএক দিন তিনি এমনই নিস্পন্দ হইয়া যাইতেন যে, তাঁহার শ্বাস বহিতেছে না বলিয়া মনে হইত। এইরূপ সময়ে পাশের ঘর হইতে আসিয়া বাবুরাম মহারাজ কখন কখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যাইতেন।

আমাকে মহারাজ বলিতেন: নাম করতে করতে মেতে যাবি। যা করবি তুই আর ঠাকুর—ধ্যানজপ করিস আর ভজনসাধনই করিস। মানুষ যে কেউ শুনচে বা দেখচে, বা তোর ভুলভ্রান্তি হচ্চে, এসব কিছু ভাববি নি—একেবারে মেতে যাবি, ডুবে যাবি।

বিকাল কিংবা আরতির পর মঠের সাধুদিগকে লইয়া মহারাজ গানের আসর বসাইতেন। ঠাকুরের সময়ে যেসব গান গাওয়া হইত একটি একটি করিয়া বলিয়া দিতেন আর আমরা গাহিতাম। ইটালি অর্চনালয়ের কৃষ্ণবাবু মজুমদার-মহাশয়ের রচিত গানগুলি গাহিতেন, মহারাজ পছন্দ করিতেন।

বাঙ্গালোরে অবস্থানকালে মহারাজ তথায় নামরামায়ণ বা রামনাম-সংকীর্তন শুনিয়া মুগ্ধ হন, এবং উহা সংগ্রহ করিয়া লইয়া পুরীতে আসেন (মে, ১৯০৯)। উহাতে স্তবাদি সংযুক্ত করিয়া নূতন সুরযোগে প্রথমতঃ শশীনিকেতনে ও পরে শ্রীমন্দিরে গাহিবার ব্যবস্থা করেন। সেইবার দাক্ষিণাত্য-পরিভ্রমণ কালে নীরদ মহারাজ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, সুরযোজনা করিয়া তিনিই সকলকে গাহিতে শিখাইয়াছিলেন। ঐ নামরামায়ণ পরে বহুসংখ্যায় মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হয় (১৯১১), এবং ঠাকুরের নামাঙ্কিত মঠ ও আশ্রমসমূহে, শ্রীমহাবীরের অর্চনা সহ, গীত হইতে থাকে।

বরদানন্দের বর্ণনা:

১৯১২।১৩ সালের কথা। মহারাজের ইচ্ছানুসারে কাশীর উভয় আশ্রমে রামনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা হয়—একাদশীতে সেবাশ্রমে এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমায় অদ্বৈতাশ্রমে। ঐ সময়ে মহাবীরের উদ্দেশে একখানা আসন ও তদুপরি একখানি সংকীর্তনের বই রাখা হইত।

একদিন দুই আশ্রমের সকলে মিলিয়া, বহু একত্র করিয়া, সঙ্কটমোচন

যাই। মন্দিরের বারান্দায় মহাবীরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছি নীরদ মহারাজ, বিশ্বরঞ্জন মহারাজ ও আমি ; আর দুইপাশে পূর্বপশ্চিমে মুখ করিয়া বসিযাছে সব দোহাররা। কীর্তন খুবই জমিয়া গেল। একজন গৌরবর্ণ পুরুষ —সাদা ধব্‌ধবে চেহারা, লম্বা চুল-গোঁফ-দাড়ি, মোটা সাদা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা—মহাবীরের মন্দিরের দোরগোড়ায়, বাহিরের দিকে, পশ্চিম পাশে স্থির হইয়া বসিলেন পূর্বমুখে, মহারাজের কতকটা মুখোমুখি হইয়া ; আর কীর্তন শেষ হইবামাত্র উঠিয়া চলিয়া গেলেন। অনেকবার আমি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছি। মহারাজ কহিলেন, মহাবীরের সাক্ষাৎ আবির্ভাব ; ঐ যে গৌরবর্ণ বৃদ্ধ বসে শুনছিলেন, তিনি হচ্চেন মহাবীর। মহাবীরকে খুঁজিতে কেহ কেহ তখন ইতস্ততঃ ছুটিল, কিন্তু বটগাছে কতিপয় হনুমান ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না।

কাশীতে নীরদ মহারাজের পরিচালনায় মহলা দিয়া দলবদ্ধভাবে কালীকীর্তন শেখা হইল, মহারাজের আদেশে। একদিন সকালবেলা আমরা যখন কীর্তন গাহিতেছিলাম, মহারাজ ভাবাবেশে দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং ঠাকুরঘরের দরজায় নাচিতে নাচিতে ঠাকুরকে চামরবীজন করিতে লাগিলেন। কেবল সেইদিনই আমি তাঁহাকে মালায় জপ করিতে দেখিলাম—মালাটি হাতে নিয়া অতি ধীরে জপ করিলেন, বোধ হয় দ্বাদশটি মাত্র।

অন্নপূর্ণার মন্দিরে একদিন কালীকীর্তন হইল। সেই আসরে হরিপ্রসন্ন মহারাজ উপস্থিত ছিলেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজার বিখ্যাত পাখোয়াজী বৃদ্ধ মদন মিশ্র কয়েকখানি গানে সঙ্গত করেন। মহারাজের ভাবময় মূর্তি দেখিয়া অন্নপূর্ণার মোহন্ত শিবপরী মুগ্ধ হন ও সাধুদিগকে সঙ্গে নিয়া অন্নপূর্ণার প্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে আমন্ত্রণ করেন।[১]

---

১ বরদানন্দ বলেন : মহারাজ আমাদিগকে নিয়া প্রসাদ পাইতে যান। শিবপুরী আমাদিগকে অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার দেখাইয়া আনিলেন। তারপর ডিম্বাকৃতি রূপার রেকাবিতে ভর্তি ছোট এলাচ লইয়া আসিয়া মহারাজের কাছে বসিলেন এবং একটি একটি করিয়া খোসা ছাড়াইয়া তাঁহার হাতে দিতে লাগিলেন। এইটি হইল অভ্যর্থনা। মহারাজ একদানা মাত্র

মুক্তেশ্বরানন্দের লেখা ঃ

ধ্যানভজন পূজাপাঠ সম্বন্ধে মহারাজ খুব উৎসাহ দিতেন। শেষ অবধি তিনি রাত তিনটায় উঠিয়া ধ্যানে বসিতেন। 'তপস্যা—তপস্যা—তপস্যা—' তিনি প্রায়ই বলিতেন। প্রায়ই তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, 'নব অনুরাগের মুখে খুব ধ্যানজপ করে নিতে হয়। বাড়ীঘর ছেড়ে এলি—কী করছিস্?' তাঁর নামসাগরে ডুবে যা। প্রার্থনা কর্—ভক্তি দাও, জ্ঞান দাও বলে। এখন যদি কিছু না করিস তো পরে পস্তাতে হবে।' মনে পড়ে, বেলুড় মঠে একসময় ধ্যানজপ ভজনপাঠের কী তুফানই না বহিয়াছিল। সেই সময়টায় মহারাজ আমাদের প্রত্যেককেই ধ্যানজপ সম্বন্ধে প্রবল উৎসাহ দিতেন। তখন এত সাধুব্রহ্মচারীর আমদানি হয় নাই; তাই বলিয়া মঠে লোকসমাগম কম ছিল না। ঠাকুরের সন্তানেরা তখন অনেকেই বিদ্যমান ছিলেন। দলে দলে সব স্কুলকলেজের ছেলেরা আসিত, ভক্ত পুরুষ ও মহিলাদের আগমনও বড় কম হইত না। দিবারাত্র 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' চলিত। ঠাকুরের প্রসাদ না খাওয়াইয়া শ্রীবাবুরাম কাহাকেও যাইতে দিতেন না। মানুষকে খাওয়ানোর মধ্যে যে এত প্রীতি এত তৃপ্তি থাকিতে পারে তাহা বাবুরাম মহারাজকে না দেখিলে ধারণাই করিতে পারিতাম না।

এমনই একটি সময়ে মঠে আমাদের ভিতর ধ্যানজপের প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। সেই সময় কায়িক পরিশ্রমেরও অন্ত ছিল না; বাগানে মাটি কোপানো, সারিবন্দী হইয়া বালতি বালতি গঙ্গার জল তোলা, ঘাস কাটা, কুটনা কোটা, অনেক কিছুই আমাদিগকে করিতে হইত। কাহাকেও গল্প করিতে বা চুপচাপ বসিয়া থাকিতে দেখিলে বাবুরাম মহারাজ ভীষণ বকুনি দিতেন। মহারাজ তখন যাহাতে কাজের সঙ্গে ধ্যানজপ করি এই উপদেশ

---

মুখে দিয়া বাকিটা আমার হাতে দিতেছিলেন, ছোট এলাচ তিনি গরম বলিয়া খাইতেন না। সোনার অন্নপূর্ণা যে ঘরে আছেন সেই ঘরে আমরা তখন বসিয়া, সেখানে বসিয়াই প্রসাদ পাইলাম।

দিতেছিলেন, আর আমরা তাঁহার উপদেশ পালন করিতেছি কিনা তাহাও দেখিতেছিলেন।

১৯১৪, ডিসেম্বর মাস। হঠাৎ একদিন মহারাজ বি—কে বলিলেন, কাল থেকে আমায় তিনটার সময় উঠিয়ে দিবি, দেখব তুই আমার সঙ্গে কতক্ষণ ধ্যান করতে পারিস। অনেকেই তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, আমাদের দলের চাঁই ছিলেন তখন শচীন (চিন্ময়ানন্দ)। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম আমরাও রাত তিনটায় উঠিয়া ধ্যান করিব। সে যে কী আনন্দের দিন গিয়াছে তাহা বলিয়া বুঝাইবার নয়। মহারাজের ঘরের সামনের বারান্দায় আমরা ধ্যানে বসিতাম গঙ্গার পানে মুখটি করিয়া। তাঁহার উঠিবার পূর্বেই আমরা আসিয়া নিজ নিজ আসনে বসিতাম। তিনি হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া আমরা কে কে আসিয়াছি লক্ষ্য করিতেন, তারপরে আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়া নিজের আসনে গিয়া বসিতেন। দিনের পর দিন আমরা মহানন্দে কী যেন এক ভাবের প্রেরণায় মত্ত হইয়া এইরূপে ধ্যানজপ করিতে লাগিলাম। সেই সময় মনে হইত এইবার বুঝি আমাদের ভগবদ্দর্শন হইবে। কারণ, দিনরাত্রির ভিতর অন্য কোন প্রসঙ্গই আমাদের হইত না, ত্যাগবৈরাগ্য ভক্তিজ্ঞান ইত্যাদিবিষয়ক কথা ছাড়া। আশায় ও উৎসাহে আমরা এতই মাতিয়া উঠিয়াছিলাম যে, দিনগুলি কোথা দিয়া কাটিয়া যাইতেছে তাহা অনেক সময় বুঝিতে পারিতাম না। এই প্রবল অনুরাগের মুখে দুইএক জনের কিছু কিছু উপলব্ধিও হইয়াছিল শুনিতে পাই।

তখনো অরুণোদয় হয় নাই, সর্বত্র এক স্তব্ধ নীরবতা বিরাজিত, বিশ্বপ্রকৃতি যেন ব্রহ্মচিন্তায় সমাহিত। মহারাজ হয়তো বলিলেন, তোমরা এই গানখানা গাও—ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম। ধ্যানের পর ব্রহ্মসঙ্গীতই বেশী হইত। হরিরসমদিরা পিয়ে মম মানস মাত রে, চিন্তয় মম মানস হরি চিদ্‌ঘন নিরঞ্জন, ইত্যাদি গান মাঝে মাঝে হইত। মহা উৎসাহে যখন আমরা গাহিতাম, 'কত যোগীন্দ্র ঋষিমুনিগণ না জানি কী ধ্যানে মগন', সমবেত কণ্ঠের সে সঙ্গীত মহারাজের ভাবে পূর্ণ হইয়া, সুরের লহরী তুলিয়া, গগনপবন আচ্ছন্ন করিয়া

সকলকে দিব্য আনন্দে নিমগ্ন করিত। সেই গান এখনো গাওয়া হয় শুনি, কিন্তু সেই প্রাণমাতানো ভাব আর পাই না। যখন গাহিতাম, 'হৃদি কমলাসনে ভাব তাঁর চরণ, দেখ শান্ত মনে প্রেমনয়নে অপরূপ প্রিয় দর্শন', তখন সত্য বলিতে কি, নিজের হৃদয়পদ্ম আমি শূন্যই দেখিতাম, কিন্তু বাহিরের দুই আঁখি ভরিয়া দেখিতাম মহারাজের অপূর্ব ভাবান্তর—ধীরস্থির পলকহীন নয়ন, সমস্ত মুখমণ্ডল দিব্য জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত। হৃদয়ের গোপন অন্তঃপুরে অপরূপ প্রিয়দর্শনলীলা সম্ভোগ করিতেছেন তিনি, আর আমি দেখিতেছি তাঁহারই প্রশান্তগম্ভীর মুখচ্ছবি অবাক হইয়া।

প্রভাত হইতে সাড়ে সাতটা অবধি গান চলিত। একএক দিন বেলা আরও অধিক হইয়া যাইত। যেদিন গান খুব জমিত মহারাজ একটির পর একটি করিয়া বাছা বাছা গানের ফরমাশ করিতেন। এই রকমেরই একটা জমাট দিনে আমরা মত্ত হইয়া গাহিতেছিলাম যখন, সে মত্ততা হঠাৎ ভাঙ্গিয়া গেল বাবুরাম মহারাজের গলার সাড়া পাইয়া। তিনি বলিতেছিলেন, এত বেলা হয়ে গেল, তোদের খেয়াল নাই, এখনো গাইচিস, ওঠ্ বেটারা, সমস্ত কাজকর্ম পড়ে আছে। অনেকেই তখন গান বন্ধ করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীচে নামিয়া গেল। মহারাজ কহিলেন ঃ বাবুরামদা, ছেলেগুলো কি ঘরবাড়ী ছেড়ে এসেচে মুটে মজুরের মত খাটতে ? কাজ কমিয়ে দাও। ভগবৎপ্রেমের আস্বাদ না পেলে কাজের ভিতর আনন্দ পাবে কী করে ? সে আনন্দ না পেলে কর্ম তো বন্ধনেরই কারণ হয়। তবে ধ্যানজপের নামে কুড়েমি না প্রশ্রয় পায় এটা দেখতে হবে বইকি। ( আমাদিগকে উদ্দেশ করিয়া ) শুধু ভাসাভাসা নাম করলে হবে কী, ভজনে মেতে যেতে হবে—নামসাগরে ডুব দিতে হবে, তবে তো। যত তাঁর নাম করবে তত আনন্দ পাবে, তত ভরসা বিশ্বাস আসবে, সন্দেহ অবিশ্বাস দূরে পালিয়ে যাবে।

সেদিন শনিবার। স্বামিজীর জন্মতিথি বলিয়া নীরদ মহারাজ সমস্ত রাত কালীপূজা করিয়াছেন। রামলালদাদা মঠবাস করিতেছিলেন তখন। তাঁহার সঙ্গে মহারাজের ব্যবহার ছিল অদ্ভুত রকমের। তিনি মঠে থাকিলে মহারাজ

সদাই হাস্যপরিহাস-রসের ফোয়ারা ছুটাইতেন। আবার ইষ্টবংশ বলিয়া তাঁহার আদর আপ্যায়নেরও অন্ত ছিল না। রামলালদাদাকে প্রায়ই নিজের ঘরে পার্শ্ববর্তী স্প্রিংএর খাটে শুইতে দিতেন। দিনের বেলা মহারাজ ঐ খাটটিতে বিশ্রাম করিতেন, এবং সকালে ও সন্ধ্যায় ঐ খাটে বসিয়াই ধ্যানজপ করিতেন ও সাধুভক্তদের সঙ্গে কথা কহিতেন। রবিবার সকালবেলা মহারাজ ও রামলালদাদা প্রসাদ গ্রহণ করিবেন বলিয়া ছোট খাটটিতে বসিয়াছেন, দুই-খানি থালায় প্রসাদ সাজাইয়া আমরা তাঁহাদের সম্মুখে ধরিলাম। মহারাজ কহিলেন, হাতে করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবি, যা দুটো টুল নিয়ে আয়। আর রামলালদাদাকে বলিলেন, কী বল দাদা, আজ সাহেব সেজে মার প্রসাদ খাওয়া যাক। প্রসাদ খাইতে খাইতে তিনি দাদার সঙ্গে হাসিঠাট্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় নীরদ মহারাজ দেবীপাত্রের স্নানজল লইয়া আসিলে তিনি কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া বাকিটা দাদাকে দিলেন, আর পরক্ষণেই ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, নীরদ, তোরা আমার মার গান গা না ? ওরে, সেই গান—ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে। নীরদ মহারাজ, ভবানী ও আমি বিপুল উদ্যমে গাহিতে লাগিলাম ঃ

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিতচিকুর আসব-আবেশে।
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে, ধরি করতলে গজ গরাসে ॥
কালীর শরীরে রুধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
নীলকমল শ্রীমুখমণ্ডল, অর্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে ॥
নীলকান্তমণি নিতান্ত, নখরনিকর তিমির নাশে।
রূপের ছটায় তড়িত ঘটায় ঘনঘোর রব উঠে আকাশে ॥
দিতিসুতচয় সবার হৃদয় থরথরথর কাঁপে হুতাশে।
কোপ কর দূর, চল নিজপুর, নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে ॥

মহারাজের সে কী আকুল আবেগ—মা মা করিতেছেন আর দুই চক্ষু হইতে অবিরল ধারে প্রেমাশ্রু ঝরিতেছে। আমি আর কখনো মহারাজের এমন আত্মভোলা ভাব দেখি নাই, সেই দিব্যভাবাবেশ দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত

হইয়াছিলাম। তখনো প্রসাদী লুচির আধখানা তাঁহার মুখে ছিল; অর্ধ-নিমীলিত চক্ষু, ব্রহ্মময়ীর সীমাহীন আনন্দ-সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া উঠিতেছিল তাঁহার শ্রীঅঙ্গ। ভাব ও ভাষাহীন আমি, আমার কী শক্তি আছে যাহাতে তাঁহার সেই ভাবের প্রকাশকে রূপ দিব। এক অননুভূতপূর্ব আনন্দের প্লাবনে আমরাও সেই সময়টায় ভাসিতেছিলাম। অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মহারাজ আমাকে 'নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে' ইত্যাদি দেবীস্তোত্রটি আবৃত্তি করিতে বলিলেন।

ময়মনসিংহের জিতেন দত্তের ভক্তিতে প্রসন্ন হইয়া মহারাজ যখন বাবুরাম মহারাজ ও সেবকগণকে নিয়া পাঁচদিন তাঁহার বাড়ীতে অবস্থান করেন (জানুয়ারী, ১৯১৬), একটা আধ্যাত্মিক ভাবের প্রবাহ তখন সেই শহরের বুকে খেলিয়া যায়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে নীরদ মহারাজ মধুরকণ্ঠে ভজন গাহিতেন, সেই গানের আসরে মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ ধ্যানমগ্ন হইয়া বসিয়া থাকিতেন, আর ঘরের ভিতরে ও বাহিরে দাঁড়াইয়া ও বসিয়া বহুলোক ভজনানন্দের এই দুই ঘনীভূত বিগ্রহ দর্শন করিতেন স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে দ্বিতীয়দিন বিকালে এক সভা আহূত হয় ও সেই সভায় বাবুরাম মহারাজ গল্পচ্ছলে কিছু উপদেশ করেন। সকলের ইচ্ছা ছিল মহারাজের মুখে কিছু শুনিবে, কিন্তু নিজে বলা দূরে থাকুক, অপর কাহাকেও তিনি বক্তৃতা করিতে দিলেন না। বক্তৃতার পরিবর্তে সমবেতকণ্ঠে নামরামায়ণ গাহিতে আদেশ করিলেন। যে কারণেই হউক, মহারাজ সেখানে বহির্মুখ প্রচারের প্রশ্রয় দিতে চাহেন নাই।[২]

---

২ একজন পশ্চিমদেশীয় সাধু ঐ সময় ময়মনসিংহে থাকিয়া কথার ফোয়ারা ছুটাইতে-ছিলেন এবং 'আও আও সাবা বাঙ্গলা আ যাও' বলিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ উদ্ধারের আকৃতি প্রকাশ করিতেছিলেন। মহারাজের কানে সেকথা গিয়াছিল ও তিনি বলিয়াছিলেন: সাবা বাঙ্গলা আ যাও বলচে, সে নিজে কতটা উঠেচে?—এক ধাপ?—দুই ধাপ?—তিন ধাপ? তার বেশী নয়।

ময়মনসিংহে ব্রাহ্মসমাজের একজন[৩] তাঁহাদের মাঘোৎসবে যোগদান করিবার জন্য এই বলিয়া মহারাজকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন : ছেলেবয়সে অনেকবার আপনারা ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনাসভায় যোগ দিয়েচেন, কেশব সেনের বক্তৃতা শুনেচেন ; আজ কেশববাবুর জন্মতিথি, এখানেও আমাদের উৎসব দেখবেন চলুন। মহারাজ সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পর বাবুরাম মহারাজ ও অল্প কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়া তিনি সমাজমন্দিরে যান, এবং উদ্যোক্তাদের অনুমতি নিয়ে ব্রহ্মচারী বিনোদকে ভজন গাইতে আদেশ করেন। বিনোদ গান ধরিল, 'মাতিয়ে দে আনন্দময়ী, একেবারে মেতে যাই।' সমাজমন্দির তখন লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। প্রায় এক ঘণ্টা পরে গান থামিলে তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলেন, মন্দিরটিও প্রায় জনশূন্য হইয়া গেল।[৪]

ময়মনসিংহের মহাকালী পাঠশালায় শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী নামে একটি জনসাধারণের পুস্তকালয় ও পাঠাগার ছিল। পাঠশালা হইতে উহা জিতেন-বাবুদের বৈঠকখানায় স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু সেখানে উহার কাজের পক্ষে পর্যাপ্ত স্থান না থাকায় স্বতন্ত্র এক গৃহ নির্মাণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বরিশালের মতিলাল বিশ্বাস স্বল্পবেতনে শিক্ষকতা করিয়া তরুণ যুবকদিগকে স্বামিজীর আদর্শে দেশের কাজে উদ্বুদ্ধ করিতেন ; তিনিই ঐ কাজের ভার লইয়া রেলষ্টেশনের দক্ষিণদিকে কিছু স্থান সংগ্রহ করেন, এবং নিজের ও নিজের পরিচালনাধীন তরুণগণের কায়িক পরিশ্রমে তথায় বেশ বড একটি টিনের ঘর নির্মাণ করিয়া স্বামিজীর মহামান্য গুরুভ্রাতাকে দিয়া উদ্বোধন করাইতে চাহেন। মহারাজ সানন্দে উহাতে সম্মতি দিলেন এবং সন্ধ্যার পর সদলবলে নবনির্মিত গ্রন্থভবনে পদার্পণ করিলেন (২৩শে জানুয়ারী)। ভবনের উত্তরাংশে এক প্রকোষ্ঠে বেদীর উপর শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর দুইখানি ফটো সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল, পূজার সংক্ষিপ্ত উপকরণও আনিয়া লইয়া জোগাড়

---

৩ বৈকুণ্ঠনাথ আচার্য। ৪ শৈলেন্দ্র বসু-কথিত।

করিয়া আনা হইয়াছিল, মহারাজ বেদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই বলিয়া উঠিলেন, দেখচ বাবুরামদা, ঠাকুর বসে আছেন! আমিই ঠাকুরের আরতি করব। সকলেই একথায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কত কামনা করিয়া, কত পবিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়া সাত তাডাতাডি তাহারা ঘরখানি বানাইয়াছে; সেই কামনা আজ আশাতিবিক্তভাবে পূর্ণ হইতে চলিয়াছে! পূজার আসনে বসিয়া মহাবাজ ধ্যানস্থ হইলেন এবং ঠাকুরের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, ঘণ্টা ও পঞ্চপ্রদীপ হস্তে আরতি করিতে লাগিলেন। ঘণ্টার মৃদুমধুর ধ্বনি উত্থিত হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে ঘবময় একটা ভাবতরঙ্গ বহিয়া যাইতে লাগিল, বাবুরাম মহারাজ ঊর্ধবাহু হইয়া নাচিতে লাগিলেন। যাহারা আশেপাশে ছিল তাহাদেব সকলের অঙ্গে, হয়তো নিজেদের অজ্ঞাতসারেই, নৃত্যের ভঙ্গিমা দেখা দিল—সকলের মধ্যেই ভাবটি সংক্রমিত হইয়াছে। আরতি-অন্তে মহারাজ হলঘরে আসিয়া বসিলেন; তাঁহার অনুমতি লইয়া বাবুরাম মহারাজ স্বামিজীর কর্মযোগ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিলেন।

বাঙ্গালোর মঠে সেইবাব ঘটে মহামায়ার পূজার আয়োজন হইয়াছে (১৯১৬), মহারাজ কহিলেন, তোরা যদি এই তিন দিনে প্রত্যেকে এক লাখ করে দুর্গা নাম জপ কবতে পারিস, দুর্গাপূজা করার ফল পাবি। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে, মহা উৎসাহেব সহিত সাধুবা জপ করিতে লাগিয়া গেলেন।

দাক্ষিণাত্য হইতে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজ আছেন পুরীধামে শশী-নিকেতনে (১৯১৭)। একদিন তিনি হরি মহারাজকে বলিলেন, ঈশ্বর সুন্দর স্তবপাঠ করে, কিন্তু সংস্কৃত ভাল জানে না, মানে ঠিক বুঝতে পারে না, আপনি যদি একটু বুঝিয়ে দেন। মাদ্রাজ মঠে থাকিতে ঈশ্বরকে মহারাজ কয়েকটি স্তব নির্বাচিত করিয়া দিয়াছিলেন নিত্যপাঠ করিবার জন্য, কখন কখন তিনি সমাগত ভক্তদিগকেও ঐসকল স্তব পাঠ করিয়া শুনাইতে বলিতেন।

দিন কয়েক পরে মহারাজ আবার বলিলেন, আপনি রয়েছেন, একটু ভাগবত-পাঠের ব্যবস্থা করলে হয় না? খুশী হইয়া হরি মহারাজ বলিলেন, বেশ তো। বিকালে পাঠের আসর বসিত, স্বয়ং মহারাজ আসনে বসিয়া পাঠ

শুনিতেন। মাত্র আটদশ জন শ্রোতা, বাহিরের ভক্তেরাও কেহ কেহ উপস্থিত থাকিতেন। সেবকদের একজন পাঠ করিতেন ও দুরূহ স্থলগুলি হরি মহারাজ বুঝাইয়া দিতেন।[৫]

পুরী হইতে আসিয়া মহারাজ যখন উদ্বোধনে থাকিতেন (নভেম্বর, ১৯১৭), সেই সময় ভবানীচরণ ( বরদানন্দ*) তাঁহার সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। তখন হইতে কিঞ্চিদধিক চারি বৎসর ভবানী বরাবর মহারাজের সঙ্গে ছিলেন, এবং ভজন গাহিয়া ও স্তোত্রপাঠ করিয়া শুনাইয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিতেন। প্রত্যহ সকালে বেড়াইতে বাহির হওয়ার পূর্বে প্রায় সাতটার সময় মহারাজ স্তবপাঠ শুনিতেন। গুরুপ্রণাম, বেদসারশিবস্তোত্র, কালীশতনামস্তোত্র, ত্রিপুরাসুন্দরীস্তোত্র ও জগদ্ধাত্রীস্তোত্র রোজই পড়া হইত। একএক দিন মধুসূদনস্তোত্র বা গোপালস্তোত্র, কদাচিৎ প্রপন্নগীতা এবং কোন কোন দিন, সকলের শেষে, শান্তিস্তোত্র পড়িতে বলিতেন। ইতঃপূর্বে মহারাজ যখন কাশীতে ছিলেন ( ১৯১৩-১৪ ), কিছুদিন ধরিয়া প্রত্যহ সকালে হৃষীকেশ ( প্রশান্তানন্দ ) তাঁহাকে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পাঁচটি স্তব পড়িয়া শুনাইতেন। হৃষীকেশকে তিনি স্তবগুলি কণ্ঠস্থ করিতে বলিয়াছিলেন।

বসু-ভবনে থাকিতে মহারাজ একবার শ্রীমদ্‌ভাগবত-পাঠের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—মূল সংস্কৃত, উহার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা। অনেকদিন ধরিয়া সেই পাঠ চলিয়াছিল, ভাগবতের আদি হইতে সুরু করিয়া। বাসুদেবানন্দ পাঠ করিতেন, পাঠের পর ভবানী ভজন গাহিতেন। সায়ংকালীন সেই আসরে মহারাজ উপস্থিত থাকিতেন, অনেকে আসিতেন, মেয়েরাও বারান্দায় বসিয়া শুনিতেন। একটি অধ্যায়ে নারীচরিত্রের নিন্দা আছে, মহারাজ সেই অধ্যায় বাদ দিয়া পড়িতে বলিয়াছিলেন।

বসু-ভবনে ভোরবেলা রোজই মহারাজের ঘরে ভজনগান হইত। রামকৃষ্ণ বসুর কন্যা মহামায়া বলিয়াছেন ঃ ভজনের সময় মহারাজ আমাদের সকলকে

---

৫ শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের আদি হইতে সুরু করিয়া রাসলীলার কিয়দংশ পর্যন্ত ( বঙ্গানুবাদ ) পাঠ হইয়াছিল। হরি মহারাজের অসুখ হওয়াতে পাঠ বন্ধ হইয়া যায়।

ডাকিয়া পাঠাইতেন। আমার মা আসিতেন, পিসীমা এখানে থাকিলে তিনিও আসিতেন। অনুপমমহিমপূর্ণ ব্রহ্ম কররে ধ্যান—ইত্যাদি গান সাধুরা গাহিতেন, ছোট খাটটিতে বসিয়া তন্ময় হইয়া মহারাজ শুনিতেন, আর ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমা দিয়া মুঠোকরা বাঁ হাতের অঙ্গুলিপৃষ্ঠে তাল দিতেন। আমরাও একমনে শুনিতাম তাঁহার প্রশান্তিপূর্ণ মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া।

গোকুলদাস দে জীবের কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলে, সুমিষ্টসুরে আবৃত্তি করিয়া মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'সাধনভজন মন কর তাঁর নিরন্তর।'

অপরেশ মুখোপাধ্যায় কোন নাটক লিখিলেই মহারাজকে উহার বিষয়বস্তু শুনাইতেন। মহারাজের ইচ্ছায় অপরেশবাবু তাঁহার রামানুজ নাটকে নামরামায়ণের কিয়দংশ জুড়িয়া দেন। এই বিষয়ে মহারাজের এতই আগ্রহ ছিল যে, থিয়েটারের লোকদিগকে কীর্তনের সুর শিখাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে অম্বিকানন্দকে আনাইয়াছিলেন। মহারাজের ইচ্ছানুসারে অপরেশবাবু তাঁহার অপর কোন নাটকে 'নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায়' ইত্যাদি শিবস্তোত্র ও 'অভয়ার অভয়পদ কর মন সার' এই গানটি সংযুক্ত করেন।

শাস্ত্রপ্রচারেও মহারাজের উৎসাহ পরিলক্ষিত হইত। তাঁহারই প্রেরণায় পুরীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অটলবিহারী মৈত্র 'শ্রুতিসারসংগ্রহ' নামে বত্রিশখানা উপনিষদ্, গীতা ও চণ্ডী একত্র সংকলিত ও মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করেন; বাগবাজারের কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ' কয়েক সহস্র মুদ্রিত করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন।

## (২) সদ্‌গুরু

ডাক্তার কাঞ্জিলাল কয়েক বৎসর যাবৎ মহারাজের কাছে তান্ত্রিক পূর্ণাভিষেক লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন, মহারাজও তাঁহাকে ক্রমাগত ফিরাইয়া দিতেছিলেন, পরে হইবে বলিয়া। বারবার প্রত্যাখ্যাত হইয়া, আর কোন

কথা শুনব না, এবার আমাকে দিতেই হবে—এই বলিয়া কাঞ্জিলাল জেদ প্রকাশ করিলে মহারাজ গম্ভীর হইয়া গেলেন ও বলিতে লাগিলেন: আমি ভাল না বুঝলে দেব? ভগবান কি সাপ যে, তুমি কতকগুলি মন্ত্র বিড়বিড় করলে, আর অমনি তিনি চলে এলেন? এমন কোন সাধন নাই, এমন কোন ত্যাগ বা তপস্যা নাই, যাতে করে মানুষ ভগবানকে লাভ করতে পারে। তিনি যাকে নেন কেবল সেই তাঁকে লাভ করে।

কাঞ্জিলালকে তিনি পরে পূর্ণাভিষেক দিয়াছিলেন।

মঠ হইতে তিনচারি জন ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি লইতে কলিকাতায় মহারাজের কাছে আসিয়াছে। উ—কে তিনি সেইবার সন্ন্যাসের অনুমতি দিলেন না। উ— তাঁহার পরবর্তী কাহারও কাহারও সন্ন্যাস আগেই হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুযোগ করিতে থাকিলে মহারাজ কহিলেন, আমি সন্ন্যাস দেব, তুমি নেবে; আমি যদি ভাল না বুঝি আমি দেব? তিনি গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। তাহারা চলিয়া যাইতে কতকটা স্বগতভাবে অথচ আবেগের সহিত বলিতে লাগিলেন: আমার কাছে এসে দীক্ষা চায়, ব্রহ্মচর্য চায়। কেউ বলে না, ভগবানকে চাই। আমার কাছে এসে বলুক না আমি ভগবানকে চাই—ভগবান দেখিয়ে দিন, কেমন না দিতে পারি!

উ—কে পরে তিনি সন্ন্যাস দিয়াছিলেন।

সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) হঠাৎ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি সমাধি করে দিতে পারেন? মহারাজ তখন পায়চারি করিতেছিলেন, কহিলেন: হাঁ পারি। তবে রাখা শক্ত, যেমন উঠা উপরের দিকে তেমনি পড়বার ভয়ও থাকে খুব। নিজের চেষ্টায় হওয়াই ভাল। মা অনায়াসে পারেন।[১]

মহারাজ বাঙ্গালোর মঠে আছেন, রাত্রিকালে জল খাইতে চাহিলেন। ঈশ্বর গ্লাসে করিয়া জল লইয়া আসিলে তিনি একদৃষ্টে ঈশ্বরের দিকে চাহিয়া রহিলেন, জলের দিকে লক্ষ্যটি নাই। মুখের ভাব অতি গম্ভীর। ধীরে ধীরে

১ হরানন্দ-কথিত।

কহিলেন, তুই সিদ্ধপুরুষ হতে চাস ?—ভগবানকে চাস ? ঈশ্বরের কেমন ভয় উপস্থিত হইল, গ্লাসধরা হাতটি কাঁপিতেছে, কাঁপিতে কাঁপিতে অস্ফুটভাবে বলিলেন, হ্যাঁ মহারাজ। খানিক পরে তাঁহার সেই গম্ভীর ভাব চলিয়া গেল, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, কাল আমাকে বলবি।

ঈশ্বরের বলা আর হইল না।

ভ— তখন বেলুড় মঠে থাকিয়া রাত্রি-জাগরণ করিয়া জপ করেন। এই বিষয়ে চারু (ভজনানন্দ) ছিলেন তাঁহার সহযোগী। মহারাজ মঠে আসিয়াছেন, ভ— তাঁহাকে প্রণাম করিতেই কহিলেন, খুব জপ কর বুঝি ? আমি চোখ দেখলে টের পাই। কুলকুণ্ডলিনী জেগে গেছেন, পথ পাচ্ছেন না। আমায় জিজ্ঞাসা কোরো, বলে দেব।

ভ—কে তিনি অজপা শিখাইয়াছিলেন ও যাহা বলিবার বলিয়া দিয়াছিলেন।

বেলুড় মঠে মহারাজের ঘরে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া গোকুলদাস দে ঠাকুরকে এইভাবে চিন্তা করিতেছিলেন : কৃপাময় ঠাকুর—করুণাময় ঠাকুর—প্রেমময় ঠাকুর—প্রাণময় ঠাকুর—ধ্যানময় ঠাকুর—জগন্ময় ঠাকুর—সংসারময় ঠাকুর। যেমন একটি করিয়া কথা তাঁহার মনে উদিত হইতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মহারাজও ঠিক সেই কথাটিই উচ্চারণ করিতেছিলেন। 'সংসারময় ঠাকুর' এই শেষ কথাটি উচ্চারণ করিয়াই মহারাজ কহিলেন, ঠাকুরকে এভাবে চিন্তা করবি।[২]

পুরীধামে রতিকান্ত মজুমদার মনের চাঞ্চল্য দূর করিবার উপায় জানিতে চাহিলে মহারাজ তাঁহার মন্ত্র হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। পূর্বজীবনে এক যোগী বৈষ্ণবসাধু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রতিবাবুকে যুগলমন্ত্র শুনাইয়া দিয়া-

---

২ বাঙ্গালোর মঠের বারান্দায় বিকালে ঈশ্বর আনমনে বসিয়া আছেন, হঠাৎ মহারাজ ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, কী ভাবিচিস বল্ তো, একটুও লুকুবি না। উত্তর শুনিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পরক্ষণেই হঠাৎ আবার আসিয়া ঈশ্বরের মুখের উপর আঙুল নাড়িয়া কহিলেন, ঠিক এক্ষুনি কী ভাবছিলি বল্। উত্তর শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, যা, একছিলিম তামাক নিয়ে আয়।

ছিলেন। মন্ত্রটি শুনিয়া লইয়া মহারাজ কহিলেন, ঐ মন্ত্রই জপ করতে থাকুন, আর দীক্ষা নেবার প্রয়োজন নাই। তারপরে কিভাবে রতিবাবু আসন করিয়া বসেন তাহা দেখিয়া লইয়া বলিলেন, ঐ আসনেই বসবেন, আর মানসপূজা করে নিয়ে, তারপরে জপ করবেন। আর এইভাবে প্রার্থনা করবেন ঃ হে ভগবান, তুমি চন্দ্রে, তুমি সূর্যে, তুমি নক্ষত্রে—তুমি সর্বত্র বিরাজিত। আমি সাধনভজনহীন, আমাকে দেখা দাও।

পূজনীয় শশী মহারাজের নিকট হইতে পরিচয়পত্র নিয়া জনৈক ভক্ত পুরীতে আসেন তাঁহার এক বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া, এবং মহারাজের কাছে মন্ত্র-দীক্ষা প্রাপ্ত হন। একদিন মহারাজ তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করেন—ভগবান কেন আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন? তারপরে নিজেই উত্তর দেন—তাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য। ঐ ভক্তটিকে লেখা মহারাজের একখানি পত্রের মর্ম এইরূপ ঃ ভগবানের ধ্যান কৃত্রিম বা ক্লিষ্টভাবে করিবে না; তাঁহাকে সুকোমল শিশুর মত মনে করিয়া তাঁহার সহিত খেলা করিবে; সরল ভাব অবলম্বন কর।[৩]

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে একথা সুবিদিত যে, মহারাজ কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষা দিতে সহজে সম্মত হইতেন না, দীক্ষার কথা কেহ উত্থাপন করিলেই গম্ভীর হইয়া যাইতেন, আর অনেকদিন ধরিয়া যাওয়াআসা করিবার পর তবে কাহাকেও মন্ত্রদান করিতেন। কাহাকেও বা মন্ত্রদানের পূর্বে দীর্ঘকাল নামবিশেষ জপ করাইয়া লইতেন। ত্যাগী শিষ্যগণের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও[৪] সন্ন্যাস-দানের অনেকদিন পরে তিনি মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেন। 'ন কুর্বীত বহূন্ শিষ্যান্'— এই শাস্ত্রবাক্য তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া গিয়াছেন। সন্ন্যাস অপেক্ষা মন্ত্র-দানের ঝুঁকি যে অনেক বেশী, মহারাজের আচরণে তাহাই প্রতিপন্ন হয়।

৩ বৃদ্ধ বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যোগ দিয়া ভক্তটি পরে স্বামী পরানন্দ নামে পরিচিত হন। [পি শেষাদ্রি-লিখিত]

৪ অমৃতানন্দ, দুর্গানন্দ প্রভৃতি।

কাশীতে স্বামিজীর জন্মতিথির দিন ভোরে মহারাজ ১৫ জনকে ব্রহ্মচর্য ও ২২ জনকে সন্ন্যাস দেন (১৯২১)। এই বিষয়ে কেহ (খুব সম্ভবতঃ শুকুল মহারাজ) তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, আপনি যে এতজনকে সন্ন্যাস দিচ্চেন, এদের সকলকেই কি উপযুক্ত বোধ করচেন? মহারাজ কহিলেন: উপযুক্ততার কথা যদি তোল তা হলে বলব কেউই উপযুক্ত নয়। তবে আমার এখন একটা কী ভাব হয়েচে জান?—সিম্প্যাথি (অনুকম্পা)। যারা জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ সন্ন্যাস নিতে চাইচে তাদের পথে আমি বিঘ্ন হব কেন? তাদের ঠাকুরের পায়ে ফেলে দিলুম, তিনি বুঝুন আর তারা বুঝুক।

কথিত আছে, যতদিন না দীক্ষাপ্রার্থী ব্যক্তির ইষ্টমূর্তির দর্শন পাইতেন ততদিন পর্যন্ত তিনি তাহাকে মন্ত্রদীক্ষা দিতেন না। সম্ভবতঃ সেই কারণেই প্রার্থী হইয়া কেহ তাঁহার কাছে সদ্য দীক্ষা পাইয়াছে,[৫] কেহ বা একাদিক্রমে ছয় বৎসর ঘুরিয়াও পায় নাই। একজনের এমন এক ইষ্টমূর্তি তিনি দর্শন করিয়াছিলেন যে-মূর্তির মন্ত্র তিনি জানিতেন না। তন্ত্রসার ঘাঁটিয়া মন্ত্রটি উদ্ধার করিতে হয়।[৬] অযাচিতভাবে ডাকিয়া লইয়া দুইএক জনকে[৭] তিনি মন্ত্রদান করিয়াছেন বলিয়াও জানা যায়।

পি. শেষাদ্রি লিখিয়াছেন: মহারাজ আমাকে উত্তরাস্য হইয়া বসিতে বলিলেন, তিনি পূর্বাস্য ছিলেন।...প্রায় আধঘণ্টা তিনি মৌনী ছিলেন, আমার হৃদয় ধুক্‌ধুক্ করিতেছিল।...বামহস্ত পাত্ররূপে ব্যবহার করিয়া তাহা হইতে দক্ষিণহস্তে গঙ্গাজল লইয়া 'ওঁ বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, গঙ্গা বিষ্ণুঃ' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শরীরের কয়েকটি ভাগে প্রক্ষেপ করিতে বলিলেন, আবার মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক গঙ্গাজল পান করিতে বলিলেন। অনন্তর বলিলেন, 'হৃদয়-মধ্যে শ্বেতপদ্ম ভাবনা করিবে—তাহার ভিতরে ও বাহিরে জ্যোতি; পদ্মের মধ্যে ইষ্টদেবতা জ্যোতির্ময়রূপে বিরাজ করিতেছেন।' মহারাজ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধীরে ধীরে ইষ্টদেবতার বসন, ভূষণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিতে লাগিলেন। মনে হইল, তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আমাকে বলিতেছেন।

---

৫ যেমন, অমরানন্দ। ৬ জগদানন্দ-কথিত। ৭ মহামায়া সরকার, চিন্ময়ী বসু।

সর্বশেষে মন্ত্রটি তিনবার উচ্চারণ করিয়া আমাকে তদ্রূপ করিতে আজ্ঞা করিলেন।

গ্রীষ্মের অপরাহ্নে বিনোদবিহারী দেব ময়মনসিংহে তাঁহাদের বাড়ীর পুকুরপাড়ে দাঁড়াইয়াছিলেন, হঠাৎ একটা গরম হাওয়ার ঝাপটা লাগিয়া তাঁহার ডান চক্ষু নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। দিন কুড়ি যাবৎ সর্বদাই চক্ষু বাঁধিয়া রাখিতেন, দিনের আলো সহ্য হইত না। এই অবস্থায় রাত্রে স্বপ্ন দেখেন, মহারাজ আসনে বসিয়া আছেন, নিজেও তাঁহার সম্মুখে আসনে বসিয়া, চারিদিকে পূজার উপকরণ। মহারাজ তাঁহাকে জল দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া একটি মন্ত্র দিলেন। পূর্বেই তিনি মাতাঠাকুরাণীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন, সুতরাং ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কোয়ালপাড়ায় যাইয়া মায়ের কাছে ঘটনা বিবৃত করিলেন। মা কহিলেন, তোমার এটা দীক্ষাই হয়েচে, তুমি দুই মন্ত্রই জপ করবে। বিনোদবাবু তারপর কলিকাতায় আসিয়া মহারাজকে স্বপ্নের কথা নিবেদন করিলেন। মহারাজ খানিক চুপ থাকিয়া হঠাৎ উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, হাঁ, তোর দীক্ষা হয়ে গেছে, তুই বাজার থেকে একটা ফল নিয়ে আয়।

দৃষ্টিমাত্রে মানুষের ভিতর বাহির দেখিয়া লইবার শক্তি যাঁহার ছিল, তিনি যে শিষ্যগণের ভূতভবিষ্যৎ দেখিয়া লইবেন ইহা বিচিত্র নহে। দীক্ষাদানের পূর্বে এক অবিবাহিত যুবককে মহারাজ বলিয়াছিলেন, একদিন তুমি এক ভয়ানক কুকাজ করেছিলে, (কাজটির উল্লেখ করিয়া) আর কখনো অমন করো না। ভগবন্নিষ্ঠার জন্য একটি যুবককে মহারাজ ভালবাসিতেন। যুবকটি তাঁহার কাছে দীক্ষাপ্রার্থী হইলে তিনি বলিয়াছিলেন, তোমার গুরু কাশীতে আছেন। তাঁহার নির্দেশে সেই যুবক কাশীতে যাইয়া তোতাদ্রি মঠে রামানুজপন্থী গুরুর নিকট দীক্ষা ও সন্ন্যাস গ্রহণ করে।

অতুল চৌধুরীর আত্মকথা: ১৯১৬, জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে, আমি জয়রামবাটী যাই। পরদিন আমার দীক্ষা হয়। আসনে বসিয়া, মন্ত্রদানের পূর্বেই, মা একটা ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত আমার পূর্বজন্মের সম্বন্ধের

আভাস দেন। আমি এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইলে বলেন, মহারাজদের জিজ্ঞাসা করো। সেইদিনই জয়রামবাটী হইতে রওনা হইয়া, তারকেশ্বরের পথে পরদিন কলিকাতায় আসি ও তারপর দিন বিকালে মঠে গিয়া বাবুরাম মহারাজের আদেশে মঠে রাত্রিবাস করি। সকালে প্রায় আটটার সময় মহারাজকে প্রণাম করিতে গেলে আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠেন, মহাশয়, (পূর্বজন্মের নাম করিয়া) অমুক তো ? তাবপর তিনি যেসব ঘটনার কথা বলিলেন মায়ের কথার সঙ্গে হুবহু মিলিয়া গেল। ইহার দুইতিন সপ্তাহ পরে মহারাজ ঢাকায় যান, সেখানে আরও আলাপ হয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কী চাও ? উত্তর দিলাম, এ জীবনটা গাধার মত খেটে যাব। অমনি কহিলেন, তথাস্তু।

দীক্ষাদানের সঙ্গে শিষ্যের সকল দায় তিনি গ্রহণ করিতেন, জন্মমৃত্যু তবি-বার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেন। পুলিনবিহারী মিত্রকে বলিয়াছিলেন : কী বল পুলিন, ভবসাগরটা তো তরতে হবে ? (হাসিতে হাসিতে) অনায়াসে—হেসেখেলে—হেসেখেলে—মহানন্দে !

তাঁহার কাছে সন্ন্যাস গ্রহণেব সময় যতীশ্বরানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, শ্রীগুরুর ভিতর হইতে প্রসৃত হইয়া এক দিব্যশক্তি তাঁহাকে স্পর্শ কবিতেছে ; তাঁহার অভয়বরদ করস্পর্শে তিনি উপলব্ধি কবিয়াছিলেন, এক সর্বব্যাপী চিৎ-সত্তায় সমুদয় জগৎ অবগাহন করিতেছে।

পরেশনাথ সেনগুপ্ত লিখিয়াছেন : একদিন বসু-ভবনে মহারাজের ঘরে যাইবামাত্র স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, কী মনে হে বাপু। তাঁহার শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণামান্তে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরেই বলিতে লাগিলেন : মাভৈঃ মাভৈঃ, কোন ভয় করিস নি। নির্ভর করে পড়ে থাক্, বছরখানেক বছর দুই এখন নিজেকে ভুলে কেবল তাঁরই সাধনভজনে ডুবে থাক্, আপনা-আপনি সব ঠিক হয়ে আসবে। কোন চিন্তা করিস নি, কী করব ভাবিস নি। তুই তো তাঁরই যন্ত্র—নিজে করব ভাবিস কেন ? তাতেই তো যত চিন্তা, যত গোলযোগ। যা পেয়েচিস তাই নিয়ে থাক্। কী মহৎ—কী সুন্দর—সারা

বিশ্বের সার সৌন্দর্য! আনন্দে বিভোর হয়ে যা, তখন আর ভুলতে পারবি নি। খালি জপ, খালি জপ। এখন আর।—এই বলিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। সমস্ত দিনটাই আনন্দে ভরপুর হইয়া রহিলাম, যেন সদাই ইষ্টমূর্তি হৃৎপদ্মে বিরাজিত! তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত 'বালার্কমণ্ডলাভাসাং' ধ্বনি প্রতি-নিয়ত কর্ণে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

গৌরীশানন্দ লিখিয়াছেন: বেলুড় মঠে একদিন বেলা আটটার সময় মহারাজ গঙ্গার ধারে পায়চারি করিতেছিলেন। আমাকে দেখিতে পাইয়া কাছে ডাকিলেন ও প্রশ্ন করিলেন, নেপাল, কেমন আছ? আমি ভাল আছি শুনিয়া কহিলেন, আমি তোমার শরীরের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি নি, আমি জানতে চেয়েছি তোমার মন ঠিক আছে কিনা। তিনি ধীরে ধীরে আমার বুকে পিঠে হাত দিয়া দিয়া দেখিতে লাগিলেন। শেষে বলিলেন, হ্যাঁ ঠিক আছে, এইভাবে থাকবে। তাঁহার দিব্যস্পর্শে আমার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গিয়াছিল।

শোনা যায়, মিনার্ভা থিয়েটারে 'রামানুজ' অভিনয় (১৯১৬)—রামানুজ আচণ্ডালে প্রেম বিলাইতেছেন এই দৃশ্য—দেখিয়া মহারাজ অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিলেন, এবং তদবধি দীক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত উদার হইয়া গিয়াছিলেন। কথাটি সর্বাংশে ঠিক নহে। দীক্ষাদানে বরাবরই তাঁহার যথেষ্ট বাছবিচার ছিল। শেষাশেষি পাঁচছয় জনকে মাত্র একদিনে দীক্ষা দিয়াছিলেন বেলুড় মঠে, আর সেইদিনও একজন প্রার্থী তাঁহার কাছে দীক্ষা পায় নাই, মঠে যোগদান করা সত্ত্বেও।

তাঁহার জীবনে একবারমাত্র এই ব্যাপারের—দীক্ষাদানে অতিমাত্র কঠোরতার—ব্যতিক্রম দেখা যায়। কন্যাকুমারীতে যাইয়া মহারাজ যখন নয়দিন তথাকার ধর্মশালায় বাস করেন সেই সময়ে (ডিসেম্বর, ১৯১৬) তুলসী মহারাজের নির্বাচিত একদল ভক্ত, সংখ্যায় দশ জন, কন্যাকুমারী আসেন ও মহারাজ একে একে তাঁহাদের সকলকেই মন্ত্রদীক্ষিত করেন। কন্যাকুমারী

আগমনের পূর্বে বাঙ্গালোরে অবস্থান কালেও তিনি প্রায় পঞ্চাশ জন দীক্ষার্থীকে মন্ত্রদান করিয়াছিলেন।[৮]

মহারাজ দীক্ষাদান ব্যাপারে যেমন কঠোর ছিলেন, সাধারণ্যে ধর্মপ্রসঙ্গ করিতেও তেমনি পরাঙ্মুখ হইতেন। উপযুক্ত অধিকারী বলিয়া বুঝিতে না পারিলে কাহাকেও তিনি সাধনাঙ্গ বিষয় উপদেশ করিতেন না। অনেকদিন যাওয়া আসা করিবার পর, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির ব্যাকুলতা বর্ধিত করিয়া তিনি হয়তো তাহাকে কিছু বলিয়া দিতেন।

মহারাজ চণ্ডীদাসের অনেক পদ জানিতেন ও বলিতেন। ঈশ্বর জিজ্ঞাসা করেন, উনি তো আগে শাক্ত ছিলেন—দেবীপূজা করতেন, পরে বৈষ্ণব হয়ে যান? মহারাজ কহিলেন, উনি মহাপুরুষ ছিলেন, তা দেবী আর কৃষ্ণ কি আলাদা?

উদ্বোধনে বেদান্ত পড়া হইত একটি ঘরে। মহারাজ তখন উদ্বোধনে আছেন, খুদুমণি তামাক দিতে গিয়া বলিলেন, আমার মাথায় এসব ঢুকবে না। একএক জন একএক মত বড় করেচে—বলেচে, আমার মতই সত্যি। একটি যদি সত্যি হয়, অপরগুলিও সত্যি হবে কী করে? মহারাজ কহিলেন: সে কী রে, সাধকের অবস্থাভেদে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত সবই সত্যরূপে অনুভূত হয়ে থাকে। অদ্বৈতানুভূতির পর আবার যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা—এইভাবে লীলাও সত্য বলে অনুভূত হয়। তবে কি জানিস, সমাধির পর—নিজের নিজের ভাবে একেবারে ডুবে যাবার পর—তবে ধর্মের আরম্ভ।

পরেশবাবু লিখিয়াছেন:

মাদ্রাজ মঠে একদিন সন্ধ্যাবেলা (১৯২১) ঈশ্বর মহারাজ, বঙ্কিম ঘোড়ই ও আমি বেড়াইয়া আসিয়া দেখিলাম, মহারাজের ঘরটি লোকে পরিপূর্ণ। আমরা পাশের ঘর হইতে শুনিতে লাগিলাম, মহারাজ বলিতেছিলেন: তাঁর

---

৮ ভূমানন্দ-কথিত।

নিত্যলীলা হচ্চে। সাধক সিদ্ধ অবস্থায় সেই সব লীলা দর্শন করেন। অদ্বৈতানুভূতির নীচের ধাপে এই সব লীলার দর্শন হয়। অবশ্য অদ্বৈতানুভূতিতেই সাধনের পরাকাষ্ঠা। যা কিছু জগতে ঘটচে, যা কিছু আমরা দেখতে পাচ্চি, সবই সূক্ষ্মাকারে থেকে যাচ্চে। সূক্ষ্মলীলার স্থূল প্রকাশ হচ্চে, আবার সূক্ষ্মাকারে পরিণতি হচ্চে—এইরূপই চলেচে। তাই শ্রীভগবানের লীলা সবই অনাদি অনন্ত চিরস্থায়ী। সাধক সাত্ত্বিক ভাবের পরিণত অবস্থায় এইসব লীলা দর্শন করে কৃতার্থ হন।

একবার তিনি বলিয়াছিলেন: তাঁর সম্বন্ধে বুদ্ধিবিচার কল্পনাদি দ্বারা যত উচ্চ ধারণাই কর না কেন, যখন তাঁর সাক্ষাৎ দর্শন হয় তখন ঐসকল ধারণা অতি তুচ্ছ হয়ে যায়।[৯]

গোবিন্দানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঈশ্বরের দর্শন কী করে পাওয়া যায়? তিনি বলেন, যদি কেউ সম্পূর্ণ নিরবলম্বন, পথের কাঙ্গাল সাজতে পারে, তবে যদি তাঁর কৃপায় হয়।[১০]

অধ্যাপক নিখিল মৈত্র বায়ুপরিবর্তনে বাঙ্গালোর আসিয়াছেন, মঠের কাছেই তাঁহার বাসা। মাঝে মাঝে তাঁহার ও তাঁহার গাড়োয়ালী ভৃত্য রামসিংএর সঙ্গে মহারাজের দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়। রামসিং তরুণ-বয়স্ক যুবক, সুপুরুষ, দীর্ঘকায়। মহারাজের ব্যবহার দেখিয়া সেবকেরা বুঝিতে পারিতেন এই যুবকটিকে তিনি স্নেহ করেন। কার্যাবসরে যখন তখন সে মঠে চলিয়া আসিত ও কোন কারণে মহারাজের দেখা না পাইলে ফিরিয়া যাইত। আগের দিন রাত্রে কালীপূজা হইয়াছে, সকালবেলা মহারাজ নিজের ঘরে বসিয়া প্রসাদ পাইতেছেন, এমন সময় তুলসী মহারাজ আসিয়া জানাইলেন, রামসিং দেখা করিতে চাহিতেছে এবং তখনই দেখা করিবার জন্য

---

৯ জগদানন্দ-কথিত।

১০ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীমুখোচ্চারিত এই শ্লোকটি তিনি মাঝে মাঝে বলিতেন: তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

আকুলতা প্রকাশ করিতেছে। মহারাজ কহিলেন, রামসিং দেখা করবে, তাকে এখানেই নিয়ে এস। সে আসিয়া দণ্ডবৎ ভূপতিত হইয়া মহারাজকে প্রণাম করিল, তারপরে উঠিয়া মহাবীরের ভঙ্গীতে এক হাঁটু গাড়িয়া বসিতেই মহারাজ উভয় হস্ত—ডানহাতখানি তখনো প্রসাদমাখাই আছে—তাহার মাথায় রাখিয়া কহিলেন, রামসিং, আজ থেকে তুমি রামকৃষ্ণের হয়ে গেলে। রামসিং-এর দুই চোখে তখন ধারাকারে অশ্রু গড়াইতেছে আর মহারাজের চক্ষে তখন কী করুণামাখা দৃষ্টি! তাঁহার আদেশে ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ রামসিংকে খাইতে দেওয়া হইল।[১১]

সুসাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুরের সময়কার লোক। তাঁহার সঙ্গে মহারাজ অনেকক্ষণ ধরিয়া ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ করিতেন। দেবেনবাবু তাঁহাকে ঠাকুরের মতই ভক্তি করিতেন।

যোগীন-মা ও গোলপ-মা প্রায়ই একসঙ্গে মহারাজকে দর্শন করিতে আসিতেন বসু-ভবনে। তাঁহাদের সঙ্গেও অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি ঈশ্বরীয় কথা কহিতেন। ধ্যানজপ করিবার কালে যোগীন-মার ঈশ্বরীয় দর্শনাদি হইত, সেই সকল অনুভূতির খুঁটিনাটি তিনি মহারাজকে নিবেদন করিতেন। মহারাজের অনুমোদন পাইলে তবে তাঁহার মনটি ঠাণ্ডা হইত। একদিন মহারাজ পেছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, যোগীন-মা দেখিলেন সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ। বয়ঃকনিষ্ঠ মহারাজকে তিনি 'তুমি' বলিতেন, কিন্তু প্রণাম করিতেন তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া।

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের আত্মকথা : ভুবনেশ্বর মঠে একদিন (১৯২০) আমি সখেদে মহারাজকে বলিয়াছিলাম,—আমারও ঠাকুরকে দেখার সম্ভাবনা ছিল, অদৃষ্টের ফেরে হয়ে উঠে নি। তখন পড়াশোনা করি, ঠাকুরের কথা শুনে তাঁকে দর্শন করার ইচ্ছা হওয়ায় একদিন দক্ষিণেশ্বর যাব বলে বেরিয়ে পড়ি। আলমবাজার পর্যন্ত গিয়েই মনে হল, তিনি মনের

১১ মুক্তেশ্বরানন্দ-কথিত।

সব গোপনীয় কথাই জানতে পারেন, আবার বলেও দেন। তরুণ বয়স তখন, অনেক কিছুই তো মনে ছিল যা গোপনই রাখতুম। যদি সকলের সামনে বলে দিয়ে অপদস্থ করেন এই ভয়ে আলমবাজার থেকেই ফিরে এলুম, তাঁর দর্শনলাভ আর হল না! মহারাজ কহিলেন, তাঁকে দর্শন করতে আপনি আলমবাজার পর্যন্ত গিয়েছিলেন তো, তা হলে আপনার দর্শন করাই হয়েচে। 'না মহারাজ, আমার দর্শন হয় নি।' 'না না, আপনি গিয়েছিলেন তো আলমবাজার পর্যন্ত? ঐ দর্শনই হয়েচ।' 'না মহারাজ, আমার দর্শন হয় নি।' নিজের দুর্ভাগ্য স্মরণ করিয়া আমার চোখে তখন জল ঝরিতেছে। 'আমি বলচি আপনার দর্শন হয়েচে।' চকিতে মহারাজের দিকে চাহিয়া দেখি, ঠাকুর বসিয়া আছেন!

## (৩) আশ্রিতপালন

মহারাজের আশ্রিতবাৎসল্যের সুন্দর নিদর্শন তাঁহার এক সেবকের আত্মকথা। সরলবুদ্ধি, সবল-সুশ্রী-দেহ, আবেগপ্রবণ ও একগুঁয়ে যুবক পদে পদে প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিয়া কিরূপে শেষে মহারাজের অভয়াশ্রয়ে চিরতরে স্থানলাভ করিয়াছিলেন সে কাহিনী যেমন বিচিত্র তেমনই শিক্ষাপ্রদ। তিনি বলিতেছেন:

"প্রথম যখন বেলুড় মঠে আসিলাম (ফেব্রুয়ারী, ১৯১৪), সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে। শিয়ালদহ হইতে হাওড়া হইয়া বরাবর হাঁটিয়া আসিয়াছি, গত রাত্রি হইতে কিছুই খাই নাই। সামনের বারান্দায় বাবুরাম মহারাজ দাঁড়াইয়াছিলেন, জোড়হাতে তাঁহাকে নমস্কার করিলাম। আমার মুখের দিকে চাহিয়াই তিনি একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরে অশোক, খাবার, আছে তো? বামুনঠাকুরের খাবারটি শুধু আছে, অশোক জানাইলেন। পরে শুনিয়াছি বামুনের খাবারটি আমাকে দিয়া তাহার জন্য জলযোগের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

"আহারের পর বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে নিম্নোক্তরূপ কথাবার্তা হয়ঃ 'কোত্থেকে এলে?' 'বগুড়া।' 'দেশ কি বগুড়া?' 'পাবনা।' 'কী পর্যন্ত পড়েচ?' 'কলেজে ঢুকি নি।' 'দেখ, মূর্খ টুর্খকে আমরা মঠে রাখি না, এখানে সব বি-এ, এম-এ পাস ছেলেরা থাকে। তুমি বি-এ পাস যদি করতে পার তখন এখানে আসবে।' 'মশায়, আমি তা পারব না। আমি এসেচি, থাকব এখানে।'

"তিনি চটিয়া গেলেন। 'পরমহংসদেব কী পাস?' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল। খানিক চুপ থাকিয়া বলিলেন, তুমি এখানে কী করবে? মাটি কোপাতে পারবে? গরুর ঘাস কাটতে পারবে? আমি বলিলাম, পারব। 'আচ্ছা যাও, বিশ্রাম করগে।' তিনি দর্শকদের ঘর দেখাইয়া দিলেন। আমি সেই ঘরে ঢুকিতেই নিজেও ঢুকিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি স্বদেশী টদেশী করে এসেচ—বোমা টোমা? এখানে কিন্তু পুলিশ আসে। আমি বলিলাম, না মশায়।

"বিকালে অশ্বিনীকুমার দত্তের ভক্তিযোগ পড়িতেছিলাম, সঙ্গে ছিল। বাবুরাম মহারাজ আসিয়া কহিলেন, আচ্ছা, তুমি এবার কাপড়চোপড় নিয়ে চলে যাও। জোরের সঙ্গে উত্তর দিলাম, আমি এখান থেকে যাব না, পুলিশই আসুক আর যেই আসুক—আমি এখানে থাকতে এসেচি। আর কোন কথা না বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তিনদিন একভাবে কাটিয়া গেল। চতুর্থ দিন সকালে বাবুরাম মহারাজ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওহে, তুমি ঠাকুর-ভাঁড়ারে কাজ করতে পারবে?

"ঠাকুর-ভাঁড়ারে কাজ করি। কাহারও সঙ্গে বেশী কথা হয় না। বাবুরাম মহারাজকে ভালই লাগিত, কিন্তু কিছুদিন পরে, লাগিত না। কেবল নীরদ মহারাজ ডাকিয়া কাছে নিতেন আর মহারাজের কথা শুনাইতেন। শুনিয়া ভাল লাগিত। বলিতেন, মহারাজ হচ্চেন ঈশ্বর। যোগী মহারাজ (কৈবল্যানন্দ) মাঝে মাঝে মায়ের কথা শুনাইতেন, বলিতেন, মা হচ্চেন ঈশ্বরী। শুনিয়া ধাঁধায় পড়িতাম। ঈশ্বর আর ঈশ্বরী একই বস্তু, শোনা ছিল, কিন্তু অনেক

ঈশ্বর কী করিয়া হয় বুঝিতে পারিতাম না। ঠিক করিলাম এখানে থাকিব না।

"ঠাকুরের তিথিপূজায় শ্রীশ্রীমা মঠে আসিয়াছেন, কিন্তু কেহই আমাকে তাঁহার কথা বলে নাই। সন্ধ্যার সময় যখন তিনি গাড়ীতে করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহার কথা জানিতে পারিয়া আমি দূর হইতে মা মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে গাড়ীর পেছনে ছুটিলাম। কাছে যাইতেই মা বলিলেন, এস বাবা। তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলে মা তাঁহার হাত আমার মাথায় রাখিলেন। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন উদ্বোধনে মায়ের কাছে আমার মন্ত্রদীক্ষা হইল। কিন্তু মঠে থাকা সম্বন্ধে মনের ভাব পরিবর্তিত হইল না।

"দশমাস মঠে আছি। মহারাজকে লইয়া আসিবার জন্য বাবুরাম মহারাজ কাশীতে গেলেন। যাওয়ার আগে নূতন ছেলেদের বলিলেন, তোরা তো আমাকে ভালবাসিস, মহারাজকে দেখলে আর আমাকে তোদের ভাল লাগবে না। তাহারা বলিল, সে কী মহারাজ? তিনি কহিলেন, হ্যাঁরে, সত্যি সত্যিই বলচি। ঠাকুরের মানসপুত্র তিনি, ঠাকুর তাঁর এই বালগোপালের ভিতর দিয়েই এখন কাজ করচেন। ভাবিলাম, মহারাজকে দেখিয়াই চলিয়া যাইব।

"মহারাজ আসিয়াছেন, তাঁহাব শরীর সুস্থ নয় বলিয়া বেলা দশটায় তাঁহাকে পথ্য দেওয়া হইয়াছে। গঙ্গার দিকের বারান্দায় বসিয়া তিনি তামাক খাইতেছিলেন, দেখিয়া আমার বড় ভাল লাগিল; তাঁহার সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়া একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মহারাজ মাঝে মাঝে দেখিতেছেন আর মৃদু হাসিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কতদিন এসেচ? বলিলাম, দশমাস। আমাকে তাঁহার কাছে যাইতে ইশারা করিলেন, এবং যাইতেই আমার একখানা হাত তাঁহার হাতের উপর রাখিয়া তৌল করিলেন। তুমি কখনো সাধু হয়েছিলে?—তিনি প্রশ্ন করিলেন। বলিলাম, না, আগে শুধু নাগা সাধু দেখেছিলাম, মঠে আসার আগে বাবু সাধু দেখি নাই। তিনি বলিলেন, দেখ না চোখ বুঁজে একটু চিন্তা করে, চোখ বোঁজ। শুনিয়াছিলাম

মহারাজ বালকস্বভাব। তাঁহার কথায় চক্ষু বুঁজিলাম না। না দেখিয়াই তাঁহাকে ভাল লাগিয়াছিল। সেই ভাল লাগা বাড়িয়াই চলিল, মঠ হইতে চলিয়া যাওয়ার ইচ্ছা আর রহিল না।

"একদিন মহারাজের ঘরে সমবেত ভজনে যোগ দিয়া ও মহারাজকে প্রণাম করিয়া আসিয়া পূজার জোগাড় করিতেছি এমন সময় হঠাৎ বাবুরাম মহারাজ আসিয়া বলিলেন, চল্ বেটা, তোকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাই। একরকম টানাহেঁচড়া করিয়াই তিনি আমাকে দোতলায় মহারাজের ঘরে লইয়া গেলেন ও বলিলেন, নে, মহারাজকে পেন্নাম কর্। মহারাজ তখন নিজের খাটে বসিয়াছিলেন, বাবুরাম মহারাজ বলিতে লাগিলেন, মহারাজ, এই বেটা বড্ড রাগী, আমার সঙ্গে ঝগড়া করে, ছেলেদের সঙ্গে মারামারি করে। তুমি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দাও যাতে ওর মাথা ঠাণ্ডা থাকে। মহারাজ নিজের হাত এপিট ওপিট করিয়া দেখিয়া বলিলেন, আজ আমার হাতটা ঠিক নাই, আজ হবে না, বরং তুমিই একটু দেখ। বাবুরাম মহারাজ তখন ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিয়া আমাকে মহারাজের পায়ের উপর ফেলিয়া দিলেন। দিতেই মহারাজ স্থির হইয়া গেলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহার কোমল করপদ্ম আমার মাথায় বুলাইয়া দিলেন। 'ওদের কী দোষ মহারাজ, আমিই বকে বকে ওদের মাথা গরম করে দি। বয়স হয়েচে, মঠের সব কাজকর্ম দেখতে হয়, আমারও মাথার ঠিক থাকে না। তুমি আমারও মাথায় হাত বুলিয়ে দাও।' এই বলিয়াই মহারাজের কোলের উপর নিজের মাথা রাখিলেন, আর মহারাজও নির্বিকারভাবে হাত বুলাইয়া দিলেন। চারিপাঁচ জন সাধু ব্রহ্মচারী তখনো মহারাজের ঘরে ছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই মাথায় হাত বুলানো হইল। বাবুরাম মহারাজ তখন নিজের ঘরের জানালা হইতে চীৎকার করিয়া সকলকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, ওরে, মহারাজ আজ কল্পতরু হয়েচেন, তোরা সবাই আয়, আয়। সেই ডাক শুনিয়া যে যেখানে ছিল, মান্ন সোনা ও কেনা উড়িয়া চাকর দুইটি, সকলেই আসিয়া মহারাজের মৌন আশীর্বাদ লাভ করিল। কোন্নগরের বিপিন ডাক্তার, টেরা ও খোঁড়া, পায়খানা হইতে আসিয়া

হাতে মাটি দিতেছিল; সে আসিতে বিলম্ব করিতেছে দেখিয়া বাবুরাম মহারাজ সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেলেন ও একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে উপরে লইয়া আসিলেন। মহারাজ তখন আসন হইতে উঠিয়া পড়িয়াছেন, ডাক্তার আসিতেই বলিলেন, 'যো আয়া থা সো চলা গিয়া!'

"রবিবার, ঠাকুরের জন্মমহোৎসব। কালীকীর্তনের আসর বসিবে, মঠের অঙ্গন লোকে পরিপূর্ণ। ঠাকুরের পূজা হইয়া গিয়াছে, বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরঘর হইতে নামিয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, এখানে (যে ঘরটিতে নিত্যকার খাওয়াদাওয়া হয়) যেন কেউ না খেতে বসে। ঠাকুরঘরের ভিতর অনেক সময় মেয়েরা ঢুকে পড়ে সেদিকেও নজর রাখবি কেউ না সেখানে বসে খায়।...

"ঠাকুর-ভাঁড়ারের সামনে একটা টুলে বসিয়া আছি, সুধাংশু দত্ত, তখন বালক, আসিয়া বলিল, ঈশ্বর মহারাজ, শীগগির চলুন উপরে, ঠাকুরঘরে বসে কয়েকটি মেয়ে প্রসাদ খাচ্চে। তাড়াতাড়ি উপরে গিয়া মেয়েদিগকে বলিলাম, আপনারা কেন ঠাকুরঘরে ঢুকেচেন আর ঠাকুরঘরে বসে খাচ্চেন? আমার রাগতভাব দেখিয়া সেই দলের একটি কমবয়সের বিধবা মেয়ে উত্তেজিত হইয়া বলিল, আমরা এখানে বসে খাচ্চি বেশ করচি, তুমি বলবার কে? আমারও তখন কম বয়স, রাগিয়া বলিলাম, তোমরা ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। জান আমরা কে?—মেয়েটি কহিল। ঢের জানি, আমি উত্তর দিলাম। সত্যকথা বলিতে কি, তাহাদিগকে আমার ভদ্রঘরের মেয়ে বলিয়াই মনে হয় নাই।[১] আমার রূঢ় ব্যবহারে তাহারা অবশিষ্ট খাবার ফেলিয়া রাখিয়া, তোমাকে দেখ

১ রামলাল চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা কৃষ্ণময়ী দেবী লেখককে বলিয়াছেন, রমণী নামে একটি মেয়ে সেই দলে ছিল। মেয়েটি কুলাঙ্গনা নহে। জগন্মাতা একদিন ঠাকুরকে রমণীর রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছিলেন, সেইজন্য যাঁহারা একথা জানিতেন তাঁহারা রমণীকে কিছুটা সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু রমণী আগেকার মতই সাজগোজ করিত, তাহার দুই কানে ছিল দুই প্রকাণ্ড মাকড়ি।

নেব, ইত্যাদি কথা উত্তেজিতভাবে বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। আমি ঠাকুরঘর পরিষ্কার করিয়া নীচে আসিয়া ঠাকুর-ভাঁড়ারের কাজ করিতে লাগিলাম।

"কালীকীর্তন চলিয়াছে, উৎসব খুব জমিয়া গিয়াছে। এই ঘটনার পরে দুইএক ঘন্টা কাটিয়া গিয়াছে। হঠাৎ ভূমানন্দ আসিয়া বলিলেন, চল, মহারাজ তোমাকে ডাকচেন। আমি বলিলাম, কাজটা সেরে আসি। ভূমানন্দ আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, এক্ষুনি চল, কী করেচ জান তুমি? আমাকে নীচেকার দক্ষিণপশ্চিম কোণের ঘরটিতে ঢুকাইয়া দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কয়েকজন ঠাকুরের সন্তান ও রামলাল চট্টোপাধ্যায় সেই ঘরে বসিয়া আছেন, হিমালয়ের গাম্ভীর্যে ভরা একটি গুহার ভিতর ঢুকিয়াছি বলিয়া মনে হইল। ক্রুদ্ধস্বরে শরৎ মহারাজ বলিলেন, তুমি কী করেচ, আমাদের মাথা কাটা গেছে। মহাপুরুষ প্রভৃতি সকলেই সেই কথায় সায় দিলেন। মহারাজ অতি বেদনার সঙ্গে ধীরে ধীরে বলিলেন, ইষ্টবংশের অপমান করেচ। রামলাল কাঁদকাঁদ হইয়া বলিলেন, আমার মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল মহারাজ, আমি বুঝিয়েও তাদের রাখতে পারলুম না। এতক্ষণে আমার অপরাধ সম্বন্ধে ধারণা জন্মিল। শরৎ মহারাজ বলিলেন, তোমাকে এক্ষুনি মঠ থেকে চলে যেতে হবে। মহাপুরুষ কহিলেন, হ্যাঁ, এক্ষুনি যেতে হবে, তুমি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেচ। মহারাজ উঠিয়া পড়িলেন ও বলিলেন, তোমাকে এক্ষুনি দক্ষিণেশ্বরে যেতে হবে ওঁদের কাছে ক্ষমা চাইতে; ওঁরা যদি ক্ষমা করেন তা হলে ফিরে আসবে, তা না হলে ওখান থেকে চলে যাবে। এস আমার সঙ্গে।

"মহারাজ আমাকে দোতলায় তাঁহার নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। অমূল্য মহারাজকে ডাকিয়া কহিলেন, এক কাজ কর তো, সমস্ত প্রসাদ চেঙারিতে করে সাজিয়ে নৌকায় তুলে দাও, ঈশ্বর নিয়ে যাবে। আমাকে বলিলেন: এই প্রসাদ নিয়ে গিয়ে লক্ষ্মীদির[২] হাতে দেবে, আর তাঁকে তোমার অপরাধের কথা বলবে; এই টাকা পাঁচটি দিয়ে তাঁকে প্রণাম করবে; যে মেয়েটিকে বকেচ তার কাছে ক্ষমা চাইবে, সে যদি ক্ষমা করে তবে সেই মর্মে তাঁদের চিঠি নিয়ে

২ ঠাকুরের ভাইঝি লক্ষ্মীদেবী।

আসবে, আর এই প্রসাদ তাঁদের পরিবেষণ করে খাওয়াবে। আগামী বৃহস্পতিবার এখানে এসে ওঁরা সবাই প্রসাদ পাবেন, এই কথাও বলে আসবে।

"রামলালও আমার সঙ্গে চলিলেন। তাঁহার রাগ তখনো পড়ে নাই, যাইতে যাইতে তিনি বলিতে লাগিলেন, আমার মেয়ে কিছুতেই তোমাকে ক্ষমা করবে না, মঠ ছেড়ে তোমাকে যেতেই হবে। দুঃখ ও গ্লানিতে মনটি পরিপূর্ণ, অপরাধের সীমা নাই যেন। যদি ক্ষমা না পাই, দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাতেই দেহ বিসর্জন করিব মনে এরূপ সঙ্কল্পেরও উদয় হইতে লাগিল।

"'এস বাবা!' বলিয়া লক্ষ্মীদেবী সাদরে গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সকল কথা নিবেদন করিলাম। আমাকে দেখিয়াই সেই মেয়েটি সরিয়া গেল। আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না। লক্ষ্মী-দেবী তাহাকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন, তোরা নিজেদের পরিচয় দিয়েছিলি? ও তো ছেলেমানুষ, তোদের জানবে কী করে? তুইও তো রেগেমেগে অনেক কথা বলেছিলি। লক্ষ্মীদেবী তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া লইয়া আসিলেন। আমি প্রণাম করিয়া পুনরায় ক্ষমা চাহিলাম, চক্ষু দিয়া তখন আমার জল ঝরিতেছে। লক্ষ্মীদেবী কহিলেন, দেখ্‌ দিকিনি, ছেলেটি কাঁদচে, তোর একটুও দয়ামায়া নেই? তখন সে বলিল, আমি ক্ষমা করেচি।

"আমি তখন পাতায় প্রসাদ পরিবেষণ করিয়া সকলের খাওয়ার ব্যবস্থা করিলাম। লক্ষ্মীদেবী অপর একখানি পাতায় সকল রকমের প্রসাদ রাখিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন, এবং ছোট ছেলেকে যেমন করিয়া খাওয়ায় সেইভাবে আমাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে বলিলেন, বাবা, এই হাতে আমি ঠাকুরকে খাইয়েচি, তোমাকেও খাওয়াচ্চি। তাঁহাকে খাইতে অনুরোধ করিলে কহিলেন, হাতটা ধুয়ে আসি; আমরা তোমাদের ইষ্টবংশ কিনা, তা না হলে তোমার এঁটো মানতুম না।

"সেইদিন তিনি আমাকে যাইতে দিলেন না, নিজের কাছে রাখিলেন এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঠাকুরের কথা শুনাইলেন। আনন্দে সময় কাটিল। পরদিন সকালবেলা মহারাজের নামে পত্র লিখিয়া তিনি আমার হাতে

দিলেন। বৃহস্পতিবার যখন তাঁহারা সকলে প্রসাদ পাইতে মঠে আসিলেন, মহারাজ আমাকে সঙ্গে নিয়া ঠাকুরঘরে গেলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিবার পর কহিলেন, লক্ষ্মীদি, একে ক্ষমা করেচ তো? এ বড় বোকা, কিছু বোঝে না। লক্ষ্মীদেবী কহিলেন, হ্যাঁ, আমি ক্ষমা করেচি, আর এ তো এমন কিছু করে নি। তাঁহাকে প্রণাম করিতে মহারাজ আমাকে বলিলেন। বিকালবেলা যখন তাঁহাবা চলিয়া যাইবেন মহারাজ পুনরায় আমাকে সঙ্গে নিয়া নৌকাব কাছে গেলেন। লক্ষ্মীদেবী সিঁড়িতে দাঁড়াইয়াছিলেন, মহারাজ তাঁহাব পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, লক্ষ্মাদি, একে একটু আশীর্বাদ কব। লক্ষ্মীদেবী আমার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, তোমার খুব ভক্তি হোক।

"মাঝে মাঝে,আমার ম্যালেরিয়া জ্বর হইতেছিল। বাবুরাম মহাবাজের ধারণা, মঠে থাকিয়াও যাহারা অসুখে বেশী ভুগে তাহারা ঠাকুরসেবাব অনুপযুক্ত। তাহাদিগকে তিনি মঠে রাখিতে চাহিতেন না। সবে অন্নপথ্য কবিয়াছি, শরীর অতি দুর্বল, বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, তোমার মঠে থাকা চলবে না, আজই চলে যাও। কোন প্রতিবাদ না করিয়া আমিও চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলাম। গেট পর্যন্ত গিয়াছি এমন সময় শচীন আসিয়া কহিলেন, বাবুরাম মহারাজ তোমায় যেতে বলেচেন, যাও, কিন্তু মঠে মহারাজ আছেন—অধ্যক্ষ, তাঁকে তোমার একবার বলে যাওয়া কর্তব্য। তিনি আমাকে জাপটাইয়া ধরিয়া মঠের ভিতর লইয়া গেলেন ও নীচের তলায় যে ঘরটিতে তখন মহারাজ বসিয়াছিলেন সেই ঘরে ঢুকাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িলেন। প্রণাম করিতেই মহারাজ বলিলেন, কেমন আছিস? আমাকে এক ছিলিম তামাক খাওয়াতে পারিস? তামাক আনিয়া দিতেই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোকে এত রোগা দেখাচ্চে কেন? আমি বলিলাম, অনেকদিন থেকে ম্যালেরিয়ায় ভুগচি, বাবুরাম মহারাজ আজই মঠ থেকে চলে যেতে বলেচেন। মহারাজ তখনই অমূল্য মহারাজকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি আজই লিখে দাও, আমাদের একজন ব্রহ্মচারী কোঠারে যাচ্চে তার ব্যবস্থা

করতে। আর আমাকে বলিলেন, তোকে এক্ষুনি কোথাও যেতে হবে না, এখানেই থাক। মহারাজের আশীর্বাদে সেইদিন হইতে আমার জ্বর বন্ধ হইল, দুর্বলতা ক্রমশঃ সারিয়া গেল, কোঠারেও যাওয়া হইল না।

"পুরুলিয়ায় ভাইয়ের উপনয়ন হইবে, বাবা অসুস্থ। আমাকে লইয়া যাইবার জন্য কাকা ও আর একজন আসিয়াছিলেন। আমার ইচ্ছা নয় যে যাই, কিন্তু বাবুরাম মহারাজ আমাকে যাইবার জন্য ক্রমাগত তাড়া দিতে লাগিলেন, আমাকে পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া কাকাদের তিনি কথা দিয়াছিলেন। একদিন যখন তিনি ঐরূপ তাডা দিতেছেন, আব আমিও যাইব না বলিতেছি, সেই সময় মহারাজ উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, উনি আমাকে ভাইয়ের পৈতায় পুরুলিয়া যেতে বলচেন, আমার মঠ ছেড়ে যাবার ইচ্ছা নাই…। মহারাজ কহিলেন, ঠিক বলেচিস, সাধুর আবার বাবা ঠাকুমা কিরে? আমরাই তোর বাবা ঠাকুমা। খানিক থামিয়া আবার কহিলেন, আচ্ছা, তোর ভাইয়ের যখন পৈতে, বাবা ডেকে পাঠিয়েচে, তখন একবার ঘুরে আয়। আর পৈতের অন্ন খাবি না, তোর মাকে দিয়ে হবিষ্য রান্না করিয়ে খাবি। পুরুলিয়া যাচ্চিস, আমার জন্যে কী নিয়ে আসবি? সেখানে ভাল কী পাওয়া যায় জানিতাম না। নিজেই বলিলেন, শুনেচি সেখানে ভাল লাঠি পাওয়া যায়, তাই নিয়ে আসবি। পুরুলিয়া হইতে ফিরিবার সময় আমি লাঠি ও মায়ের হাতের তৈরি ক্ষীরের মালপোয়া আনিয়াছিলাম। মালপোয়া তিনি আনন্দ করিয়া খাইয়াছিলেন।

"অতঃপর আমি ও বিরূপাক্ষ (বিদেহানন্দ) বাঙ্গালোর মঠের কাজের জন্য দক্ষিণ ভারতে প্রেরিত হইলাম। মহারাজও মাদ্রাজ হইয়া বাঙ্গালোরে আসিলেন (আগষ্ট, ১৯১৬)। কলিকাতা হইতে আসিবার সময় তিনি ভূমানন্দ ও গোপালানন্দকে অতিরিক্ত সেবকরূপে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। কখন কখন আমাকেও ছোটখাট কাজের জন্য ডাকিয়া পাঠাইতেন, আর তাঁহার পুরাতন সেবক বি—কে বাগানের মাটি কোপানো ইত্যাদি বাহিরের কাজ করিতে বলিতেন। বি— বুঝিয়াছিলেন মহারাজ তাঁহাকে সরাইয়া দিবার

ব্যবস্থা করিয়াই আসিয়াছেন। একদিন বি— আমাকে কহিলেন, তোমাকে একটা কথা বলি, মনে রেখো ঃ বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণে দেয় চাঁদ।[৩]

"বাঙ্গালোরে থাকিতে মহারাজের সঙ্গে একদিন আমার নিম্নোক্তরূপ কথাবার্তা হয় ঃ 'তোর কার সঙ্গে ভাব বেশী ?' 'আমার কারো সঙ্গে ভাব নাই, কারো সঙ্গে মিলে না।' 'কেন, বিরূপাক্ষের সঙ্গে তোর মিলে না ? তাকে ভালবাসিস না ?' 'না মহারাজ, ওর সঙ্গে আমার মিলে না, আমি কাকেও ভালবাসি না।' 'বেশ, ভালই করেচিস, ভালবাসলে কষ্ট পেতে হয়।

৩ বাঙ্গালোর হইতে মাদ্রাজ গিয়া মহারাজ বি—কে তাঁহার সেবার কোন কাজই করিতে দিতেন না। তাঁহার আদেশে বি— তপস্যার্থে কাঞ্চী চলিয়া যান। মহারাজ যখন তৃতীয়বার দাক্ষিণাত্যে আসেন তখন মহাপুরুষকে বলিয়াছিলেন ঃ বি— আমাকে মায়ের মত সেবাযত্ন করেচে ; তবে কি জানেন, আমাকে সর্বদা আগলে রাখতে চাইত আর কেউ না আমার কাছে আসে ; অথচ পরোক্ষে আমার কাজগুলি অপরকে দিয়ে করিয়ে নিত। সে অনেক কষ্ট করেচে, এবার তাকে নিয়ে আসব। বি— মহারাজের কাছে আর ততটা ভিড়েন নাই, যদিও মহারাজের স্নেহের কমতি ছিল না।

ইতঃপূর্বে মহারাজ যখন মঠে থাকিতেন তখন দিনের বেলা বি— ও রাত্রে খুদুমণি তাঁহার সেবার কাজ করিতেন। খুদুমণি বলিয়াছেন ঃ এক রাত্রে মহারাজকে পরিবার কাপড় দিতে গিয়া মুশকিলে পড়িলাম। আলনা হইতে যত কাপড় তুলি, কেবল ছেঁড়া বাহির হয়। শেষে অনেক নীচে ভাল কাপড় পাওয়া গেল। মহারাজ কহিলেন, সে সব ওলট পালট করে, ওরা চায় নিজের মতলব মত আমাকে চালাবে।

মহারাজ যখন কাশীতে ছিলেন (১৯১৩।১৪), হৃষীকেশ (প্রশান্তানন্দ) অনেক সময় তাঁহার কাছে থাকিতেন, বি—র তাহা সহ্য হইত না। হৃষীকেশকে দিয়া বি— তামাক সাজাইয়া নিতেন, কিন্তু নিজে গিয়া মহারাজকে দিয়া আসিতেন। একদিন সন্ধ্যার পর খাবার তৈরি করিতে বলিয়া বি—কে মহারাজ সরাইয়া দিলেন ও হৃষীকেশকে গা টিপিয়া দিতে বলিলেন। হৃষীকেশ নীচে দাঁড়াইয়া টিপিতেছিলেন, মহারাজ বলিলেন, উপরে উঠে আয়। তিনি ইতস্ততঃ করিতে থাকিলে মহারাজ তাঁহার হাত ধরিয়া খাটের উপর তুলিয়া নিলেন ও নিজের বিছানায় শোয়াইয়া ছোট ছেলেটির মত আদর করিলেন। মহারাজের বিছানায় বসিতে দেখিয়া হৃষীকেশকে বি— পরে ভর্ৎসনা করেন।

এই দেখ্ না, অমূল্যটাকে এত ভালবাসি, সে আমাকে এখানে ফেলে মাইসোর চলে গেল। বলেছিল একদিন পরে আসবে, তার জায়গায় দুদিন তিনদিন হয়ে গেছে, আমার কত ভাবনা হচ্ছে বল্ দেখি।'[৪]

"মহারাজ বাঙ্গালোরে থাকিতেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে মাদ্রাজ মঠে চলিয়া যাইতে হইল। বাঙ্গালোর মঠের অধ্যক্ষ আমাকে পছন্দ করিতেন না। মহারাজের সঙ্গে কন্যাকুমারী দর্শন করিতে যাওয়ার একান্ত ইচ্ছাটি পূর্ণ হইল না। তিনি বলিলেন, আচ্ছা তুই মাদ্রাজ যা, সেখান থেকে আর আর জায়গায় তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তিনি কথা রক্ষা করিয়াছিলেন। ত্রিচিনাপলী, কাঞ্চী ও তিরুপতি যাইবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়াছিলেন।

"বাঙ্গালোর হইতে মাদ্রাজ মঠে আসিয়াই মহারাজ তাঁহার ছোটখাট সেবার কাজে আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমার তখন অনেক কাজ। ঠাকুরঘরের সকল কাজ সারিতেই অনেক বেলা হইয়া পড়িত, মাদ্রাজ মঠে ঠাকুরসেবার বহু খুঁটিনাটি ছিল। মহারাজ ঘন ঘন ডাকেন তামাক কিংবা জল দিবার জন্য, খাইবার সময় কাছে থাকিবার জন্য, গা হাত একটু টিপিয়া দিবার জন্য। তাঁহার আহারের সময় কাছে থাকিয়া ও তাঁহাকে তামাক দিয়া খাইতে যাইতে বিলম্ব হইতে লাগিল। মহারাজের কাছে মঠাধ্যক্ষ নালিশ করিলেন—ঈশ্বর কাজের বড গাফিলতি করে, একটার সময় খাবার ঘণ্টা পড়িলে খাইতে যায় না, বামুনঠাকুরের কষ্ট হয়। মহারাজ সেকথা শুনিলেন মাত্র, কোন উত্তর করিলেন না, এবং এমনভাবে কাজের ফরমাশ বাড়াইতে

---

৪ ভালবাসা সম্বন্ধে মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন, ভালবাসা হয় একজনের সঙ্গে। তিনি 'এক' শব্দের উপর জোর দিয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন। আর একদিন বলিয়াছিলেন, যাকে ভালবাসব সে যদি জানতেই পারল সে ভালবাসাই নয়।

'মহারাজের ভালবাসা ভোলবার নয়।' এই কথাটি কেহ বলিয়াছেন শুনিয়া মহারাজ আরক্তগম্ভীরমুখে বলিয়াছিলেন, কুঞ্জলাল, ভালবাসতে পারলুম কই? ভালবাসতে কি জানি? ভালবাসতে কি শিখেছি?

লাগিলেন, বা আহারে এত বিলম্ব করিতে লাগিলেন যে, আমার খাওয়াদাওয়া সারিতে তিনটা বাজিতে লাগিল।

"মহারাজ যখন যেখানে থাকিতেন, তাঁহার যাবতীয় বিধিব্যবস্থার ভার একজনের উপর থাকিত ; তিনি সেই সেবকের সকল কথাতেই সায় দিতেন। এমনকি, দেখা গিয়াছে, অপরের কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উক্ত সেবক অভিযোগ করিলে মহারাজ সেই ব্যবস্থা নাকচ করিয়া দিয়াছেন। সেবকের মাতব্বরিতা তাহাতে বাড়িয়া যাইতে থাকে।[৫] মঠাধ্যক্ষ আমার কাজে গাফিলতির কথা তাঁহার কানে দিলেন। তিনি পূর্ব হইতেই আমার উপর মহারাজের পক্ষপাতিতা সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না, এখন মঠাধ্যক্ষের কথায় চরম প্রতিকারে সচেষ্ট হইলেন। আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কাল থেকে ঘণ্টা পড়িলেই সকলের সঙ্গে খেতে বসবে। আমি বলিলাম, মহারাজ আমাকে খাবার সময় উপস্থিত থাকতে বলেন, তাতেই দেরী হয়ে যায়। 'মহারাজের খাবার সময় তো আমিই থাকি, যা দরকার আমি করব।'

"আমি তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিব স্থির করিলাম, কিন্তু ইহার পরদিনও আহারের সময় মহারাজ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, আর এত বেশী ফাইফরমাশ করিতে লাগিলেন যে, বহু বিলম্ব হইয়া গেল। মহারাজ তখন ভাড়াটে বাড়ীর দোতলায় থাকিতেন ও সেখানেই আহার করিতেন। তাঁহার সেবার কাজ সম্পূর্ণ করিয়া যখন নীচে নামিতেছি, দেখি সেবকটি সিঁড়ি আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন, তোমাকে না কাল বলেছিলুম ঘণ্টা পড়লেই খেতে যাবে, আমার কথা শোনা হল না কেন ? বেলা অনেক হইয়াছে, স্নানাদি হয় নাই, ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে, সেই অবস্থায়

[৫] শ্রীশ্রীমা ও মহারাজের সেবকদের কাহারো কাহারো আত্মাভিমান অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতে ও উহার পরিণামে তাঁহাদিগকে দুঃখ পাইতে দেখা গিয়াছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাছে থেকে যে মহাশক্তির স্পর্শ পায় সেটা হজম করতে পারে না, তার এবিউজ (অপব্যবহার) করে বসে। হরি মহারাজ বলিতেন, সিদ্ধপুরুষ না হলে ঠিকঠিক সেবা করতেও পারে না, নিতেও পারে না।

তাঁহার কথা শুনিয়া মনঃকষ্ট হইল, আর ধমকানোর ভাব দেখিয়া মাথাও চড়িয়া গেল। এইরূপ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে যেসব উক্তি প্রত্যুক্তি হইল তাহা বলিতে ইচ্ছা করে না, তাহা সুশ্রাব্য নহে। মহারাজ উপরে থাকিয়া সমস্তই শুনিলেন।

"পরের দিনও আহারের সময় মহারাজ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার কাছে বসিয়া, ভয় ও বিরক্তির সঙ্গে, পাখা লইয়া হাওয়া করিতে লাগিলাম। চিঠিপত্র নিয়া সেই সেবকও আসিয়া বসিলেন এবং এক একখানা করিয়া পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। পত্রপাঠের ফাঁকে ফাঁকে মহারাজ কিছু না কিছু মন্তব্য করিতেন, সেদিন কথাটি কহিলেন না। ভাতের সঙ্গে তিনি দুইতিনখানা রুটি খাইতেন, সেদিন আর একখানা রুটি দিয়া যাইবার জন্য নিজেই উড়িয়া বামুন বর্জুকে ডাকিলেন। তিনি পুনঃপুনঃ ডাকিতে থাকিলে বর্জু ছুটিয়া আসিয়া বলিল, সেঁকে এনে দিচ্চি। সেবক বর্জুকে ধমক দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ বলিলেন, তুমি আমার খাবারের উপরেও হাত দেবে—তোমার ইচ্ছামত আমাকে খেতে হবে? তোমাকে অনেক সহ্য করেচি, আর না। তুমি আমাকে হাতের পুতুল করে রাখতে চেয়েচ। মহারাজ অতঃপর সেবকটি পূর্বাপর তাঁহার সঙ্গে ও অপরের সঙ্গে যেদিন যেমন ব্যবহার করিয়াছেন, কিংবা যাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিয়াছেন বা কাজ করিয়াছেন—কী আশ্চর্য স্মরণশক্তি!—একে একে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। শেষে কহিলেন, আজ থেকে আমার কোন কাজের ভিতর তুমি থাকবে না।...তোমাব সকল কথায় সায় দিয়ে দিয়ে দেখছিলাম তুমি কতদূর বাড়তে পার। মহারাজ আর বকিলেন না, তাঁহার অনুনয় বিনয় কান্নাকাটিতেও বিচলিত হইলেন না। শর্বানন্দও অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন, কোনই ফল হইল না।[৬]

---

৬ এই ঘটনার পরে মহারাজের অভিপ্রেত বহু কাজ করিয়া থাকিলেও, উক্ত সেবক শেষের কয়েক বৎসর নিকট সম্পর্কে শ্রীগুরুর সেবা করিতে পান নাই। কাল পূর্ণ হইলে, লীলাসম্বরণের পূর্বে, মহারাজ তাঁহাকে কাছে ডাকিয়া স্নেহমাখা কথায় আপ্যায়িত করেন

"মাদ্রাজ হইতে পুরীধামে যাওয়ার আয়োজন চলিতেছে, এই সময় মহারাজের সঙ্গে আমার নিম্নোক্তরূপ কথাবার্তা হয়ঃ 'তুই আমার সঙ্গে থাকবি তো ?' 'মহারাজ, আপনার সেবা করতে আমার বড় ভয় হয়।' 'কেন, ভয় কিসের ?' 'এই তো দেখলাম, বি—কে আপনি কত ভালবাসতেন, কত সেবা করতেন তিনি আপনার, তাঁকে তাড়িয়ে দিলেন। আরেকজনকেও কাজ থেকে সরালেন। আপনি বি—কে যা বকতেন তা শুনে আমার আতঙ্ক হত।' মহারাজ স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—পাশে গোকুলানন্দ দাঁড়াইয়াছিলেন—'আমি কি খুব বকি ? ওদের আমার কাছ থেকে একটু দূরে যাওয়া যে দরকার হয়েছিল। আমি কি ওদের ভালবাসি না ? ওরা আমার ভালবাসার সুযোগ নিয়ে আমাকে মায়ায় জড়িয়ে ফেলছিল। কেউ আমার কাছে আসে বা আমার কাজ করে, বি— তা সহ্য করতে পারত না। ওদের ভালর জন্যেই আমার কাছ থেকে সরে যাওয়া দরকার হয়েছিল।' 'মহারাজ, আমি অত বকুনি সহ্য করতে পারব না, আর আপনি আমাকে তাড়াতেও পারবেন না।' '( স্নেহপূর্ণস্বরে ) আমি তোকে তাড়াব না, বকবও না।'

"কলিকাতার ঘটনা। বশীদের বাসায় রাত্রে আমার খাওয়ার কথা, আমার বিলম্ব দেখিয়া ডাকিতে আসিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, মহারাজের পরিচর্যা শেষ করিয়া, যখন তিনি শুইতে যাইবেন তখন চুপিসারে চলিয়া যাইব। তাহা আর হইল না। বশীকে দেখিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, সীজন ফ্লাওয়ার ( মরসুমী ফুল ), অসময়ে কেন ? বশী কহিল, ঈশ্বর আমাদের ওখানে খাবে, তাকে নিতে এসেচি। 'একা ঈশ্বরই খাবে ? কী খাওয়াবি ?' 'একটু মাংস করেচি।' 'মাংস ?' মহারাজ গম্ভীর হইয়া গেলেন ও বলিলেন,

---

এবং তাঁহার সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহার দীর্ঘদিনের মনোবেদনা প্রশমিত করেন। অন্তিমশয্যায় শেষের কয়েকদিন এই সেবকের হাতেই তিনি পথ্য গ্রহণ করিতেন, অপর কাহারও হাতে খাইতে চাহিতেন না। "যে যার সে তার।" আর এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মহাকবি ভবভূতির অমরলেখনীপ্রসূত এই বাক্যটিঃ বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি।

ঈশ্বরের মাংস খাওয়া ভাল নয়; ও বড্ড রাগী, রাগটাগের পক্ষে মাংস ভাল নয়; ও খেতে যাবে না। জ্ঞান বশী, ঈশ্বরের খুব শুভ সংস্কার, শুধু চাপা পড়ে আছে। ও যদি দিনকতক হরিদ্বারের দিকে থেকে মাধুকরীর অন্ন খেয়ে তপস্যা করে, খুলে যাবে। পাশের ঘরে থাকিয়া সবই শুনিতে পাইতেছিলাম, বশীদের বাড়ীতে গেলাম না। অভিমান হইল, মহারাজের কাছেও গেলাম না। বড় হলঘরে অনেকগুলি লোক তপসে মাছের মত সারিবন্দী হইয়া মশারি ফেলিয়া ঘুমাইতেছি—আমি হলের পূর্বদিকে, সকলের শেষে। রাত্রি আন্দাজ দেড়টার সময় মহারাজ মশারির দড়িগুলির তলা দিয়া একেবারে আমার কাছে গিয়া আস্তে আস্তে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, ঈশ্বর, ঈশ্বর, আমাকে এক ছিলিম তামাক খাওয়াবি? অভিমান ভাসিয়া গেল, আনন্দে মন ভরিয়া উঠিল, তাঁহাকে তামাক দিতে গেলাম।

"মাদ্রাজে থাকিতে মহারাজ আমাকে কয়েকটি স্তব নিত্যপাঠ করিতে বলিয়াছিলেন, বছর দেড়েক পাঠের পর আর পাঠ করিতে ইচ্ছা হইত না। একদিন সকালবেলা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যে তোকে স্তবপাঠ করতে বলেছিলুম তা করিস? আমি উত্তর দিলাম, না। 'কেন করিস না?' 'ভাল লাগে না।' 'আমি যা বলব তা যদি না করবি, আমার কথা না শুনবি, তা হলে এখানে আছিস কেন?' 'আপনি আমাকে ভালবাসেন, আপনাকে আমার ভাল লাগে, তাই আপনার কাছে আছি। যেদিন বুঝব আপনি ভালবাসেন না সেদিন চলে যাব।' এই কথার পরেই মহারাজ তাঁহার শিষ্য শ্যামসুন্দরের মোটরগাড়ীতে দক্ষিণেশ্বর চলিয়া গেলেন। সঙ্গে নিলেন বাসুদেবানন্দকে স্তবপাঠ করিবার জন্য। তিনি ভবতারিণীর মন্দিরে বসিয়া স্তবপাঠ শুনিতেন। আমার খুব অভিমান হইল, আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এক শিষ্যের বাড়ীতে চলিয়া গেলাম। সেখান হইতে ফিরিবার পথে রামকান্ত বসু স্ট্রীটে ঢুকিবার মুখেই দেখি, পেছনে মহারাজের গাড়ী। চলন্ত গাড়ীতে থাকিয়াই তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, কোথায় গেছিলে?

"বাড়ীতে আসিয়াই মহারাজ আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দুঃখ,

অভিমান ও ক্রোধের সহিত বলিলাম, আমি এখন মহারাজের কাছে যাব না, আমি খুব রেগে আছি। কথাটা মহারাজও শুনিতে পাইয়াছিলেন, মিষ্টকণ্ঠে ভবানীকে বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, পরে আসবে। খাওয়াদাওয়ার পর মহারাজ যখন তামাক খাইতেছিলেন, আমি তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। তিনি তখন সুখাসনে বসিয়া, হুঁকার নলটি মুখের কাছে অথচ মুখে নাই, হাত দুইটি দুই হাঁটুর উপরে বরাভয়ের ভঙ্গীতে স্থাপিত, আর চক্ষু দুইটি যেন স্নেহ ও করুণার ধারায় প্লাবিত হইতেছে। মাথাটা তাঁহার কোলের কাছে রাখিয়া মেজেয় বসিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মহারাজ, আমার উপর রাগ করেচেন? তিনি কথা কহিলেন না, কিন্তু তাঁহার সুকোমল হাত আমার মাথা স্পর্শ করিল। তিনি একবিন্দু রাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। দুই চক্ষে আমার তখন ধারা বহিতেছে। বলিলাম, মহারাজ, আপনি আমাকে ছাড়বেন না, আমার তো আর কেউ নেই। তিনি উত্তর দিলেন, আমি কি ছাড়তে পারি? আবার বলিলাম, আপনি যদ্দিন আছেন, আপনার কাছে থাকব; তারপরে রামকৃষ্ণ মিশনে থাকব না। তিনি কিছুটা বিস্মিত হইয়াই যেন বলিলেন, কেন রে, কেন থাকবি না? উত্তর দিলাম, এখানে আর কাউকে আমার ভাল লাগে না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, স্নান করে খেগে যা।

"প্রতিদিন প্রায় আড়াইটার সময় মহারাজের গা-হাত-পা টিপিতে যাইতাম এবং চারিটায় টেপা শেষ করিয়া তাঁহাকে তামাক দিতাম। পূর্বোক্ত ঘটনার পরে একদিন যখন তাঁহার হাত টিপিতেছি আর তিনি ঘুমাইতেছেন বলিয়াই মনে হইতেছে, তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনীর ফাঁকে আমার হাতের আঙ্গুল যাইবামাত্র চাপিয়া ধরিলেন। ছাড়াইবার চেষ্টা যত করি কিছুতেই ছাড়াইতে পারি না। শেষকালে দেয়ালে পা ঠেকাইয়া প্রবল জোরে আকর্ষণ করিয়াও ব্যর্থকাম হইলাম। অথচ মহারাজের দেহ মাখনের মত নরম, ঘুমন্ত অবস্থার মত তাঁহার শরীর এলাইয়া পড়িয়া আছে, তিনি বলপ্রয়োগ করিতেছেন বলিয়াও মনে হইতেছিল না। আর আমি তখন নিজেকে পালোয়ান জ্ঞান

করি, সাড়ে সাত মন বোঝা হাটু পর্যন্ত তুলিয়া ধরিতে পারি। আমাকে নিরুপায় দেখিয়াই বোধ হয় মহারাজ ফিক্ করিয়া হাসিয়া আমার হাত ছাড়িয়া দিলেন, আর তখনো তিনি ঘুমাইতেছেন বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

"মহারাজ বলিয়াছিলেন, 'আমি কি ছাডতে পারি?' এইভাবে অভিনয় করিয়াই কি তিনি উহা আমার হৃদয়ঙ্গম করাইতে চাহিয়াছিলেন? তিনি কি বুঝাইলেন যে, আমি ছাড়িয়া যাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও তিনি ছাড়িবেন না, আর ছাড়িয়া যাইবার শক্তিটুকুও আমার নাই?"

মহারাজের এক সেবক কিছু নীতিগর্হিত কাজ করিয়াছিলেন। আর একটি সেবক সেকথা হরি মহারাজকে বলেন এবং হরি মহারাজ উহা মহারাজের কানে তুলেন। অভিযোগকারী সেবককে ডাকাইয়া আনিয়া মহারাজ কহিলেন: শুনলাম তুমি সব কথা হরি মহারাজকে বলেচ। আমি থাকতে তাঁর কাছে গিয়ে এসব তুচ্ছ কথা বলার কী প্রয়োজন ছিল তোমার, বোঝলাম না। তা বাপু, তোমার যদি অসুবিধা হয় তাহলে অন্য কোথাও চলে যেতে পার। আমার কাছে অনেক রকমের লোকই আছে, এর পরে ভালমন্দ সকল রকমের মানুষই আমার কাছে আসবে। তুমি আছ আমার সেবা করবার জন্যে, লোকের দোষগুণ বিচারে তোমার অধিকার নেই। আমি কি দেখচি না? আমি জানি, তুমি যার দোষ গেয়ে বেড়াচ্চ তার দোষ তেমন কিছু নয়। তার এত গুণ আছে যার তুলনায় দোষ অতি তুচ্ছ। দোষে গুণেই মানুষ। আমার কাছে যারা আছে তারা কেউই হীন নয়, এটি মনে রেখো।

মহারাজের এক সেবককে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র সরাইয়া দিবার কথা হইয়াছিল। সেই কথা তাঁহার কাছে উত্থাপিত হইবামাত্র তিনি কিঞ্চিৎ রোমাঞ্চিত হইয়া বলিয়াছিলেন, তোমাদের প্রেসিডেন্টগিরি ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু যাকে একবার আশ্রয় দিয়েচি তাকে কোনদিন ছাড়তে পারব না।

## (৪) ভক্তের জন্য ভাবনা

দক্ষিণদেশ হইতে নামরামায়ণ সংগ্রহ করিয়া মহারাজ বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন (১৯১০)। মঠে এই প্রথমবার সুরসংযোগে গীত হইবে, তাহার আয়োজন হইয়াছে। বিকালবেলা, অঙ্গনটি লোকে পরিপূর্ণ। গিরিশবাবু ও মাষ্টার মহাশয় উপস্থিত আছেন। ভিড়ের মধ্যে বসিয়া গোকুলবাবু একমনে কীর্তন শুনিতেছিলেন, হঠাৎ অনুভব করিলেন তাঁহার পায়ে ভীষণ ঝিঁঝিঁ ধরিয়াছে। পা মেলিবার উপায় নাই, বাহিরে যাওয়ার পথও বন্ধ। বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। এমন সময় দুইটি উজ্জ্বল চক্ষু তাঁহার দিকে তাকাইল, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল যন্ত্রণাও একেবারে দূর হইয়া গেল। যাঁহার সকরুণ দৃষ্টি তাঁহার দুঃসহ যাতনার অবসান ঘটাইয়াছিল সেই মহারাজকে তখন তিনি চিনিতেন না।

সাধু বা গৃহস্থ যাহাকেই মহারাজ ভালবাসিতেন তাহার পরকালটাই শুধু দেখিতেন না, ইহকালেও যাহাতে সে সুখেস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে তাহার উপায় করিতে সচেষ্ট হইতেন। তাঁহার অবর্তমানে তাঁহারই এক সেবক নিজেকে নিরাশ্রয় বোধ করিবেন এবং আত্মপোষণের জন্য উঁহার অর্থেরও প্রয়োজন হইবে, তিনি বুঝিয়াছিলেন। আর সেইজন্য এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে তিনি উঁহার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিলেন বা ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ দিয়াছিলেন, যিনি উঁহাকে বরাবর দেখিবেন। তাঁহার ইচ্ছা বিফল হয় নাই।

সাধুসঙ্গের ফলে ডাক্তার কাঞ্জিলালের মনে বৈরাগ্য বাড়িতে থাকে, কোনরূপে সংসার-খরচ চলিয়া যায় এইরূপ একটি নির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা করিয়া অধিকাংশ সময় সাধনভজনে কাটাইবার ইচ্ছা তাঁহাকে পাইয়া বসে। একটা সুযোগও আসিয়া উপস্থিত হয়। কনখল সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ তাঁহাকে জানান যে, তথাকার পৌরপ্রতিষ্ঠানের ডাক্তারের পদ খালি হইয়াছে, ইচ্ছা করিলে সেই পদ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন। ডাক্তার উৎফুল্ল হইয়া শ্রীশ্রীমাঁর অনুমতি লইতে গেলেন, কিন্তু মা বলিলেন, তুমি ভাল করে বুঝে দেখ। তখন মহারাজের অনুমতি আদায় করিবার জন্য কাশীতে তাঁহাকে পত্র লিখিলেন।

কুমুদবন্ধু সেন তখন কাশীতে, মহারাজ তাঁহাকে কহিলেন : কাঞ্জিলালের কাণ্ড দেখেচ ?—সে লিখেচে একশ দেড়শ টাকা বেতনে কনখলে যাবে, কলকাতার প্র্যাকটিস ছেড়ে। তার ঘাড়ে কত বড় সংসার, বুড়ো বাপ-মা আছে। তাকে বোলো, যার হেথায় আছে তার সেথায় আছে, যার হেথায় নাই তার সেথায় নাই। আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট না করে কলকাতায় ভাল করে রোজগারের চেষ্টা করুক। তুমি কলকাতায় গিয়ে শরৎ মহারাজকে আমার নাম করে বলবে, উদ্বোধনে গেলে ওকে যেন দুইতিন ঘণ্টা আড্ডার সুযোগ না দেন।

মহারাজ কলিকাতায় ফিরিয়াছেন, কাঞ্জিলাল তাঁহার গা হাত টিপিয়া দিতেছেন, মহারাজ কহিলেন, এত লোকের আমরা করে দিলাম, ডাক্তারের কিছু হচ্চে না, আচ্ছা, এর পরে খুব পসার হবে। টাকার চেয়ে প্রেমভক্তি যাতে হয় সেই আশীর্বাদ করুন—ডাক্তারের এই প্রার্থনার উত্তরে বলিলেন, সে তো আছেই, কিন্তু টাকা না হলে তোমার সংসার চলবে কী করে ? দেখিতে দেখিতে ডাক্তারের আয় খুব বাড়িয়া গেল।

কামাখ্যাধাম হইতে সপরিকর মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজকে ময়মনসিংহে আনয়ন করিয়া জিতেনবাবু অতি ভক্তির সহিত সেবা করিয়াছিলেন। ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় আসিবার পর মহারাজ একদিন সন্ধ্যাকালে বাবুরাম মহারাজকে বলিলেন,—জিতেনবাবুকে বাবুরাম মহারাজ স্নেহ করিতেন—কিছু হিকমত দেখাও যাতে জিতেন এই শরীরেই ঠাকুরকে লাভ করতে পারে। কথাটা অবশ্য জিতেনবাবুর অসাক্ষাতে হইয়াছিল।

দিন কয়েক ভুবনেশ্বরে থাকিয়া সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার যখন পুরী যাওয়ার উদ্যোগ করেন, মহারাজ তাঁহাকে পুরী যাইতে নিষেধ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে বলেন। পুরী যাইবেন বলিয়াই বাহির হইয়াছেন, আর পুরী দেখার কাজটি হইয়া গেলেই কলিকাতায় ফিরিবেন, ইত্যাদি যত কথা তিনি বলেন, মহারাজ কোন কথায় কান না দিয়া কেবলই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে বলেন। ষ্টেশনে আসিয়া দেখেন, মহারাজ একজন ব্রহ্মচারীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন তিনি কোথাকার টিকেট কাটিতেছেন, পুরীর অথবা

কলিকাতায়, দেখিবার জন্য। আপনি আমাকে পুরী যেতে দেন নাই কেন?—বেলুড় মঠে সত্যেন্দ্রনাথের এই প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বলিয়াছিলেন, তোমার মৃত্যুযোগ ছিল, পুরীতে গেলে তোমার মৃত্যু হত।[১]

বাগবাজারের ললিত চাটুজ্যে দিলদরিয়া লোক ও মহারাজের স্নেহপাত্র ছিলেন। জার্মানীর কাইজারের সঙ্গে গোঁফ-সাদৃশ্য থাকায় মহারাজ তাঁহার নাম দিয়াছিলেন কাইজার। তাঁহার পানদোষ ছিল। একসময়ে এই কদভ্যাসের এমনই বাড়াবাড়ি ঘটে যে, তিনি গ্র্যাণ্ড হোটেলে আহারাদি করিয়া চৌরঙ্গী অঞ্চলে বাস করিতে থাকেন ও বাড়ীতে আসা বন্ধ করিয়া দেন। তাঁহার স্ত্রী মহারাজের কাছে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেকথা বলেন, আর মহারাজও শীঘ্রই ইহার প্রতিকার করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন। সকালবেলা কাহাকেও সঙ্গে না নিয়া মহারাজ গ্র্যাণ্ড হোটেলে চলিয়া গেলেন ও কোন্ ঘরে বসিয়া ললিতবাবু আহারাদি করেন জানিয়া লইয়া অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার আগমন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে হোটেলে আসিয়া ললিতবাবু যেই পান সুরু করিবেন সেই সময়ে ঘরে ঢুকিয়া মহারাজ টেবিলের উপর রক্ষিত পানপাত্রটি হাতে নিলেন ও উদ্দেশে জগন্মাতাকে নিবেদন করিয়া ললিতবাবুর সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন, খাও, যখনই খাবে মাকে নিবেদন করে পরিমিতভাবে খাবে। তাঁহাকে দেখিয়া ললিতবাবু স্তম্ভিত ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বারবার আদিষ্ট হইয়া পাত্রটি হাতে লইয়া তিনি পান করিলেন, ও মহারাজের মানা সত্ত্বেও, গাড়ীতে করিয়া তাঁহাকে বাগবাজারে পৌঁছাইয়া দিতে আসিলেন। মহারাজও তাঁহাকে বাড়ীতে গিয়া স্ত্রীর সহিত

১ অপমানং তথা নিন্দা শোকো হানির্ধনক্ষয়ঃ। রোগো মৃত্যুর্মনস্তাপো মৃত্যুরষ্টবিধঃ স্মৃতঃ॥

দেখা করিয়া আপিসে যাইতে বলিলেন। এই ঘটনা ললিতবাবুর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।[২]

বাগবাজারের একটি যুবক কুসঙ্গে পড়িয়া বিপথগামী হয়। মহারাজকে সে ভক্তি করিত ও মাঝে মাঝে আসিয়া প্রণাম করিয়া যাইত। একদিন মহারাজ নিজে উপযাচক হইয়া তাহার সেবা গ্রহণ করিলেন ও আহারান্তে কহিলেন, দেখ্ তোকে একটা কথা বলি, তুই যা করচিস কর্, আমি বারণ করচি না; কিন্তু করবার আগে আমাকে একবার মনে করিস। সন্ধ্যার পর যুবকটি যথারীতি আড্ডায় গেল; গান সুরু হইয়াছে, মদের গেলাস তাহার হাতে আসিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল মহারাজের কথাটি 'আমাকে একবার মনে করিস', আর স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিল তাঁহার করুণাস্নিগ্ধ মুখখানি। সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে পানাদি সে করিল বটে, কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে কেমন যেন আলুনী ঠেকিতে লাগিল। দ্বিতীয়

---

২ পরমেশানন্দ-কথিত।

বসু-ভবনে মহারাজের সঙ্গে ললিতবাবুর একদিন নিম্নোক্ত কথাবার্তা হয়:

মহারাজ। খুব সাধুসঙ্গ করবে। ঠিক ঠিক সাধু হয় তো তাঁর সঙ্গ করবার ফল আছে বইকি। মহাপুরুষ যদিও ফচকিমি টচকিমি করেন তথাপি তাঁর সঙ্গ করতে ছাড়বে না। কারণ, সময়বিশেষে তাঁর মুখের একটা কথায় তোমার জীবনধারা বদলে যেতে পারে।

ললিতবাবু। আমরা যদি নিজেরা কোন চেষ্টা না করে কেবল আপনার কাছে বসে থাকি ও দুচারটে কথা কই তা হলেই কি আমাদের উন্নতি হবে?

মহারাজ। দুইই চাই। তা না হলে তো জপধ্যান সবাই করচে, সবাই তো সিদ্ধ হয়ে যেত। সঙ্গ করবার ফল আছেই। তোমার তো এত আড্ডা আছে, এখানে একদিনও না এসে থাকতে পার না কেন? 'আগুনে জেনেই হাত দাও আর না জেনেই হাত দাও।' ঠাকুর বলতেন, 'অমৃতকুণ্ডে ইচ্ছে করেই পড, আর কেউ ঠেলেই ফেলে দিক।' ঠাকুর কী একএকটি কথাই বলে গেছেন! 'যাকে একবার গোখরে সাপে কামড়ায় সে বিষ আর নাবে না।' পশ্চিমে এক সাধু দেখেছিলাম, তিনি বলতেন, সাধু যদিও ফচকিমি ফিসকিরি করেন তবু তাঁর সঙ্গ করতে ছাড়বে না, তাঁর পবিত্রতার প্রভাব যাবে কোথা?

পরেশনাথ সেনগুপ্ত-লিখিত ]

দিনেও ঐ একই ভাবের পুনরাবৃত্তি হইল। তৃতীয় দিন যখন সে আড্ডায় গেল তখন তাহার মনোভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, দারুণ বিতৃষ্ণায় মদের গেলাস দেয়ালের গায়ে ছুঁড়িয়া মারিয়া সে চিরতরে সেই পাপসঙ্গ পরিত্যাগ করিল।[৩]

মহারাজ বাঙ্গালোরে আছেন (১৯২১)। বৃন্দাবন হইতে নাদু তাঁহাকে লিখিয়াছেন, বিধবা এক মেয়েকে তিনি বিবাহ করিয়াছেন। নাদু স্বামিজীর স্নেহপাত্র ও মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বৃন্দাবনের সেবাশ্রম পরিচালনা করিতেন। মহারাজ বেশ একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, আপন মনে মাঝে মাঝে কেবলই বলিতে লাগিলেন, কেন বিয়ে করল? বিয়ে না করেও তো পারত! দুইএক দিন তাঁহাকে চিন্তিতভাবেই কাটাইতে দেখা গেল। তিনি বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিবার পর নাদু সস্ত্রীক তাঁহার কাছে আসেন। নাদুকে তিনি পূর্ববৎ সস্নেহে গ্রহণ করিলেন ও কাছে বসাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা কহিলেন; শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিয়া প্রাণ খুলিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। বিদায়ের সময় দেখা গেল, যতক্ষণ দেখা যায় একদৃষ্টে তিনি নাদুর দিকে চাহিয়া আছেন। দুইএক বছরের মধ্যেই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া নাদু বৃন্দাবনপ্রাপ্ত হন।

মহারাজ কলিকাতায় আছেন বসু-ভবনে। সকালবেলা কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান হইতে খবর আসিল, রামচন্দ্র দত্তের সন্ন্যাসী শিষ্য যোগবিনোদের রক্তবমন হইতেছে। মহারাজ খুব চিন্তিত হইয়া ভাল চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইতে বলিয়া পাঠাইলেন। ঘণ্টা দুই বাদে আবার খবর আসিল, যোগ-বিনোদ দেহত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজের মুখে শোকের ছায়া পড়িল, তিনি বড় হলঘরের একপাশ হইতে আর একপাশ পর্যন্ত গোঁভরে পায়চারি করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ এইভাবে কাটিয়া যাওয়ার পর এক ভক্ত আসিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। আমাদের একজন সাধু আজ মারা গেছেন বলিয়াই তিনি পূর্ববৎ পায়চারি করিতে লাগিলেন।

৩ ব্রহ্মগোপাল দত্ত হইতে প্রাপ্ত।

শোনা যায়, যোগবিনোদ কিছুদিন মহারাজের সেবা করিয়াছিলেন। মহারাজের নির্দলীয় ভাবটিও এখানে লক্ষণীয়, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের সঙ্গে বেলুড় মঠের তখন সদ্ভাব ছিল না।

হ্যাঁরে, অমুকের খবর জানিস ? একজনকে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে কহিল, না মহারাজ ; তার স্বভাব খারাপ হয়েচে, আমরা আর তার সংস্রবে থাকি না। 'সে কী রে, তোদের ভালবাসা কি বেশ্যার ভালবাসা ? আমি তো কারুর দোষ দেখি না।' মহারাজের কণ্ঠে সহানুভূতির সুর।

## (৫) দরদী

পুরীর শশীনিকেতনে হরি মহারাজ অসুখে শয্যাগত। তাঁহার পায়ে ঘা হইয়াছে, অস্ত্রোপচার হইবে। মহারাজ সে কথা শুনিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। বালকের মত চঞ্চল হইয়া একবার নিজের ঘরে আসিতেছেন, একবার হলঘরে যাইয়া পায়চারি করিতেছেন, পরক্ষণেই ছুটিয়া গিয়া হরি মহারাজের মাথার পাশে দাঁড়াইতেছেন। অস্ত্রোপচার হইয়া গেল, হরি মহারাজ নীরবে সহ্য করিয়াছেন ও শান্তভাবে শুইয়া আছেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, খুব কষ্ট হচ্চে, না হরি মহারাজ ? হরি মহারাজ একগাল হাসিয়া বলিলেন, না মহারাজ, আমার একটুও কষ্ট হচ্চে না ; পিঁপড়ে কামড়ালে যে ব্যথাটুকু হয় তাও আমি বোধ করচি না ; আপনি এঘরে থাকবেন না, আপনারই কষ্ট হচ্চে আমি দেখতে পাচ্চি। তারপরে মহারাজের হাতের উপর নিজের হাত রাখিয়া সান্ত্বনার সুরে কহিলেন, আপনি ভাববেন না, সত্যিই আমি কষ্ট বোধ করচি না। মহারাজ নিজের ঘরে আসিয়া ছোট খাটটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, আমাকে একটু তামাক দে তো। তাঁহার চক্ষু দুইটি তখন জলে পরিপূর্ণ।[১]

---

১ পার্থচৈতন্যের পিতা পাঁচছয় সের কই-মাগুর-শিঙ্গি পাঠাইয়াছিলেন মহারাজের জন্য। মাঝে মাঝে তিনি মাছ তরিতরকারি ইত্যাদি পাঠাইতেন, পুরীর নিকট তাঁহাদের কিছু জমিদারি ছিল। মাছ পাইয়া মহারাজ আনন্দিত। শশীনিকেতনের বাহিরের দিকে কুমার

মহারাজ আছেন কলিকাতায় বসু-ভবনে। বেলা প্রায় দশটার সময় রামকৃষ্ণ মিশনের এক আশ্রম হইতে প্র— আসিলেন, এবং মহারাজ কোথায়?— বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিলেন। শরীরটা তাঁহার রুগ্ন, চুল উষ্কখুষ্ক, গায়ের জামা ছেঁড়া—উন্মাদের মত অবস্থা। বড় হলে মহারাজ বসিয়াছিলেন, প্র— হলে ঢুকিয়াই তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন, আর কাঁদিতে কাঁদিতে জলে তাঁহার পা দুইখানি ভিজাইয়া দিলেন। আমাকে অমুক মারতে মারতে প্রায় মেরেই ফেলেছিলেন।...আর একটি ব্রহ্মচারী আমাকে মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে—এই দেখুন মহারাজ—বলিয়াই জামা খুলিয়া পিঠ দেখাইলেন। লাঠির আঘাতের চিহ্ন তখনও মিলাইয়া যায় নাই; একখানা থান ইট দিয়া পিঠের উপর খোয়া ভাঙ্গার মত ব্রহ্মচারী অনেকক্ষণ ধরিয়া মারিয়াছিল, সেই ঘাও শুকায় নাই। মহারাজের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল, প্র—র গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, তুই এখানে আমার কাছে থাক্ কদিন, দেখি কী করতে পারি। পরে সেই আশ্রমকর্তাকে তিনি কঠোর ভাষায় পত্র দিয়াছিলেন, আর সেই ব্রহ্মচারীকে ডাকাইয়া আনিয়া নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ অকল্যাণের হাত হইতে যথাসম্ভব তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য।[২]

---

ধারে মস্ত বড় এক চৌবাচ্চা ছিল, সেই চৌবাচ্চা জলে ভর্তি করাইয়া তিনি মাছগুলিকে উহার মধ্যে ছাড়িয়া দিলেন। কিছু পানা আনিয়া চৌবাচ্চায় দেওয়া হইল ও একটা তারের জাল দিয়া উপরটা ঢাকিয়া দেওয়া হইল। নিজের হাতে মাছগুলিকে মহারাজ খাবার দিতেন ও দিনের ভিতর তিনচারি বার যাইয়া দেখিয়া আসিতেন তাহারা কেমন আছে। কিছুদিন পরেপরে চৌবাচ্চার জল পালটাইয়া দেওয়া হইত। সেবকেরা ভাবিয়াছিলেন, অন্ততঃ একদিন এই মাছের ঝোল রান্না করিয়া মহারাজকে খাইতে দিবেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, না না, ওরা বেশ আছে—থাকুক। মাস দেড়েক পরে হরি মহারাজ পুরীতে আসেন, মাস দুই তাঁহার সঙ্গে আনন্দে কাটে, আর তারপরেই তাঁহার এই অসুখ। ডাক্তার কহিলেন, কই বা শিঙ্গি মাছের ঝোল তাঁহাকে দিতে হইবে। দুই মাস ধরিয়া সংরক্ষিত মাছগুলির ঝোল তাঁহাকে খাওয়ানো হইল।

২ এই ঘটনার বৎসরকালের মধ্যে মহারাজ দেহরক্ষা করেন। তাহার কিছুদিন পরে সেই ব্রহ্মচারী পাগল হয় ও অনেকদিন ভুগিয়া সেই অবস্থাতেই মারা যায়।

প্রথম প্রথম মহারাজ যখন পুরীবাস করিতেন সেই সময়ে তথাকার ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট অটলবিহারী মৈত্রের সঙ্গে তাঁহার একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। অটলবাবুর তিন স্ত্রী, প্রথমা স্ত্রীকে তিনি বড়-মা সম্বোধন করিতেন। অটলবাবুর বাসায় তখন প্রত্যেক রবিবার মহারাজ ও তাঁহার সেবক ও ভক্তদের খাওয়াদাওয়া হইত। অটলবাবু নিঃসন্তান ছিলেন।

পরবর্তী কালে অটলবাবুর সঙ্গে মহারাজের স্নেহসিক্ত ব্যবহার দেখিয়া সেবকেরা মুগ্ধ হইতেন, কিন্তু অটলবাবুকে তাঁহারা তেমন প্রীতির চক্ষে দেখিতেন বলিয়া মনে হয় না। তাঁহাদের একজন বলেন: অটলবাবু যখন শশীনিকেতনে আসিতেন, কতবার যে তাঁহার জন্য তামাক সাজিতে হইত বলা যায় না। তাঁহার শরীরটা ছিল চৌকো গড়নের—ঘাড়ে মাথায় এক। মুখ-ব্যাদান করিয়া যখন হাসিতেন, চক্ষু দুইটি মঙ্গোলিয়ানের মত ভিতরে ঢুকিয়া যাইত আর দন্তবিরল মুখটি আমাদের মনে ভয়ঙ্কর একটা ভাব জাগাইত। মহারাজের জন্য কলিকাতা হইতে সপ্তাহে দুইতিন বার তরিতরকারি-ফলমূল-মিষ্টির পার্সেল আসিত, নিজে উপস্থিত থাকিয়া তিনি পার্সেল খোলাইতেন, আর ঐ সকল বস্তুর কিয়দংশ অটলবাবুকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেন কত যে আগ্রহ সহকারে, তাহা দেখিয়া আমরা অবাক হইতাম। অটলবাবু উপস্থিত থাকিতে যদি পার্সেল আসিত, তাঁহার সম্মুখেই মহারাজ পার্সেল খোলাইতেন, আর বলিতেন, দেখুন কেমন সুন্দর সব ফলমূল তরকারি এসেচে। অটলবাবু আহ্লাদে আটখানা হইয়া মুখব্যাদান করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, মহারাজ, এ পোড়া দেশে এরকম জিনিস দেখতেই পাওয়া যায় না; কেবল কচু আর কুমড়ো এই এখানকার তরকারি, তবে এদেশের পেঁপেটা খুব ভাল। হয়তো তিনি দেখিতে পাইলেন দুই ছড়া বড় মর্তমান কলা আসিয়াছে, অমনি বলিতেন, মহারাজ, আমি মর্তমান কলা খেতে খুব ভালবাসি, আপনার বড়-মাও ফলটল খুব ভালবাসেন। মহারাজ সে কথায় খুব হাসিতেন, আর তরিতরকারি ও একজড়া কলা তাঁহার সঙ্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেন।

সেবকদিগকেই তাহা বহিয়া দিয়া আসিতে হইত। অটলবাবুর ব্যবহারে মহারাজকে কখনো কিছুমাত্র বিরক্ত হইতে দেখি নাই।

অটলবাবুর সঙ্গে মহারাজের শেষ দেখা হয় ভুবনেশ্বরে। বাড়ী ভাড়া করিয়া ছিলেন, সঙ্গে বড়-মা। খবর পাইয়া মহারাজ দেখা করিতে গেলেন। দেখিলাম তাঁহার আগেকার শরীর আর নাই, খুবই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। মহারাজকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও আমার মনে হয়, এই সর্ব প্রথম অতিশয় শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। মহারাজ তাঁহাকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন এবং কাছে বসাইয়া বলিলেন, একি আপনার শরীর যে একেবারে ভেঙ্গে পড়েচে। সাবধানে থেকে শরীরটা ভাল করে তুলুন, ভুবনেশ্বরের হাওয়ায় এখন শরীর ভালই হবে। বড়-মা খুব ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া কহিলেন, উনি যাতে ভাল থাকেন তা করবেন না ; পেটের অসুখ, গুচ্ছির ফল খাওয়া ভাল নয় ডাক্তার বলেচেন, উনি ছেলেমানুষের মত পেয়ারা দেখলে থাকতে পারেন না, পেয়ারা খাবেন। অটলবাবু বলিলেন, মহারাজ, পেয়ারা কলা আনারস পেঁপে দেবভোগ্য জিনিস। আমার এইসব ফলের গন্ধ এত ভাল লাগে যে, থাকতে পারি না—খেয়ে ফেলি! মহারাজ সস্নেহে কহিলেন, আপনি ভাল হয়ে উঠুন, তারপর খাবেন। সত্যিই ফল দেবভোগ্য, আমিও খুব ফল ভালবাসি। পেটের অবস্থা খারাপ থাকলে ফল খেতে নেই, আমিও খাই না।

আর একজনের কথায় ঐ সেবক বলিয়াছেন ঃ কলিকাতা হইতে চিঠি আসিল, এটর্ণী পল্টু কর পুরী আসিবেন। মহারাজও তাঁহাকে আসিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন। পল্টুবাবুকে একবার বেলুড় মঠে দেখিয়াছিলাম ঠাকুরের উৎসবের দিনে, বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মধ্যে সেরূপ প্রীতির ভাব দেখিতে পাই নাই। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা আগেও শুনিয়াছিলাম মহারাজের কাছে। বেলুড় মঠের মামলা মকদ্দমা সম্পর্কিত নথিপত্র নিয়া যখন উকিল এটর্ণীর বাড়ী মহারাজকে যাইতে হইত তখন পল্টুবাবুর কাছে গেলে তিনি সারাদিন বসাইয়া রাখিতেন।

এই সময়ের মধ্যে নিজে তিনচারি বার খাওয়াদাওয়া করিতেন, কিন্তু মহারাজ-কে একবারও খাইতে অনুরোধ করিতেন না। পল্টুবাবু যখন পুরী আসিলেন স্ত্রী ও এক জামাতা সঙ্গে নিয়া ( ১৯১৭ ), মহারাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন এবং শশীনিকেতনের দোতলায় থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহাদের কোনরূপ অসুবিধা যাহাতে না হয় সেই বিষয়ে নিজে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতেন। আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমরা ওদের সেবাযত্নে কিছুমাত্র ত্রুটি কোরো না, উনিও ঠাকুরের সন্তান এই দৃষ্টিতে দেখে ওদের সেবা করবে। তাঁহাদের আহারের ব্যবস্থা আমাদের সঙ্গেই হইয়াছিল। পল্টুবাবু সাহেব-মানুষ, সেই ভাবেই তাঁহার থাকা অভ্যাস, কথাবার্তাও ঐ ঢঙের। যতদিন তিনি পুরীতে ছিলেন মহারাজ তাঁহার সঙ্গে ভ্রাতৃবৎ আলাপ আলোচনা ও ব্যবহার করিতেন।

মাদ্রাজ হইতে মহারাজ পুরী আসিয়াছেন ( মে, ১৯১৭ )। খুরদা রোড ষ্টেশনে গাড়ী আসিল মধ্যরাত্রে, পুরীর গাড়ী শেষরাত্রে আসিবে। মহারাজ ও এক সেবক দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ছিলেন, তাঁহাদের জন্য বার্থ রিজার্ভ করা হইয়াছিল। তন্দ্রার ঘোরে সেবক শুনিতে পাইলেন মহারাজ কাহারও সঙ্গে কথা কহিতেছেন। পরে জানিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তি মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। তাহাদের বাড়ী ও তাহার পিতার সম্বন্ধে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া মহারাজ বলিয়াছিলেন: তোমার বাবা বড় ভাল মানুষ, বাবার সেবা তুমি ঠিকমত করচ তো? বাবার সেবা করবে বলেই আমি তোমাকে তাঁর কাছে থাকার অনুমতি দিয়েচি। তুমি তোমার বাবার কাছে আছ, তাঁর সেবা করচ, এর চাইতে বড় ধর্ম আর তোমার নেই। পিতামাতাকে ভগবান বোধেই সেবা করতে হয়, এতে তোমার ধ্যানজপের মত কাজ হবে। ভাবটাই আসল, ভগবানকে পিতৃভাবে মাতৃভাবে উপাসনার কথা শাস্ত্রে বলে।

ঐ শিষ্যটির মাতা বহুদিন পূর্বে স্বর্গতা হইয়াছিলেন, ছোট ভাইকে কাজের জন্য বাহিরে থাকিতে হইত।

গোকুলদাস দে লিখিয়াছেন: "ভক্তদের কষ্টে দুঃখে জননীর মত তাঁহার

(মহারাজের) প্রাণ কাঁদিত, সহানুভূতি ও সান্ত্বনা দিয়া তিনি দুঃখনিবৃত্তির উপায় বলিয়া দিতেন। স্বাস্থ্যভঙ্গে বহুদর্শী চিকিৎসককেও পরাজিত করিয়া ভক্তদের আহারবিহারের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তাহাদের বাড়ীতে কোন কার্য হইলে সেকার্যে যাহাতে বিন্দুমাত্র অনুষ্ঠানেরও ব্যতিক্রম না হয় তাহার জন্য যত্নবান থাকিতেন।"

## (৬) পতিতের প্রতি করুণা

পতিতের প্রতি সীমাহীন করুণার অভিব্যক্তি লইয়া যুগে যুগে শ্রীভগবানের নরলীলা মহিমান্বিত হইয়াছে। জ্বালার অনুভূতি যেখানে তীব্র, অন্তরের দৈন্য আর আকুলতাও সেখানে সমধিক; করুণাময়ের করুণাও বুঝি সেই কারণেই তথায় উচ্ছল হইয়া উঠে।

বঙ্গ রঙ্গালয়ের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী তারাসুন্দরী লিখিয়াছেন: "মন বড় খারাপ, অশান্তি—অশান্তি, কিছু ভাল লাগে না, একস্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারি না। নানা তীর্থে দেবালয়ে যাই...একদিন ঘুরিতে ঘুরিতে বেলুড় মঠে গেলাম। সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী—বাঙ্গলা নাট্য-শালার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী।...তখন প্রায় দুপুর উত্তীর্ণ হইয়াছে। মহারাজ সেবা-অন্তে বিশ্রাম করিতে যাইবেন, আমরা উভয়ে প্রণাম করিলাম।...বলিলেন, এই যে বিনোদ, এই যে তারা, এস এস, এত বেলা করে এলে, মঠের খাওয়া-দাওয়া যে হয়ে গেছে, আগে একটু খবর দিতে হয়, তাইতো—বস বস।... তাঁহার আদেশে তখনই প্রসাদ আসিল, লুচি ভাজাইবার ব্যবস্থা হইল।...মহা-রাজের আর তখন বিশ্রাম করা হইল না, একটি সাধুকে ডাকাইয়া বলিলেন, এদের সব মঠের কোথায় কী আছে দেখিয়ে দাও।

"...অপবিত্রা পতিতা—কি জানি যদি কোন অপরাধ হয়," তাই প্রথমে আমি সঙ্কোচে ভয়েভয়ে মহারাজের চরণধূলি লইয়াছিলাম।...সে ভয় সঙ্কোচ কোথায় উড়িয়া গেল! মহারাজ বলিলেন, আস না কেন? আমি বলিলাম,

ভয়ে মঠে আসতে পারি না।...মহারাজ বলিলেন, ভয়? ঠাকুরের কাছে আসবে, তার আর ভয় কী। আমরা সকলেই তো ঠাকুরের ছেলেমেয়ে...। যখন ইচ্ছা হবে এসো। মা, তিনি তো খোলটা দেখেন না, ভেতরটা দেখেন। তাঁর কাছে তো কোন সঙ্কোচ নাই।...বৈকালে চা খাইয়া মঠ হইতে ফিরিলাম। আসিবার সময় মহারাজ বলিলেন, মাঝে মাঝে এসো, আজ বড় কষ্ট হল, একদিন ভাল করে প্রসাদ পেও। এই আমার প্রথম দর্শন—এই আমার প্রথম বন্ধন।

"ইহার কিছুদিন পরে মহারাজ একদিন 'রামানুজ' দেখিতে যান। অভিনয় শেষ হইলে আমি মহারাজের পায়ের ধূলি লইলাম। মহারাজ আশীর্বাদ করিলেন, বেশ বেশ, খুব ভক্তিবৃদ্ধি হোক।

"...জগন্নাথের দর্শন লালসায় পুরী যাত্রা করিলাম। পথে ভুবনেশ্বর-ধর্মশালায় আছি, শুনিলাম মহারাজ ভুবনেশ্বরের মঠে আছেন, দেখিতে গেলাম। মহারাজের সেই আদর, সেই যত্ন, সেই আগ্রহ—কোথায় বসাইবেন, কী খাওয়াইবেন! বলিলেন, একী, রোদ্দুরে যে তোমার মুখ শুকিয়ে গেছে! এসেচ শরীর সারাতে, রোদ্দুরে বেরুলে কেন?...কোথায় খাও? কাল থেকে মঠ হতেই প্রসাদ যাবে। কী খেতে ভালবাস? আর মা, আমরা সাধু সন্ন্যাসী ফকীর--কী বা এখানে পাওয়া যায়!...আমি তো একেবারে অবাক —কে আমি? সমাজের কোন্ স্তরে আমার স্থান? কত—কত নিম্নে—ঘৃণা ও অবজ্ঞা ছাড়া জগতে যাহার প্রাপ্য আর কিছুই নাই! না বন্ধু, না পিতা, না আত্মীয়—এতবড সংসারটা, এ যেন একটা পরের বাড়ী। স্বার্থ ভিন্ন কেহ কথা কয় ন", ফিরেও চায় না।...আজ স্বামী ব্রহ্মানন্দ—...সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, সর্বপূজ্য, সর্বমান্য মহারাজ...কী অকৃত্রিম স্নেহ, কী অপ্রত্যাশিত যত্নে আমাকে আপনার করিয়া লইলেন।...মনে হইল, এই কি বাপের স্নেহ, না এ তার চেয়েও বেশী আর কিছু? চোখের জল রাখিতে পারিলাম না, সারা জীবনের আক্ষেপ যেন অশ্রুধারার সঙ্গে গলিয়া মাটিতে পড়িতে লাগিল। এই তো জুড়াইবার স্থান, এই তো এমন একজন দরদী আছেন যাঁহার কাছে আমি

পতিতা নই, অস্পৃশ্যা নই, ঘৃণিতা নই। মহারাজের মেয়ে আমি,…ঐ আমার পিতা, আমার স্বর্গ, আমার শান্তি, আমার ভগবান।...মহারাজ কত কথা বলিলেন—কত—সব মনে নাই। কিন্তু যাহা মনে আছে তাহাই এখন আমার জীবনের সম্বল। বলিলেন, মা...দেখচ তো সংসারে কত জ্বালা। আমাদেরও যে ওরকম হয় নি তা মনে কোরো না। যখন প্রথম ঠাকুরের কাছে যাই, বয়স অল্প—জপতপ করি, কিন্তু সব সময় শান্তি পাই না। মনে কত কথা উঠে… সময় সময় ভাবি, কই আনন্দ তো কিছু পেলাম না! একদিন এইরকম বসে ভাবচি, মনে করচি এখান থেকে পালাব আর ঠাকুরের সঙ্গে দেখাও করব না। দেখলাম সম্মুখে ঠাকুর। বল্লেন, কী ভাবচিস—বড় জ্বালা—নয়? আমি নিরুত্তর। ঠাকুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। জ্বালা কোথায় গেল! কী আনন্দ! কী আনন্দ! আমারও মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইল, বাবা, আমার তো বড় জ্বালা—বড় তাপ--সহ্য করতে পারচি না, ছুটে ছুটে বেড়াই।… আমারও জ্বালা জুড়িয়ে দিন। স্নেহপূর্ণ করুণস্বরে মহারাজ বলিলেন, ঠাকুরকে ডাক মা, কোন ভয় নেই। তিনি তো এই জন্যেই এসেছিলেন। নাম কর— প্রথমটা দুদিন একটু কষ্ট হবে, তারপর ঠাকুরই সব ঠিক করে দেবেন। কোন ভয় নেই মা, কোন ভয় নেই। দেখবে—বড় আনন্দ হবে, বড় মজা হবে।"[১]

কুসুম ও হরিমতি চিৎপুরে বাস করিত। হরিমতি অপেক্ষা কুসুম বয়সে বড়, তাহাদের প্রথম জীবন ভাল ছিল না। কুসুম পরে কীর্তন গান করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত। দুইটিতে একত্র মিলিয়া শান্তির সন্ধানে যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইত। অন্তর্যামী তাহাদের উপায় করিয়া দিলেন, কোনরূপে মহারাজের সন্ধান পাইয়া তাহারা একদিন বসু-ভবনে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিল ও তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল। মহারাজ তাহাতে বাধা দিলেন না, কোনরূপ সঙ্কোচের ভাবও দেখাইলেন না। তাহারা কিছু ফলমিষ্টি আনিয়াছিল, মহারাজের আদেশে চাকরদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল।

---

১ উদ্বোধন—জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯।

কয়েকদিন পরে আবার তাহারা মহারাজকে দর্শন করিতে আসে। মহারাজ খাটের উপর বসিয়াছিলেন, হরিমতি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দূরে স্থির হইয়া বসিল। কিন্তু কুসুম দূরে গেল না, মহারাজের পায়ে হাতটি রাখিয়া নীচে বসিল এবং নিজের সুখদুঃখের কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। তাহার ভাব দেখিয়া মনে হইতেছিল মেয়ে পিতার কাছে আসিয়াছে, যেন দুঃখিনী মেয়ে কত কত দুঃখভোগের পরে দুঃখের বোঝা লাঘব করিতে পারেন যিনি সেই আপন জনকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। চক্ষু ছলছল। মহারাজ কহিলেন, কুসুম, তুমি তো কীর্তন কর, আমাকে তোমার গান শোনাবে না?—একটা গান গাও। কুসুম গান ধরিল: কেন বঞ্চিত হব চরণে? আমি কত আশা করে বসে আছি—পাব জীবনে, না হয় মরণে।' দুইএক পংক্তি গাহিয়া সে কান্নায় ফাটিয়া পড়িল মহারাজের পায়ে মাথাটি রাখিয়া। মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে মহারাজ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। হরিমতির চক্ষেও জল দেখা দিয়াছে। তাহারা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে মহারাজ বলিয়াছিলেন, হরিমতি মেয়েটি খুব ভাল, কেন যে ওদের এমন জীবন হল বোঝা যায় না।

এইবারেও তাহারা ফলমিষ্টি আনিয়াছিল। ঠাকুরের ভাইপো রামলাল উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে মহারাজ বলিলেন, তুমি যদি খাবার অনুমতি দাও, আর নিজে হাতে করে এদের হাতে তুলে দাও তাহলে দোষটা কেটে যাবে, এরা খেতে পারবে। স্বহস্তে দুইটি আম তুলিয়া মহারাজ তাঁহার হাতে দিলেন। রামলালদাদা উপস্থিত সাধু ও ভক্তগণকে আমগুলি বিতরণ করিলেন।[২]

---

২ বসু-ভবনে একদিন একটি মেয়ে ও একটি পুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে আসে। খুদুমণি তাহাদের অভিপ্রায় জানিয়া লইয়া মহারাজের কাছে গিয়া তাহা ব্যক্ত করেন। তাহাদের দুইতিনখানা বাড়ী আছে, বেলুড় মঠে ঠাকুরের নিত্যসেবায় দিতে চায়। মহারাজ সেকথা শুনিয়া বলিলেন, না বাবা, আমরা থাকতে এসব হবে না। এরপর তোরা তো যাচ্চে তাই করবি। কাশী সেবাশ্রমে দিক না? খুদুমণির এই প্রস্তাব শুনিয়া কহিলেন, আচ্ছা, তুই তাদের ডেকে নিয়ে আয়। মেয়েটি মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিল, সে কীর্তন গাহিয়া

আমন্ত্রিত হইয়া মহারাজ 'রামানুজ' অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন, সঙ্গে নীরদ মহারাজ ও ঈশ্বর। অভিনয় দর্শনে সকলেই মুগ্ধ। তাঁহারা বক্সে বসিয়াছিলেন, অভিনয়ান্তে একজন আসিয়া বলিল, দয়া করে একবার নীচে চলুন, অভিনেত্রীরা প্রণাম করবে। মহারাজ সাগ্রহে সাজঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন, নীরদ মহারাজও সঙ্গে গেলেন, কিন্তু ঈশ্বর গেলেন না—তাঁহার বয়স অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া সুদর্শন যুবক নিজের যাওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। কিয়দ্দূর গিয়াই মহারাজ পেছনে তাকাইলেন ও তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া ডাকিয়া বলিলেন, ওরে ঈশ্বর, তুইও আয়, এরা সকলেরই আশীর্বাদ চায়।

ঢাকার অধিবাসী নবদ্বীপচন্দ্র বসাক আবাল্য দুষ্কর্মা ছিলেন। আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, পিতার একমাত্র পুত্র না হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ত্যাজ্য-পুত্র করিতেন। দুষ্কৃতির ভারে অবসন্ন জীবন লইয়া নবদ্বীপ এক শুভ মুহূর্তে মহারাজের দর্শন পান ও কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণাপন্ন হন। মহারাজ তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন, নবদ্বীপ, তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। একদিন নবদ্বীপ জিজ্ঞাসা করেন, রাত্রে একাকী বসে আছি, কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ সমস্ত ঘর সুগন্ধে ভরে গেল—একএক দিন এরূপ অনুভব করি। কেন এমন হয়? মহারাজ উত্তর দেন, মহাপুরুষরা আসেন, তাঁরা যাদের ভালবাসেন তাদের দেখতে, তাদের মঙ্গলের জন্যে; তাঁদেরই গাত্রসৌরভ ঘর আমোদিত করে।[৩]

---

উপার্জিত অর্থে বাড়ী করিয়াছে। মহারাজ কহিলেন, ঠাকুরের নিত্যসেবায় এ টাকা নিতে পারি না, তুমি যদি নেহাৎ ঠাকুরের ভোগেই দিতে চাও, ঠাকুরের উৎসবে যে বিরাট ভোগ হয় তাতে দিতে পার। মেয়েটি তাহাতেই রাজি হইয়া গেল। মহারাজ বলিতেন, বছরে এই একদিন মাত্র ঠাকুর বিরাট মূর্তিতে যাবতীয় ভোগ গ্রহণ করেন।

৩ একদিন মহারাজ পুরীতে ভক্তদের সঙ্গে শশীনিকেতনের বারান্দায় বসিয়াছিলেন, সেই সময় সকলেই একটি মনোরম সুগন্ধ অনুভব করেন। মহারাজ বলেন, যখন দেবতারা শূন্যপথে যাতায়াত করেন তখন দিকে দিকে এরূপ সুগন্ধ ছড়ায়।

টাবু (মতীশ্বর) প্রায় প্রতিদিনই মহারাজের কাছে আসিতেন, তাঁহার শরীর টিপিয়া বা তাঁহাকে তেল মাখাইয়া দিতেন। মহারাজও তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। মহারাজ ও তাঁহার সেবকদের উপর টাবু এত টান অনুভব করিতেন যে, সময়ে সময়ে বসু-ভবনে রাত্রিবাসও করিতেন শুইবার কষ্ট গ্রাহ্য না করিয়া। এত সাধুসঙ্গ সত্ত্বেও টাবুর জীবনে এক অবাঞ্ছিত ব্যাপার ঘটিয়া গেল ও স্বভাবতই তিনি মহারাজের কাছে আসিতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলেন। রাত্রে আহারান্তে আসিয়া সেবকদের পায়ের কাছে শুইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে দেখা করেন না। এইভাবে কয়েকদিন গত হইলে টাবু একদিন সন্ধ্যার পূর্বে বসু-ভবনে আসিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে খানিক আড্ডা দিয়া চলিয়া যাইবেন মনে করিয়াছিলেন, আর মহারাজের সঙ্গে যাহাতে দেখা না হয় সেই বিষয়েও সতর্ক ছিলেন। চুপিসারে আসিয়া উঁকি মারিয়া তিনি দেখিতেছিলেন মহারাজ ঘরে আছেন কিনা। মহারাজ তখন অন্দর হইতে আসিতেছিলেন, দেখিতে পাইয়া বলিলেন, আরে টাবু যে! হঠাৎ এ সময়ে? তিনি কাছে আসিতেই সঙ্কোচে আড়ষ্ট হইয়া টাবু পিছাইয়া যাইতে লাগিলেন। বেঞ্চে বসিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, বড় শিঙওয়ালা মোষ দেখেছিস? 'হ্যাঁ মহারাজ।' 'কত বড় শিঙ দেখেছিস?' টাবু হস্ত প্রসারিত করিয়া দেখাইলেন। 'এর চেয়ে আরো বড় মোষের শিঙ আছে।' মহারাজ হাত দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, এত মোটা, ইয়া বড় শিঙ। আবার বলিলেন, আচ্ছা, বলতে পারিস সেই মোষের শিঙের উপর যদি অনেকগুলো মশা বসে, মোষ কি জানতে পারে, না তার কষ্ট বোধ হয়? আমাদেরও তেমনি জানবি।

ঢাকায় এক সকালে মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজ পাশাপাশি দুইখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। বাবুরাম মহারাজ বলিলেন, স্বামিজী ছিলেন অধম-তারণ পতিতপাবন। মহারাজ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, আমিও অধমতারণ পতিতপাবন।

## (৭) প্রীতির সেবায় পরিতোষ

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য নানাস্থান হইতে লোকেরা ভুবনেশ্বরে আসিত, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মঠেও যাওয়াআসা করিত। একবার যশোহর খুলনা হইতে ক্ষিতীশ বসু নামে একব্যক্তি তাঁহার শ্যালক যোগেশকে সঙ্গে নিয়া ভুবনেশ্বরে আসেন; ইঁহাদের প্রতি মহারাজ প্রসন্ন ছিলেন, যোগেশকে স্নেহ করিতেন। কথায় কথায় একদিন যোগেশ বলিল, তাহাদের দেশের জমিতে খুব ভাল চাল হয়। মহারাজ কহিলেন, বেশ তো, কিছু চাল আনাও না ঠাকুরের ভোগের জন্যে। কয়েক দিন পরেই ছোট একটি পোষ্ট পার্সেল হাতে করিয়া আসিয়া যোগেশ কহিল, মহারাজ, এই চাল এসেচে। ছোট প্যাকেট দেখিয়া সেবকদের মন প্রসন্ন হইল না, মাত্র একসের বা দেড়সের চাল হইবে, রামবাবুদের জমিদারি ঝঙ্কর হইতে তখন মন মন ভাল চাল আসে। মহারাজ কিন্তু চাল দেখিয়া অতি খুশী হইয়া কহিলেন, বাঃ বাঃ, বেশ চাল, এই চালে ঠাকুরের পায়েস ভোগ হবে। সাতদিন ধরিয়া চালের প্রশংসাই চলিল। একএক দিন ভাঁড়ারে গিয়া চালটা ঠিকমত আছে কিনা খোঁজ নিতেন, আর ভাঁড়ারীকে শাসাইয়া বলিতেন, দেখিস এ চাল যেন ইঁদুরে বাঁদরে না খায়, একটিও নষ্ট না হয়; যদি হয় তাহলে মজা টের পাবি, এই লাঠি দিয়ে তোর মাথা ভাঙব। চালের প্রশংসা করিতে গিয়া যোগেশেরও প্রশংসা করিতেন। সত্যই এই চাল পরে ঠাকুরের ভোগে লাগিয়াছিল। সামান্য জিনিসের এত কদর শুধু প্রীতির দান বলিয়া।

রামবাবুর মেজো মেয়ে মাধবীলতা শ্বশুরবাড়ী হইতে মহারাজের জন্য খাবার করিয়া আনিয়াছেন, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে তখন। রাত্রে আহারের সময় পরম তৃপ্তির সহিত খাইতে খাইতে 'তুই নিজে করেচিস?' ইত্যাদি কথা বলিয়া মহারাজ উহার বহু প্রশংসা করিলেন। পরে যখন বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা খাবার চাখিতে গেলেন তখন দেখা গেল, নুন হয় নাই, কাঁচাও থাকিয়া গিয়াছে। যিনি খাবার করিয়াছেন তাঁহার লজ্জা হইতে লাগিল মহারাজকে কী খাইতে দিলাম ভাবিয়া, মহারাজের খাইয়া তৃপ্তি ভক্তিরসে সিক্ত বলিয়া।

রামবাবু তাঁহার মাকে লইয়া কাশী গিয়াছেন। পরদিন সকালে রামবাবুর জ্ঞাতিভ্রাতা নিত্যানন্দ বসুকে মহারাজ বলিলেন, নিতাই, আমি মঠে যাচ্চি। নিতাই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন মহারাজ, আপনার শরীর কি ভাল যাচ্চে না? 'না না, বেশ ভাল যাচ্চে তো।' 'তবে কেন মঠে যাচ্চেন?' মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া নিতাই কহিলেন, মহারাজ, নেশার ঝোঁকে আমার কিছুই ঠিক থাকে না। আপনি যদি সামান্য একটু সুযোগ দেন আমাকে, অপরাধ না নিয়ে, আমি এই সময়ে আপনার সেবা কিছুতেই ছাড়ব না। (পদস্পর্শ করিয়া) বলুন মহারাজ, আমাকে ঘৃণা করবেন না? 'না না নিতাই, সে কী কথা' বলিয়া মহারাজ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন, ভক্তিমান নিতাইবাবুও কিছুদিন তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইলেন।

বশী সেন বিষ্ণুপুর হইতে একটা বড় মাছ আনিয়াছেন। মাছটি লইয়া বসু-ভবনে আসিতেই এক সেবক বলিয়া উঠিলেন, নিয়ে চলে যান, মাছের আজ কোনই দরকার নাই; একটি ভক্ত এত মাছ পাঠিয়েচে যে, আমরা প্রায় দশসের মাছ বিলিয়ে দিয়েচি। বশী যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, মাছটি নীচে রাখিয়া মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে উপরে গেলেন। দেখামাত্র মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, বশী, তুমি বিষ্ণুপুর থেকে আমার জন্যে কী এনেচ? ভগ্নমনে বশী উত্তর দিলেন, একটা মাছ এনেছিলুম মহারাজ, কিন্তু শুনচি সে মাছ আপনার সেবায় লাগবে না, অনেক মাছ নাকি বিলিয়ে দিতে হয়েচে। 'বিষ্ণুপুরের মাছ অতি উৎকৃষ্ট!' এই মন্তব্য করিয়াই সেবককে ডাকিয়া মহারাজ কহিলেন, দেখবি, বশীর মাছ যেন বেশ করে ধুয়েকেটে রান্না করা হয়, আর কেউ যেন এর এক টুকরাও সরিয়ে না ফেলে। বশী হাতে হাতে স্বর্গ পাইলেন।

মহারাজকে যোগীন-মা খাওয়াইতে খুব ভালবাসিতেন। মহারাজ যখন বসু-ভবনে থাকিতেন যোগীন-মা প্রায় রোজই বৈকালে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন, আর দেখামাত্র মহারাজ বলিয়া উঠিতেন, যোগীন-মা, আজ কী এনেচ? যোগীন-মা উত্তর দিতেন, আর বাবা, এই সামান্য একটু কিছু

এনেচি, তুমি মুখে দিয়ো। তিনি সাধারণতঃ একটা বড কোটায় করিয়া লুচি, আলুর দম ও চমচম লইয়া যাইতেন।

মাদ্রাজ যাত্রার প্রাক্কালে, বসু-ভবনে প্রদত্ত বিদায়ভোজে প্রচুর আহারের পরে, মহারাজ উদ্বোধনে আসিয়াছেন গণেন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে। তাঁহার জন্য সোডা ওয়াটাব ও ডাব আনিয়া রাখা হইয়াছিল, তিনি খাইবেন বলিয়াছিলেন। এমন সময় যোগীন-মা একটা ভাঁড়ে করিয়া গোটা আষ্টেক মিষ্টি লইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মহারাজ বালকের মত বলিয়া উঠিলেন, দাও দাও আমার জন্যে কী এনেচ! যোগীন-মার চোখমুখের ভাব ঠিক মায়ের মত। মহারাজ ভাঁড়টি নিজের হাতে লইলেন এবং একে একে সবগুলি মিষ্টিই খাইয়া ফেলিলেন!

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের, ঘটনা। বাগবাজারের লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত একরাত্রে স্বপ্ন দেখেন, নারায়ণ গোপালমূর্তিতে তাঁহার হাতে ক্ষীর ছানা চিনি খাইতেছেন। তাঁহার মনে হইল, পরমহংসদেবের শিষ্যদিগকে খাওয়াইলেই গোপালকে খাওয়ানো হইবে। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কিরণচন্দ্র বেলুড মঠে যাইয়া মহারাজকে সেই কথা জানাইলেন। মহারাজ তাঁহাদের আমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া, নির্দিষ্ট দিনে মঠের সাধুদিগকে সঙ্গে নিয়া দত্ত-ভবনে শুভাগমন করিলেন ও তাঁহাদের আয়োজিত নৈবেদ্য—ক্ষীর ছানা চিনি মাখন পায়সান্ন ও ক্ষীর হইতে প্রস্তুত বিবিধ মিষ্টান্ন গ্রহণ করিয়া কহিলেন, বহু জায়গায় নেমন্তন্ন খেয়েচি, কিন্তু এমন সাত্ত্বিক আহাব করি নি।[১]

## (৮) স্বরূপ-গুণ-কথন দৈবপ্রকৃতি মেয়েদের

মহারাজ বাঙ্গালোর মঠে আছেন। একাউন্ট্যান্ট জেনারেল কৃষ্ণলাল দত্ত আসিয়া বলিলেন: তাঁহার মেয়ে রোগশয্যায় শায়িতা। তাঁহার বয়স ২৭।২৮ বছর, উঠিয়া বসিবার শক্তি নাই, বাঁচিবারও আশা নাই, একটিবার শুধু

১ ব্রহ্মগোপাল দত্ত হইতে প্রাপ্ত।

মহারাজকে দর্শন করিতে চায়। মহারাজ যে বাঙ্গালোর মঠে আছেন একথা সে জানিয়াছে সম্ভবতঃ খবরের কাগজে পড়িয়া। কাহারো বাড়ীতে বা বাসায় যাইতে মহারাজ সহজে স্বীকৃত হইতেন না; কিন্তু এক্ষেত্রে শুনিয়াই বলিলেন, হঁ্যা যাব। আর তখনি, কোন সেবককে সঙ্গে না নিয়া, কৃষ্ণবাবুর গাড়ীতে তাঁহাদের বাসায় চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়াই হরিহরানন্দকে কহিলেন: ওরে, তুমি আর ঈশ্বর এখনি দত্তদের বাসায় যাও, ঐ মেয়েটিকে গান শুনিয়ে এসো। আমি তাকে বলেচি আমার ছেলেরা ভাল ভজন গায়। তাকে এইসব গান শোনাবে—'দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে।' 'প্রেমানন্দে রাখ পূর্ণ আমারে দিবসরাত।' মেয়েটি খুব ভাল, ঠাকুরের জিনিস। ঠাকুর কোথায় যে তার ভক্তকে কিভাবে রেখেছেন বোঝা যায় না।

সাধুরা গিয়া দেখিলেন, মেয়েটির সর্বাঙ্গ ঢাকা, কিন্তু উন্মুক্ত মুখখানি প্রফুল্ল পদ্মের মত সাত্ত্বিক আভায় পূর্ণ। গান শুনিয়া সে কহিল, আমি মহারাজের মেয়ে, আপনারা আমার পর নন, আপনাদের কত ভাল লাগচে। আরো গান শুনতে ইচ্ছা হয়, আপনারা আসবেন। মহারাজের আদেশে আর একদিন গিয়া মেয়েটিকে সাধুরা গান শুনাইয়াছিলেন। সবশেষে যখন 'ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম' গানটি গাওয়া হইল তাহার গণ্ড প্লাবিত করিয়া আনন্দাশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তাহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া মহারাজ বলিয়াছিলেন, এ শাপভ্রষ্টা; এরকম আধার জগতের মলিনতায় বেশীদিন থাকে না, টিকিতে পারে না।

নিত্যানন্দ বসুর স্ত্রী কমলা মৃত্যুশয্যায়। মহারাজ তাঁহাকে স্নেহ করিতেন, দুইতিন বার গিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন, কমলা ডাকিয়া পাঠাইতেন। অপরাহ্ণ কাল। অন্তিম মুহূর্ত নিকট বুঝিয়া, রোগিণীর বিছানায় তাঁহার পাশে বসিয়া অনুকম্পাভরে মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, এত কম বয়সে চলে যাবে! আমার জপের মালাটা নিয়ে আয় তো। সেবক আনিয়া দিলে মহারাজ মালা হাতে করিলেন, কিন্তু জপ না করিয়াই উঠিয়া আসিলেন ও কহিলেন,

নিতাই রাখতে পারলে না...। শাপভ্রষ্টা দেবী এসেছিলেন, দেখচিস না, একটা দিব্যভাবে বাড়ীটা ভরে গেছে! সেবক অনুভব করিয়াছিলেন তাজা বেলফুলের গন্ধে বাড়ী ভরপূর অথচ কোন ফুলই তখন বাড়ীতে আসে নাই। কমলা শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্যা ছিলেন।

পুরীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অটল মৈত্র মাঝে মাঝে মহারাজকে নিয়া নিজের বাসায় উৎসব করিতেন, অটলবাবুর প্রথমা স্ত্রীকে মহারাজ বড়-মা সম্বোধন করিতেন, এসব কথা আগেই বলা হইয়াছে। বড়-মার উপর মহারাজের উচ্চ ধারণা ছিল, বলিয়াছিলেন, আমি দেখলুম দেবী এসে তাঁর ঘরে ঢুকলেন; তার আগে অনুভব করেছিলুম বেলফুলের গন্ধে চারিদিক আমোদিত! মহারাজের কথায় অটলবাবু একবার কালীপূজা ও একবার জগদ্ধাত্রীপূজা করাইয়াছিলেন। শশী মহারাজ পুরীতে আসিয়াছিলেন, তিনিই কালীপূজা করেন।[১]

'বাঙ্গালমায়ী'—মহারাজ তাঁহাকে এই নামে ডাকিতেন—তাঁহার দুই কন্যার অকাল মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হইয়া পড়েন। এক মহাপুরুষ কাশীতে আসিয়াছেন, কোনরূপে এই খবর পাইয়া শোকার্তা জননী শান্তিলাভের আশায় মহারাজের কাছে আসিয়া উপস্থিত হন। মহারাজের দর্শনে ও আশীর্বাদে বাঙ্গালমায়ীর দুরপনের শোক ক্রমে শান্ত হয় এবং তাঁহার উপদেশানুযায়ী চলিয়া তিনি সাধনমার্গে দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকেন। তাঁহাকে

---

১ কালীপূজার পরদিন বিকালে সকলে অটলবাবুর বাসায় বসিয়াছিলেন ও একজন ভজন গাহিতেছিল। হঠাৎ মহারাজ বলিলেন, নাচতে ইচ্ছা হচ্চে। কিন্তু নাচিতে গিয়াই সমাধিস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শশী মহারাজ অটলবাবুকে শীঘ্র একটি ফুল আনিতে বলিলেন। ফুলটি মহারাজের হাতে দিতেই সমাধি ভাঙ্গিল; বলিলেন, আহা, দেখছিলুম ঠাকুর এখানে বসে আছেন! [ রতিকান্ত মজুমদার-কথিত ]

লক্ষ্য করিয়া কাশীতে মহারাজ বলিয়াছিলেন, এখানে একজন মেয়েলোক আছেন, তিনি এত এগিয়ে গেছেন যে, সাধু হয়েও তোমরা তা পারলে না।[২]

মুজঃফরপুর পিত্রালয় হইতে নববিবাহিতা অমিয়বালা কাশীতে আসিয়াছে, শ্রীশ্রীমা তখন কাশীতে। পরদিন সকালে গোলাপ-মার সঙ্গে যাইয়া মহারাজকে সে দর্শন ও প্রণাম করিয়াছে। বিকালবেলা অদ্বৈতাশ্রমে মহারাজকে গোলাপ-মা জিজ্ঞাসা করিলেন, বিভূতির বৌকে কেমন দেখলেন? মহারাজ উত্তর দিলেন, খাসা বৌ; মুজঃফরপুরের কলায়ের ডাল খেয়ে কী করে এমন বৌ হয় বুঝতে পাচ্চি না। 'কী দিয়ে আশীর্বাদ করলেন?' 'পায়ের ধূলো দিয়ে।' 'শুধু পায়ের ধূলো দিয়ে?' 'গোলাপ-মা, তুমি কি জান না, পায়ের ধূলার কী দাম? এ হও, সে হও, কত কী বল্লুম!'

তারপর দিন মহারাজ, হরি মহারাজ ও মহাপুরুষ একসঙ্গে খাইতে বসিয়াছেন, শ্রীশ্রীমা সাধুদের জন্য ভাণ্ডারা দিয়াছেন। আসনে বসিয়াই মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, বিভূতির বৌকে দেখব, কাল ভাল করে দেখা হয় নি। নিজের ভাইঝি মাকুকে সঙ্গে দিয়া মা অমিয়কে পাঠাইয়া দিলেন। মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, তোমার নাম কী? সে কথা কহিল না। ভয় কী মা, আমি তোমার বাবা, মহারাজ কহিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে হরি মহারাজ বলিলেন, আমি তোমার কাকা; মহাপুরুষ বলিলেন, আমি তোমার জেঠা। 'ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বসে আছেন, দেখতে পাচ্চ না মা?' মহারাজ একথা বলিতেই সে উত্তর দিল, 'আমার নাম অমিয়।' 'হোমিওপ্যাথি?' সে হাসিয়া ফেলিল। মহারাজ কহিলেন, এস মা। এই সুলক্ষণা মেয়েটি দীর্ঘ-জীবিনী হইল না। শ্রীশ্রীমার কাছে মন্ত্র লইবার অল্পদিন পরেই সে ইহসংসার ত্যাগ করে।

---

২ বাঙ্গালমায়ী বাৎসল্যরসের সাধিকা ছিলেন। সাধুদিগকে 'গোপাল' জ্ঞান করিতেন। স্বামিজীর সন্ন্যাসশিষ্য শুকুল মহারাজ (আত্মানন্দ) যিনি স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কহিতেন না, বাঙ্গালমায়ীর সঙ্গে একনাগাড়ে দুইঘণ্টা আলাপ করিতেন। স্বপ্নাদিষ্টা হইয়া ঠাকুরকে তিনি একটি রূপার বাঁশী গড়াইয়া দিয়াছিলেন কাশীর শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমে।

রাণী (সর্বমঙ্গলা) ঠাকুরের ভক্ত নবগোপাল ঘোষের পৌত্রী। বার তের বছর বয়সে তাহার বিবাহের দিন নির্ধারিত করিয়া তাহার ঠাকুরমা শ্রীমতী নিস্তারিণী তাহাকে সঙ্গে নিয়া বেলুড় মঠে যান, মহারাজের অনুমতি ও আশীর্বাদ গ্রহণ কবিবার জন্য। নিস্তারিণী ঠাকুরের বিশিষ্ট স্ত্রীভক্তগণের অন্যতমা, এবং মহারাজের উপর অত্যন্ত প্রীতিসম্পন্না। রাণীর বিবাহের আয়োজন হইতেছে জানিয়া, 'ঠিক আছে' বলিয়া, মহারাজ সস্নেহে মেয়েটির পিঠ চাপড়াইয়া আশীর্বাদ করিলেন, এবং তাঁহারা চলিয়া যাইতেই মহাপুরুষের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, এই মেয়েটির বিয়ে মাত্র হবে, সংসার হবে না। বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়া বাণী আর সেখানে ফিরিয়া যাইতে চাহিল না, এক অজানা ভয়ে সে অভিভূত হইয়া পড়িল এবং ঠাকুরঘবে যাইয়া আর্তকণ্ঠে প্রার্থনা করিল, ঠাকুর, আমাকে রক্ষা কর। নিস্তারিণী আবার মহারাজের কাছে যাইয়া বলিলেন, বিয়ে তো হল মহারাজ, কিন্তু রাণী যে শ্বশুরঘরে যেতেই চায় না! মহাবাজ উত্তব দিলেন, আপনার তো শরীর খারাপ হয়েচে, ঠাকুরসেবার কাজটি কে করবে? ওই বরাবর আপনার ঠাকুরসেবা করবে। 'আপনি যদি জানতেন ওর সংসার হবে না, আগে কেন আমাকে বল্লেন না?' 'যা হবার ছিল হয়ে গেল—সংস্কার ছিল।'

মন্ত্রদীক্ষা দিয়া রাণীকে মহারাজ নিজের অভয়াশ্রয়ে গ্রহণ করিলেন। তাহার কাহিনী শুনিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন, দেখ মা, সংসারটা হচ্চে ভাজনখোলা, ঠাকুর তোমাকে সংসার থেকে বের করে নিলেন, তা না হলে তপ্ত খোলায় ভাজা ভাজা হতে হত।

সংসারের ভোগসুখে উদাসীন রহিয়া ও বরাবর ঠাকুরসেবা লইয়া থাকিয়া এক অনাড়ম্বর জীবনপ্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে নীরবে, শ্রীভগবানের পাদপদ্ম লক্ষ্য করিয়া।

## (৯) মানুষ চেনা

ভিতরের মানুষ বাহিরের অঙ্গলক্ষণে ধরা পড়ে। প্রাচীন ভারতে মনুষ্য-চরিত্র বিচারের শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে লক্ষণশাস্ত্র বা সামুদ্রিক বিদ্যার বহুপ্রচলন ছিল। কাহাকেও শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবার পূর্বে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন যোগদৃষ্টি দ্বারা তাহার ভূতভবিষ্যৎ দেখিয়া লইতেন, তেমনি আবার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত অঙ্গলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া তাহার সংস্কারসমষ্টি নিরূপণ করিতেন। উভয় প্রকারে দেখিয়া লইবার ফলে তিনি যাহার সম্বন্ধে যেরূপ উক্তি করিতেন তাহা কখনও নিষ্ফল হইতে দেখা যায় নাই। ঠাকুরের এই শক্তির উত্তম উত্তরাধিকারী ছিলেন মহারাজ।

জন্মান্তরীণ সংস্কার প্রত্যক্ষ করা, কেবলমাত্র অঙ্গলক্ষণ দেখিয়া সাধারণ আচার্যগণের পক্ষে সম্ভব নহে। আর তাহা নহে বলিয়াই সংস্কার প্রত্যক্ষ করার শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে প্রাচীন আচার্যেরা ফলিত জ্যোতিষের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। উহার সাহায্যে তাঁহারা অভ্রান্তরূপে লোকের ইষ্টনিরূপণও করিয়া দিতেন। ঐ দুই বিদ্যাকে একান্তভাবে অবহেলা করার ফলে স্বল্পদিনের মধ্যে ধর্মসংঘের ত্যাগভিত্তির মূলে ফাটল ধরে; অপরাবিদ্যাসম্পন্ন অভ্যুদয়-কামীরা সংঘে অনুপ্রবেশের সুযোগ লাভ করিয়া উহাকে কলুষিত করে। বৌদ্ধযুগ হইতে ভারতের ধর্মসম্প্রদায়গুলি এইরূপ বহু অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত সাবধান হইতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সম্প্রদায়বৃদ্ধির বা অন্যবিধ স্বার্থসিদ্ধির মোহও নির্বিচারে যাহাকে তাহাকে ত্যাগী-সংঘে গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করে। মহারাজের এই মোহ ছিল না।

যাহাকে অপর সকলে ভাল বলে না তাহাকেও মহারাজ যথেষ্ট খাতির করেন, আবার যাহাকে একবাক্যে সকলেই ভাল বলে তাহাকেও আমল দিতে চাহেন না, এমন দেখা গিয়াছে। তিনি বলিতেন: এমন অগভীর জল আছে যাহা দেখিতে খুবই পরিষ্কার, কিন্তু একটা ছাগল চলিয়া গেলেও ঘোলা হইয়া যাইবে। আবার এমন জল আছে যাহার উপরে হয়তো একটা ময়লা আবরণ পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু তলাটা যেমন গভীর তেমনই পরিষ্কার; উপরের

আবরণ কিছুতেই উহার তলার নির্মলতাকে নষ্ট করিতে পারে না। নিজের এক সেবক সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, এর মনের অনেকগুলি স্তর আছে।

পা খোঁড়াইয়া চলে, দেহযন্ত্র বিকল ও বাগ্‌যন্ত্র কিয়ৎপরিমাণে অসাড়, এমন এক যুবককে, শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য হওয়া সত্ত্বেও, মঠের প্রায় সকলেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত এবং 'খুড়ো' সম্বোধনে আপ্যায়িত করিত। মহারাজ কিন্তু বলিয়াছিলেন, তাহার আধ্যাত্মিক ধারণাশক্তি আছে।

বিদেহানন্দের বন্ধু প্র— যেমন বিদ্বান তেমনি বিনয়ী ছিলেন। প্রত্যেক রবিবার তিনি মঠে আসিতেন। বাবুরাম মহারাজ তাঁহাকে খুবই আদরযত্ন করিতেন, আর তিনিও বাবুরাম মহারাজকে অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন। মহারাজ তখন কাশীতে, বাবুরাম মহারাজ তাঁহার কথা প্র—কে শুনাইতেন। সাধুদিগকে বলিতেন, এইরকম ছেলেই তো চাই ; ঠাকুরের ভাব প্রচারের জন্য এরকম গুটিকতক বিদ্বান বিশ্বাসী ছেলে মঠে আসে তো বেশ হয়।

মহারাজ মঠে আসিবার পরে বাবুরাম মহারাজ একদিন তাঁহাকে প্র—র কথা শুনাইলেন। মহারাজ কহিলেন, বেশ তো, ছেলেটিকে আগে দেখি, পরে যা হয় হবে। ইহার পরে যেদিন প্র— মঠে আসিলেন, বাবুরাম মহারাজের ভারী আনন্দ। একপ্রকার ঠেলিতে ঠেলিতেই তাঁহাকে দোতলায় মহারাজের কাছে লইয়া গেলেন ও বলিলেন, এরই নাম প্র—, এম-এ পাশ করে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হয়েচে, বেথা করে নি, ভারী চমৎকার ছেলে! প্র— লাজুক প্রকৃতির মানুষ, আত্মপ্রশংসা শুনিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন, কোনরকমে মহারাজের পায়ের ধূলা লইয়া পলাইতে পারিলেই যেন বাঁচেন। দুইচারিটি কথার পর, মহারাজের আদেশে তিনি ঠাকুরঘরে প্রণাম করিতে গেলে বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, ছেলেটিকে তোমার কৃপা করতেই হবে ; কেমন, খুব ভাল ছেলে নয়? মহারাজ বলিলেন, হ্যাঁ, ছেলেটি মন্দ নয়, তবে অত ব্যস্ত হলে চলবে কেন? অষ্টম কষ্টম আগে কাটুক, তারপর দেখা যাবে। শুনিয়াই বাবুরাম মহারাজ গম্ভীর হইয়া গেলেন।

মহারাজের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি কি সেইদিন প্র—র অব্যক্ত বাসনারাশিকে

তাঁহার নিজের কাছেও ব্যক্ত করিয়া দিয়াছিল? কিছুদিন পরেই শোনা গেল, তিনি বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছেন। অনেক দিনের মধ্যে তাঁহাকে মঠে আসিতে দেখা যায় নাই।

মহারাজ তখন পুরীতে আছেন শশীনিকেতনে (জুন, ১৯১৭)। একটি শ্যামবর্ণ ফিট্‌ফাট্‌ যুবক ছোট একটি সুটকেস হাতে করিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরে কান্তি, হঠাৎ তুই যে এলি?—কী ব্যাপার? যুবকটি বেশ একটু আবেগের সহিত উত্তর দিলেন, মহারাজ, আমি বেশ বুঝতে পেবেচি এ সংসাবটা কিছুই নয়, ত্যাগের পথই শ্রেষ্ঠ পথ; আমি সব ছেড়েছুঁড়ে চলে এসেচি, আমায় আপনি সন্ন্যাস দিন! 'সে হবে এখন। তুই মুখ হাত ধুয়ে স্নান করে নে। সারারাত ট্রেণে এসেচিস, ঘুমটুম হয় নি, বোধ হয় কিছু খাসও নি।' 'ঠিক মহারাজ। আজ সাতআট দিন ধরে আমার এমন একটা অবস্থা চলচে—ঘুম হয় না, খেতে শুতে বেড়াতে সুখ নেই, কিছুই ভাল লাগে না। এবার আমি আপনার কাছ থেকে সন্ন্যাস নেবই।' মহারাজেব ইঙ্গিতে সেবক কান্তিকে অন্দরমহলে লইয়া গিয়া জলযোগ করাইলেন ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ইনি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কান্তিচন্দ্র ঘোষ।

পরদিন সকালবেলা হাতমুখ ধুইয়া কাছে আসিতেই কান্তিকে মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, কিরে কাল ঘুমটুম হয়েছিল? 'তোফা একচোট ঘুমিয়ে নিয়েচি মহারাজ। কদিনের মধ্যে এমন ঘুম আর হয় নি।' 'বেশ বেশ, তাহলে আজই যাচ্চিস তো?' নিজেব লম্বা চুলে দুইএকবার হাত বুলাইয়া, ঘাড় চুলকাইতে চুলকাইতে কান্তি কহিলেন, আচ্ছা মহারাজ, আজ সন্ধ্যার ট্রেনেই তাহলে যাই।

কান্তিবাবুকে আর কখনো মহারাজের কাছে আসিতে দেখা যায় নাই। কয়েক বৎসর পরে একটি পাশ্চাত্য মহিলাকে তিনি বিবাহ করেন ও বাঙ্গলা পদ্যে 'ওমরখৈয়াম' অনুবাদ করিয়া যশস্বী হন।

পবিত্রনাথ দাস নামে শ্রীহট্টের এক মধ্যবিত্ত জমিদার সদ্‌গুরুর সন্ধানে

বাহির হন এবং কলিকাতায় আসিয়া মহারাজের কাছে যাতায়াত করিতে থাকেন। কিন্তু কয়েকদিন দেখিয়াও মহারাজকে তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। কোন্ জায়গার দইটি ভাল, কুঁচো চিংড়িতে আর কিসে অম্বলটি বেশ জমে, ইত্যাদি যত রাজ্যের বাজে কথা ব্যতীত আর কিছুই তাঁহার মুখে শুনিতে পাইলেন না। ইহাতে পবিত্রবাবু কিছুটা দুঃখবোধ করিয়া থাকিবেন। অন্তর বুঝিয়া মহারাজ কহিলেন, এখনো সময় হয় নি, দেশে গিয়ে দশের যাতে উপকার হয় সেইসব কাজ করুন। পবিত্রবাবু তাঁহার উপদেশ পালন করিয়াছিলেন।

একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে শোকার্ত পিতা, পূর্ববঙ্গের এক ধনী ব্যবসায়ী, স্বোপার্জিত মোটা টাকার সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করিয়া সস্ত্রীক বানপ্রস্থাশ্রয়ী হইবার সঙ্কল্প করেন। সাধুদের অনেকেই ঐ সম্পত্তি গ্রহণের পক্ষে ছিলেন। কারণ, মিশনের রিলিফ কাজের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে অনেক সময়েই বেগ পাইতে হইত। সেই ভদ্রলোককে মহারাজ চিনিতেন, এবং তাঁহার মানসিক অবস্থা ও সংকল্পের কথা শুনিয়াই বলিয়াছিলেন, এ মর্কটবৈরাগ্য, স্থায়ী হবে না। সাক্ষাতে তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, মিশনের কাজে আপনি যেমন সময়ে সময়ে সাহায্য করে আসচেন তাই করবেন; সম্পত্তিটা হস্তান্তর না করে, নিজের আয়ত্তে রেখে, ইচ্ছামত সদ্ব্যয় করবেন; তাতে অধিক তৃপ্তি পাবেন। মহারাজের পরামর্শ অনুযায়ী চলাই ভদ্রলোক শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন এবং এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া পূর্ববৎ সংসার করিতে লাগিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সহিত জড়িত বা উহার নেতৃস্থানীয় অনেকে বেলুড় মঠে যোগদান করিয়া সন্ন্যাসী হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহারাজ অনুমোদন না করায় তাঁহাদের কাহারো কাহারো সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইতে পারে নাই। পরে দেখা গেল তাঁহারা বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমী হইয়াছেন।[১]

---

১ দৈনিক বসুমতীর ভূতপূর্ব সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উঁহাদের অন্যতম। তিনি কিছুদিন মায়াবতী অদ্বৈতাশ্রমে বাসও করিয়াছিলেন। একথা সুবিদিত যে, আবাল্য

ডাক্তার কাঞ্জিলাল তাঁহার এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় ছেলেকে সঙ্গে নিয়া বসু-ভবনে আসেন। ছেলেটির বয়স নাকি চৌদ্দ বছর, কিন্তু সে দেখিতে বিশ বছরের যুবকের মত, ভারী প্রিয়দর্শন। মহারাজ তাহার পরিচয় নিলেন। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, সবুজপর্দায় ঢাকা অনুজ্জ্বল বিজলীবাতি ঘরে জ্বলিতেছে। ডাক্তারকে মহারাজ কহিলেন, কাল সকালে একবার ছেলেটিকে নিয়ে এসো তো, আমি ভাল করে দেখব। ছেলেটি আসিলে মহারাজ তাহাকে ঘরে লইয়া গিয়া তাহার সমুদয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিলেন। পরে তাহাকে বিদায় দিয়া ডাক্তারকে বলিলেন, যা ভেবেছিলাম তাই ; ভারী খারাপ সব চিহ্ন দেখলাম ; এই রকম লোক চোর বদমাস খুনে ডাকাত হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যেই পরপর অনেকগুলি ঘটনায় মহারাজের কথা সত্য প্রমাণিত হইয়াছিল।

কলিকাতা হইতে ভুবনেশ্বরে আসিয়া ম—বাবু মঠের নিকট একটা বাড়ীতে আছেন, সস্ত্রীক তিনি দুই বেলাই মহারাজকে দর্শন করিতে আসিতেন। একদিন সন্ধ্যার পর গিন্নী একাই আসিলেন, এবং কতকগুলি আজেবাজে কথা বলিতে ও অনেকরকম প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। হঠাৎ মহারাজ সেবককে বলিলেন, ওরে, তুই একটা লণ্ঠন হাতে করে একে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আয়। গিন্নীকেও বলিলেন, তুমি এস বাছা, বিশ্রী বুনো জায়গা, বাঘটাগের উৎপাতও বেশ আছে—ঐ শোন না, বাঘ ডাকচে। সত্যই তখন গোবাঘ বা হায়না ডাকিতেছিল। গিন্নী ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন, সেবক তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া মহারাজের কাছে বসিলেন। নিঝুম রাত, ঝিল্লীরব ও মাঝে মাঝে হায়নার অট্টহাসি দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছিল। তামাক খাইতে খাইতে মহারাজ বলিতে লাগিলেন ঃ ম—বাবু লোকটি বেশ ভাল, গিন্নীটি ভারী চঞ্চল—ওর কোন মতের বা ভাবের ঠিক নেই। সব ঘাট ঘুরে বেড়ায়। ভুবনেশ্বরে যত আখড়া আর মঠ আছে, সব জায়গায় মোহন্ত

---

স্বামিজীর ভাবে ভাবিত নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সাধু হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহারাজ তাঁহাকে এই বলিয়া নিবৃত্ত করিয়াছিলেন : তোমার সাধু হওয়া চলবে না, তোমাকে দেশের কাজ করতে হবে।

সাধুদের কাছে গিয়ে বসবে আর বকবক করে বকবে। একটা কথা মেনে চলতে পারে না, হাজার কথা শুনে বেড়াবে। একটা জিনিস হজম হয় না, হাজার গণ্ডা জিনিস পেটে পূরবে। এদের ধর্মকর্ম কিছুই হয় না, যারা কেবল চেখে চেখে বেড়ায় তাদের কিছুই হয় না। কতরকম লোকই না এ সংসারে দেখা যায়, সে জন্যে খুব সাবধানে থাকতে হয়।

একজনের স্ত্রী মহারাজের কাছে আসিয়াছেন স্বামীর নিন্দা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া। তিনি কিছু বলিবার আগেই মহারাজ তাঁহার স্বামীর বহু প্রশংসা করিয়া কহিলেন, শিবতুল্য লোক।

মহারাজ বলিতেন: এমন কতকগুলো মানুষ আছে যারা না ঘরকা, না ঘাটকা। বিবাহ করবে না, সংসারের সুযোগ সুবিধা নেবে, সংসারের ভিতর থাকবে। আবার মাঝে মাঝে এসে সাধুসঙ্গ করবে, ধর্ম সম্বন্ধে বড় বড় প্রশ্ন করবে, আশ্রমের সুযোগ সুবিধা নিয়ে আবাব সংসারে যাবে। এরকম লোকের জীবন ভয়ঙ্কর।

নোয়াখালী-শিলচর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে রিলিফ কার্য পরিচালনায় ভূমানন্দ যখন ব্যস্ত ছিলেন, গণেন্দ্রনাথ, ছক্কু প্রভৃতি কয়েকজন তাঁহার বিরুদ্ধে নানাকথা শরৎ মহারাজের কানে তুলেন! তাহাতে শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, যা যা, ফেলে দে; বৃহৎ কাজ করতে গেলে দুচারটা অমন হয়ে থাকে। কাজ শেষ করিয়া ভূমানন্দ ফিরিয়া আসিলেন যখন, কিরণ দত্ত মহাশয় উইডো হোম (বিধবাশ্রম) স্থাপনের প্রস্তাব লইয়া মহারাজের কাছে আসেন। মহারাজ তখন উদ্বোধনে, প্রস্তাবটি শুনিবামাত্র ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, উইডো হোম করতে গেলে তো পাশে একটা অর্ফেনেজও (অনাথাশ্রমও) খুলতে হবে, কী বলেন কিরণবাবু? তারপরে খানিক থামিয়া, গম্ভীর হইয়া কহিলেন: কে কাজ করবে? আপনারা তো আসবেন না; আর আমাদের তো মেয়ে কর্মী নাই। যাকে পাঠাব তার বদনাম দিতে আপনারা তো কসুর করবেন না। এই দেখুন না, আমাদেরই এক কর্মী, যে নাকি সেবাকাজে প্রাণপাত করে এল, তার নামেই কত কী বলচে—(ভূমানন্দকে অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া) এই দেখুন না!

সকালবেলা কুটনো কোটার সময় মহারাজ একদিন বেলুড় মঠের সাধু-দিগকে বলিলেন, তোমরা সবাই একটা করে আলু ছাড়িয়ে, সেগুলি একত্র করে আমার কাছে নিয়ে এস ; আমি আলু দেখে কার ঠিকঠিক ধ্যান হয় বলে দেব ! সকলেই আলু ছাড়াইতে বসিয়া গেলেন। যখন ছাড়ানো আলুগুলি একটা পাত্রে রাখিয়া মহারাজের সম্মুখে আনিয়া ধরা হইল, তিনি একবারমাত্র দৃষ্টিপাত করিয়াই একটা আলু হাতে নিয়া বলিলেন, এই আলুটি যে ছাড়িয়েচে, কেবল তারই ঠিকঠিক ধ্যান হয়। সেই আলুটি ছাড়াইয়াছিলেন সুধীর মহারাজ ( শুদ্ধানন্দ )।[২]

কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ তাঁহার শিষ্যা রানুকে কহিলেন—রানুকে তাঁহার এক সেবক মাতৃসম্বোধন করিতেন—তোমার ছেলেটি বেশ, সবই ভাল, তবে ঐ একটু যা রাগালু, একটু কামালু। তোমার ছেলের ঐ যে বড় নাক দেখচ, বিয়ে করলে অত বড় নাক আর থাকত না, খাঁদা হয়ে যেত ! বিস্মিত হইয়া রানু প্রশ্ন করিল, কেন মহারাজ, বিয়ে করলে নাক কেন খাঁদা হয়ে যেত ? মহারাজ বলিলেন, খৎ দিতে দিতে।

## ( ১০ ) শাসন ও শোধন

মুক্তেশ্বরানন্দের বর্ণনা :

সনৎ তখন খড়দহ হইতে আসিয়া মাঝে মাঝে মঠে থাকিত। বাবুরাম মহারাজ তাহাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু মহারাজ মোটেই পছন্দ করিতেন না। পরে পুরীতে অসুস্থ হরি মহারাজকে সেবা করিতে দেখিয়া মহারাজ তাহার উপর প্রসন্ন হন। আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, দেখচিস, সনৎ হরি মহারাজের কিরকম সেবা করচে ! এত গালাগাল খায়, বারবার তাড়িয়ে দিচ্চেন, তবুও মুখটি বুঁজে থাকে—একেই বলে সেবা।

২ ধর্মানন্দ-কথিত।

ঠাকুরের উৎসব হইয়া গিয়াছে। সনৎ আসিয়া বলিল, চল আমরা কয়েকজন একসঙ্গে নৌকায় করে খড়দা যাব, সেখানে শ্যামসুন্দরকে ভোগ লাগিয়ে প্রসাদ পাওয়া যাবে। মহারাজের অনুমতি লওয়া হইল। ঠিক হইল, সনৎ, শচীন, সতীশ, চ্যাপ্টা নগেন,—দুই নগেনের পার্থক্য বুঝাইবার জন্য 'মোটা' ও 'চ্যাপ্টা' দুই সার্থক বিশেষণ!—কালা ডাক্তার, তারিণী ও আমি এই সাতজন খড়দহে যাইব, এবং বিগ্রহ দর্শনাদি করিয়া ও প্রসাদ পাইয়া সন্ধ্যার দিকে ফিরিব। মঠের জলী বোটে আনন্দ করিতে করিতে খড়দহে পৌঁছিলাম ও সনৎদের বাড়ীতে বসিয়া প্রসাদ পাইলাম। তারপর নিজেদের মধ্যে কথা হইল, হালিশহরে গিয়া রামপ্রসাদের ভিটা দেখিয়া আসা যাউক। শচীন ও সনতের উৎসাহ সমধিক। হালিশহরে নৌকা লাগাইয়া রামপ্রসাদের ভিটা দেখিয়া আসা হইল, আর তারপরেই বাঁশবেড়িয়া গিয়া হংসেশ্বরী দর্শনের প্রবল ইচ্ছা সকলকে পাইয়া বসিল। সনৎ হাল ধরিয়াছে, ছয়খানা দাঁড় একসঙ্গে উঠিতেছে ও পড়িতেছে, তীরবেগে নৌকা ছুটিয়াছে। বাঁশবেড়িয়ায় দর্শনাদি সারিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। এখানেই দর্শনেচ্ছার নিবৃত্তি হইলে ভাল হইত, কিন্তু তাহা হইল না, মঠে ফিরিয়া যাওয়ার কথা কাহারই যেন মনে পড়িতে চাহিল না, সকলে ত্রিবেণী দর্শন করিতে ছুটিলাম। কিন্তু সেই রাত্রে ত্রিবেণী পৌঁছা সম্ভব হইল না, মাঝপথে ভীষণ ঝড় ও বৃষ্টি দেখা দিল। বাধ্য হইয়া এক ঘাটে নৌকা বাঁধিলাম—পুরাতন কালের ঘাট, সিঁড়িগুলি সবই ভাঙ্গা, ঘাটের উপরে এক বটগাছ ও এক ভগ্ন মন্দির। সেইখানেই কোনরূপে রাত কাটাইলাম।

সকলেরই কাপড় জামা একেবারে ভিজিয়া গিয়াছিল, গায়ে থাকিতে থাকিতে শুকাইয়াছে। ভোর হইতে না হইতে ত্রিবেণীর দিকে ধাওয়া করিলাম। ত্রিবেণী পৌঁছিয়া স্নান করা হইল বটে, কিন্তু খাবার বিশেষ কিছু জুটিল না। সঙ্গে যে প্রসাদ খড়দহ হইতে আনা হইয়াছিল মঠে লইয়া যাইবার জন্য, গত রাত্রেই সেটা ভাগ করিয়া সকলে একটু একটু খাইয়াছিলাম। সেই প্রসাদের যৎকিঞ্চিৎ অবশেষে এখন মুখে দিয়া পিত্তরক্ষা করিলাম। ঠিক এই

সময়ে, সম্ভবতঃ ত্রিবেণীস্নানে মাথা ঠাণ্ডা হওয়ায়, মঠে ফিরিবার কথা সকলেরই মনে উদিত হইল। তাড়াতাড়ি কালা ডাক্তার ও চ্যাপ্টা নগেনকে রেলে ফিরিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। দাঁড় টানিয়া ত্রিবেণী হইতে রিষড়া পর্যন্ত আসিতেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, নৌকা যেন আজ চলিতেই চায় না! অনাহারে ও অনিদ্রায় শরীর অবসন্ন, মঠে ফিরিয়াই কঠোর শাস্তি পাওয়ার ভয়ে মন সন্ত্রস্ত। রিষড়ায় আমাকে ও তারিণীকে নামাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু সেই রাত্রে ট্রেণ ধরিতে পারা গেল না, শেষখানিও চলিয়া গিয়াছে। একটু আশ্রয় লাভের আশায় যাহারই বাড়ীতে যাই, সেই দূরদূর করিয়া তাড়াইয়া দেয় 'স্বদেশী' জ্ঞান করিয়া। শেষকালে জঙ্গলের মধ্যে এক পড়ো মেটে ঘর দেখিতে পাইয়া সেই ঘরেই দুইজনে রাত কাটাইলাম, এবং অন্ধকার থাকিতেই হাঁটিয়া রওনা দিলাম।

ইটখোলার ভিতর দিয়া আসিয়া পশ্চিমদিকের খিড়কীর দরজা দিয়া মঠে ঢুকিতেছি, মহাপুরুষ হাতমাটি করিতেছিলেন, দেখিতে পাইয়া বলিলেন, যাও, মহারাজ এমন চটে আছেন যে মজা টের পাবে। ভয়ে ভয়ে যখন মঠের প্রাঙ্গণে আসিয়াছি, মহারাজ উপর হইতে নামিয়া আসিতেছিলেন বেড়াইতে যাইবেন বলিয়া, আমাদিগকে দেখিয়াই রাগে ফাটিয়া পড়িলেন। অনেক বকুনি দিয়া শেষকালে কহিলেন: তোমরা মঠ থেকে বেরিয়ে যাও। তোমরা কি আমাদের হাতে দড়ি দেওয়াবে? এই বুড়োবয়সে আমাদের জেলে পূরতে চাও?[১] (ছক্কুকে ডাকিয়া) ছক্কু, এদের যা জিনিসপত্র আছে এখানেই এনে দাও। এরা আর ঘরে ঢুকতে পাবে না, বাইরে থেকেই চলে যাবে।

ছক্কু তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিল, আমাদের জিনিসগুলি, কতই বা ছিল, পোঁটলা করিয়া আনিয়া একেবারে আমাদের বগলে গুঁজিয়া দিল। চলিয়া যাইবার সময় আমরা মহারাজের পা ছুঁইয়া প্রণাম করিলাম। পা ছুঁইতে আপত্তি না করায় বা পেছনে হটিয়া না যাওয়ায় তিনি অন্তরে বিরূপ বলিয়া

১ সতীশকে তখন নিত্য থানায় হাজিরা দিতে হইত, শচীনকে পুলিশ আসিয়া দেখিয়া যাইত।

কিন্তু মনে হইল না। আমি হাতজোড় করিয়া, পোঁটলাটা বগলেই আছে, বলিলাম, মহারাজ, এবারকার মত আমাদের ক্ষমা করুন, আর এরকম করব না। গম্ভীরভাবে খানিক চুপ থাকিয়া মহারাজ বলিলেন, আচ্ছা বেশ, এবার ক্ষমা করলুম। আর যদি কখনো অমন কর তা হলে একেবারে তাড়িয়ে দেব। তাঁহাকে আর একটি প্রণাম করিয়া ঘরে ঢুকিলাম ও পোঁটলা বগল হইতে নামাইলাম। ঘর হইতে শুনিতে পাইতেছি, মহারাজ বলিয়া চলিয়াছেন: তাদের মাথার উপর যে খড়্গ ঝুলচে দেখতে পায় না? আগে আসুক, তারপর কেলে শালাকে দারোয়ান (ছক্কু)[২] দিয়ে জুতো মারতে মারতে তাড়িয়ে দেব। বাবুরাম মহারাজ যত সব আজেবাজে লোককে মঠে স্থান দিয়েচে! আবার বলে কিনা, তুমি যাদের ভাল মনে কর তাদের রাখ, বাকি সব বিদায় কর। রাখবার বেলা তুমি, বিদায় করবাব বেলা আমি![৩]

বাবুরাম মহারাজ একএক বার গঙ্গার ধারে যাইয়া দেখিতে লাগিলেন উহারা ফিরিয়া আসিতেছে কিনা। বেলা দশটা নাগাত উহাদের নৌকা দেখিতে পাইয়া সিঁড়ি বাহিয়া গঙ্গায় নামিয়া গেলেন ও সনৎকে বলিলেন, নৌকো বেঁধে রেখে তুই এক্ষুনি বাড়ী চলে যা। সতীশকেও মহারাজের সাক্ষাতে যাইতে মানা করিলেন। শচীন কিন্তু কিছু মাত্র ভয় বা সঙ্কোচ না করিয়া একেবারে মঠের ভিতরে চলিয়া আসিলেন। মহারাজ তখনো উঠানে আছেন—একবার বসিতেছেন, দুইএক বার তামাক টানিয়াই আবার উঠিয়া পায়চারি করিতেছেন, মুখ অতি গম্ভীর। শচীন তাঁহাকে প্রণাম করিয়াই বলিলেন, মহারাজ, আমিই দোষী, আমিই এদের উৎসাহ দিয়ে দিয়ে ত্রিবেণী পর্যন্ত নিয়ে গেছি। যা শাস্তি দিতে হয় আমাকে দিন, ওদের ক্ষমা করুন। মহারাজ তাঁহার আপাদমস্তক চাহিয়া দেখিলেন—ঋজুকায় উন্নত পুরুষ, স্বদেশের শৃঙ্খলমোচনে যে একদিন আত্মবলি দিতে গিয়াছিল, সতীর্থগণের হইয়া সেই এখন শাস্তিভোগ করিতে চাহিতেছে! মহারাজ বলিয়া উঠিলেন,

---

২ মঠে তখন দারোয়ান ছিল না। ৩ বাবুরাম মহারাজ বলিতেন, ম্যালেরিয়ার সময় কেহ মঠে থাকিতে চাহিত না, কাজ চালাইবার জন্য যাহাকে তাহাকে রাখিতে হইত।

না না, তুমি দোষী হতে যাবে কেন? আমি জানি ঐ কেলে শালাই নষ্টের গোড়া, ওটা গেল কোথায়? 'না মহারাজ, ওদের কোন দোষ নাই, সত্যিই আমি দোষী।' 'আচ্ছা যাও যাও।' মহারাজ শান্ত হইয়া গেলেন, এই ব্যাপারের এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটিল।

ত— তখনো সন্ন্যাসী হন নাই, কয়েক মাস মঠে বাস করিতেছেন। তিনি ভাল গাহিতে পারেন, সঙ্গীতজ্ঞ লোক; মহারাজ তাঁহাকে 'ওস্তাদ' সম্বোধন করিতেন। একদিন সকালে ত— প্রণাম করিয়া বলিলেন, শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে কলিকাতা যাইবেন। মহারাজ কহিলেন, বেশ, মায়ের জন্যে একসাজি ফুল নিয়ে যাও, তুমি নিজে হাতে করে নিয়ে গিয়ে আমার নাম করে মাকে দেবে। তাঁহার আদেশে একজন ফুল তুলিয়া দিল। অপর একজন লোক সঙ্গে, ত— বাগবাজার যাইবার জন্য গহনার নৌকা ডাকিলেন। এমন সময় তাঁহার মনে পড়িল, কোন একটি জিনিস সঙ্গে নিতে হইবে, আনা হয় নাই। তখনই সাজিটা সঙ্গীর হাতে দিতে গেলেন, অনবধানতাবশতঃ নীচে পড়িয়া গেল ও ফুলগুলি ছড়াইয়া পড়িল। দোতলার বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে মহারাজ দেখিতে পাইলেন এবং ত—কে ডাকাইয়া আনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গালাগাল করিলেন। তাঁহাকে আর মায়ের বাড়ীতে যাইতে দিলেন না, আবার ফুল তুলাইয়া আর একজনকে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। পক্ষকাল তিনি ত—র প্রতি এতই বিরূপ হইয়া রহিলেন যে, তাঁহার কাছে আসা পছন্দ করিতেন না, প্রণাম নিতে চাহিতেন না। ত—র মর্মপীড়া চরমে পৌঁছিল, ঠিক করিলেন গভীর রাত্রে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া দেহ বিসর্জন করিবেন। মহারাজের বিরাগভাজন হওয়াকে তাঁহার ঠাকুরের বিরাগভাজন হওয়া জ্ঞান হইতেছিল এবং এই জীবন আর কোনই কাজে লাগিবে না মনে করিতেছিলেন। আরও ভাবিলেন, দেহ বিসর্জনের আগে একটিবার মহারাজকে প্রণাম করিয়া যাইব না? সামনে দেখিতে পাইলেই তো চটিয়া যান, সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার অজ্ঞাতে একটি প্রণাম করিয়াই চলিয়া যাইব। মহারাজের ঘরে ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে, কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না। তিনি ছোট খাটটিতে

বসিয়া আছেন, ত— পাশের ঘরে আস্তে আস্তে ঢুকিয়া, মহারাজের ঘরের দরজার চৌকাটের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলেন। চৌকাটের সম্মুখেই একটি দেরাজ থাকায় মহারাজের দেখিতে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে অতি স্নিগ্ধকণ্ঠে মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, কে, ওস্তাদ? তুমি ভজন গাও না?—তোমার ভজন তো আজকাল শুনতেই পাই না! ত— ঘরে ঢুকিয়া মহারাজের পদস্পর্শ করিলেন, তাঁহার গণ্ড বাহিয়া তখন অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। মহারাজ বলিলেন, সাধুর রাগ জলের দাগ, তা কি চিরকাল থাকে? যাও, নীচে গিয়ে ভজন গাও, আমি এখানে থেকেই শুনব। সহসা সকলেই শুনিতে পাইল, নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মঠের বায়ুমণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিতেছে ত—র সাধা গলার স্বরলহরী।

উপদেশাদি দিয়া মহারাজ তাঁহার শিষ্য ব—র জীবন একভাবে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। ব—র আত্মাভিমান তাহাতে বাড়িয়া উঠে, নিজেকে মস্ত বড় সাধক ভাবিয়া, গুরুর অনুমতি না নিয়াই মঠে যোগ দেয় এবং ব্রহ্মচারীদের মত বস্ত্রাদি পরিধান করিতে থাকে। তাহার আচরণে মহারাজ অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং তাহার প্রতি এমন উপেক্ষার ভাব দেখাইতে থাকেন যে, বাধ্য হইয়া তাহাকে মঠ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। সে বিবাহ করে কিন্তু বিবাহের ফলে তাহার জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে এরূপ জ্ঞান করিতে থাকে। অনেক অনুযোগ করিয়া মহারাজকে সে পত্র লেখে, মহারাজ তখন মাদ্রাজে। ব—কে তিনি মাদ্রাজ মঠে আসিয়া দুর্গাপূজা দেখিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং সে আসিলে বলিলেন, বিয়ে করেচ তো কী হয়েচে? একশটা বিয়ে করলেও তোমার কোন ভয় নাই। মহারাজের আশীর্বাণী পরেও সে পাইয়াছে, তথাপি বিমর্ষভাবটা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই, এবং এক দুর্বল মুহূর্তে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া দেহত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া বসে। যেদিন সে ঐ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবে সেইদিন সকাল হইতেই মহারাজ তাহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন, যে আসে তাহাকেই ব—র কথা জিজ্ঞাসা করেন, আর যেরূপেই হউক তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহার খবরটা আনিতে বলেন। অনেক খোঁজ করিয়াও

সেদিন কেহ ব—র সন্ধান পাইল না। মহারাজ বলিয়াছিলেন, সেদিন তিনি শাঁখারীটোলায় যাইবেন এবং সেখানে গানের যে ছোট আসরটি বসিবে তাহাতে ব—কেও গাহিতে হইবে। সন্ধ্যার মুখে, যাঁহাদিগকে মহারাজ একথা বলিয়াছিলেন তাঁহাদের একজন মোটরগাড়ী করিয়া চাঁদপাল ঘাটের দিকে যাইতে যাইতে ব—কে গঙ্গার ধারে গাছতলায় হেঁটমুখে চিন্তামগ্নভাবে বসিয়া থাকিতে দেখেন ও জোর করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া শাঁখারীটোলায় মহারাজের কাছে লইয়া যান। তাহাকে দেখিয়াই মহারাজ বলিতে লাগিলেন, আমি তোমাকে সকাল থেকে খুঁজচি, কেউ কোথাও তোমার দেখা পায় না— তোমার গান এখানে সবাই শুনবে। ব— হাত জোড় করিয়া, চোখে জল ঝরিতেছে, কিছু বলার উপক্রম করিতেই কহিলেন, আচ্ছা, হবে হবে, তোমাকে শুকনো দেখচি, আজ বুঝি কিছু খাও নি? প্রচুর প্রসাদী ফল ও মিষ্টান্ন আনাইয়া মহারাজ তাহাকে খাওয়াইলেন। ব—র বিমর্ষভাব পরে কাটিয়া গিয়াছিল।

হৃষীকেশে তপস্যা করিয়া মহারাজের শিষ্য ক— মঠে ফিরিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, তোর মুখের দিকে চাইতে পারচি না। হৃষীকেশে তপস্যা করে কী হল তোদের?—হৃষীকেশী ঢঙ্‌গুলো শিখেচ, আর চরিত্রটি বিসর্জন দিয়ে এসেচ! এই ব্যাপারের জের দুইদিন চলিল। মহারাজ বলিতেছিলেন: বরং যারা এখানে থাকে, কাজকর্মের সঙ্গে জপধ্যান করে, ঠাকুরসেবা করে, তাদের ঢের ভাল দেখচি। সাধু হওয়া বড় কঠিন, ভগবদ্ভাবে ডুবে না থাকতে পারলে বহির্মুখী বৃত্তি বেশী জেগে ওঠে—কেউ পাগল হয়ে যায়, কেউ আত্মহত্যা করে, কেউ চরিত্রভ্রষ্ট হয়, কেউ বা টাকা-কড়ির জন্যে মুখে ভক্তির বা জ্ঞানের বুলি আওড়ায়, কিন্তু ভিতরে নাস্তিক হয়ে যায়।

প্রশান্তানন্দের কথা:

মহারাজ তখন কাশীতে, সকালবেলায় অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়া উঠানের জামতলায় খুদ ছড়াইয়া দিতেন, দলে দলে আসিয়া পাখীরা খাইয়া যাইত। একদিন আমাকে খুদ আনিতে বলিলেন। চায়ের ডিশে করিয়া খুদ লইয়া

আসিয়াছি এমন সময় মহারাজের কোন কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিল, আর সেই হাসিতে যোগ দিয়া অন্যমনস্ক হওয়ায় ডিশখানা আমার হাত হইতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। মহারাজ কোন কথা কহিলেন না, কিন্তু গম্ভীর হইয়া গেলেন। ইহার পরে কেহ আমাকে কোন কাজের আদেশ করিলেই মহারাজ বলিয়া উঠিতেন, ওকে বলো না, সব ভেঙ্গে চুরে দেবে। ইহাতে বড়ই অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম, ভয়ে তাঁহার কাছে যাওয়া বন্ধ করিলাম। এইভাবে ১৫।২০ দিন গেল।

একদিন সকালবেলা হলের দক্ষিণপাশের ছোট ঘরটিতে বসিয়া পড়িতেছি দরজা ভেজাইয়া রাখিয়া। এমন সময় বাহির হইতে কেহ দরজার কড়া নাড়িল। পড়ার সময় প্রায়ই মহারাজের উড়িয়া চাকর বুলবুল এইভাবে আমাকে বিরক্ত করিত, সেই কড়া নাড়িতেছে মনে করিয়া বকিলাম। খানিক-ক্ষণ চুপ থাকার পর আবার কড়া নাড়া, আবার আমার বকুনি ঝাড়া, এইরূপ পুনঃপুনঃ হইতে থাকায় উত্যক্ত হইয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়া গালি-গালাজ করিলাম। কড়া নাড়া কিন্তু তাহাতেও বন্ধ হইল না। উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য তখন দরজা খুলিতে গেলাম, কিন্তু বাহির হইতে কড়া টানিয়া ধরায় কিছুতেই খুলিতে পারিলাম না। তখন দরজার এক পাটি পা দিয়া চাপিয়া, সর্বশক্তি দিয়া অন্য পাটি যেমন খুলিতে গিয়াছি অমনি বাহিরের কড়া ছাড়িয়া দেওয়ায় ধড়াস করিয়া পড়িয়া গেলাম, কোমরে ও মাথায় ভীষণ চোট লাগিল। সেই অবস্থায়ও তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দেখি, মহারাজ পেছন ফিরিয়া ফুলবাগানের দিকে চলিয়া যাইতেছেন। কী সর্বনাশ! মহারাজকেই তাহা হইলে এত গালিগালাজ করিয়াছি। ভীষণ ভয়ে দরজা বন্ধ করিলাম, আর কতক্ষণে তিনি সেবাশ্রমে চলিয়া যাইবেন তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি চলিয়া গিয়াছেন মনে করিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই দেখি, তিনি সম্মুখে দাঁড়াইয়া, বলিলেন, কেমন হয়েচে! আর গাল দেবে? দৌড়াইয়া পলাইয়া গেলাম। মহারাজের গাম্ভীর্যের জন্য ভয়ে তাঁহার কাছে যাইতাম না, সেই ভয়টা কিন্তু সেইদিন হইতেই চলিয়া গেল।

# (১১) শিক্ষাদান বিবিধ বিষয়ে

শ্যামানন্দের কথা ঃ

বেলুড় মঠে সেই সময় একজন রামাইত সাধু থাকিত, সে স্বামিজীর মন্দিরের কাছে ধুনি জ্বালাইত ও দিনরাত সীতারাম সীতারাম করিত। সকালে বা সন্ধ্যায় পায়চারি করিতে করিতে মহারাজ যখনই তাহার নিকট দিয়া যাইতেন সে বলিত, তামাক নাই। একদিন বাজারে যাইবার সময় মহারাজ আমাকে বলিলেন, আট আনার গাঁজা কিনে আনবি। বাজার হইতে ফিরিয়া, মহারাজকে দেখিতে না পাইয়া বিপিন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহারাজ গাঁজা আনতে দিয়েচেন, কী করব? ডাক্তার বলিল, ঐ সীতারাম সাধুকে দিগে যা। তাহাই করিলাম। মহারাজ সেকথা শুনিতে পাইয়া আমাকে ভীষণ বকুনি দিয়া বলিলেন, তুই এত বোকা! কাল তুই মঠে খেতে পাবি না, ভিক্ষে করে খেতে হবে, আর ঐ আট আনার গাঁজাও ভিক্ষে করে আনতে হবে। অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার আদেশ পালন করিলাম। তিনি কহিলেন, যা, ছোট ছোট কাগজে যে কটা পারিস পুরিয়া করে আমার ঘরে দেরাজের উপর রেখে দে। যখন যার আদেশে কাজ করবি তখন তাকেই সব কথা জিজ্ঞাসা করবি।

মঠের কাজে দিনমজুরী করিত ভীমেরা চারি ভাই। তাহাদের এক ছোট ছেলে বৃষ্টিতে ভিজিতেছিল গঙ্গার ধারে। মহারাজ পায়চারি করিতে করিতে দেখিতে পাইয়া আমাকে বলিলেন, ছেলেটাকে জল থেকে টেনে নিয়ে আয়। ছেলেটিকে আনিয়া নিজের গামছা দিয়া তাহার গা মুছাইয়া দিতেছি দেখিয়া কহিলেন, ও বেটা দুলে মালার ছেলে, ওরা জলে জলে মানুষ হয়, তোকে আর অত করতে হবে না।

মঠের বাগান হইতে কয়েকটি লিচু হাতে করিয়া লইয়া যাইতেছিলাম। মহারাজ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খুদু, কী নিয়ে যাচ্চ? আমি দেখাইয়া দিলাম। 'কী করবি?' 'খাবার জন্যে নিয়ে যাচ্চি।' 'বেশ, খাবার আগে দুএক ঘণ্টা ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়ে রাখবি।'

মঠে একদিন রাত্রিবেলা নীরদ মজুমদার গাহিতেছিল ও আমি সঙ্গত করিতেছিলাম। উপর হইতে মহারাজ একজনকে দেখিতে পাঠাইলেন কে বাজাইতেছে। সে দেখিয়া বলিল, ও, তুমি! মহারাজের বড় ভাল লেগেচে। বলিতে-না-বলিতে মহারাজও আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়াই নীরদ উচ্চাঙ্গের গান ধরিল, আমিও তবলা ছাড়িয়া দিলাম। আমি শিখিয়ে দিচ্চি, বস্—বলিয়াই মহারাজ তবলা ধরিলেন এবং গানের সঙ্গে বুলি আওড়াইতে আওড়াইতে বাজাইয়া যাইতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি ঝাঁপতাল ও চৌতাল শিক্ষা দিয়াছিলেন, আর সদ্যঃশেখা তাল দুইটি আমাকে দিয়া বাজাইয়াও নিয়াছিলেন।[১]

বাবুরাম মহারাজের জন্মতিথি। কৃষ্ণলাল মহারাজ এক ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে নিয়া, কলিকাতা হইতে রসগোল্লা, সন্দেশ, দই ও রাবড়ি লইয়া আসিয়া বলিলেন, এগুলি ঠাকুরের ভাণ্ডারে রাখ। তোদের পাঁপর বেসন এসব আছে? বেগুনি ভাজতে দিবি? আমি বলিলাম, আমাদের সব আছে, আপনি টাকা দিন। ট্যাঁক হইতে টাকা খুলিতেই ঝনঝন শব্দে মেজেয় পড়িয়া গেল। মহারাজ বেড়াইতেছিলেন, বলিলেন, কিরে, তোদের যে বড় টাকার আওয়াজ দিচ্চে! তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃষ্ণলাল সকল কথা জানাইলেন। প্রতি বৎসর ছেলের জন্মদিনে উৎসব করিবার জন্য বাবুরাম মহারাজের মা কিছু টাকা পাঠাইতেন, কিন্তু বাবুরাম মহারাজ কাহাকেও তাহা জানিতে না দিয়া ঠাকুরসেবা তহবিলে টাকাটা জমা দিতেন। কোনরূপে ইহা প্রকাশ হইয়া পড়ায় যাহাতে ছেলের হাতে টাকাটা না পড়ে মা সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।

---

১ ভুবনেশ্বর মঠের জন্য পাখোয়াজ তৈরি হইয়া আসিয়াছে বসু-ভবনে। ভবানী তাহাতে আটা লাগাইয়া, কেমন হইয়াছে দেখিবার জন্য মহারাজের কাছে লইয়া গেলেন। এখন কি আর পারব?—বলিয়াই তাহাতে চাটি দিয়া বলিলেন, একটা গাও. সুরফাঁক্তা তালে ভবানী গান ধরিলেন, 'সব দুঃখ দূর করিলে…!' সঙ্গে সঙ্গে পাখোয়াজ বাজিয়া উঠিল. কিন্তু খানিকটা গাহিয়াই সেবক পাখোয়াজটি সরাইয়া নিলেন পাছে মহারাজের হাতে বাথা ধরিয়া যায়। তাঁহার সর্বাঙ্গ তখন মাখনের মত কোমল হইয়া গিয়াছিল।

পায়চারি করিতে করিতে মহারাজ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, লাগাও, আজ বাবুরাম মহারাজের জন্মতিথি, ভাল করে পোলাও কর। ভাণ্ডার হইতে আমরা বেসন ও পাঁপর বাহির করিতেছি দেখিয়া কহিলেন, যখন বেগুনি করতে দিবি, বেসনের সঙ্গে কিছু কড়ায়ের ডাল আর চারটি চাল ভিজিয়ে বেটে মিশিয়ে দিবি, আর চারটি পোস্ত ও কালজিরে দিবি—বেশ মচমচে হবে। বাবুরামদার জন্মতিথি—ছানার পোলাও হবে।

মহারাজ যখন মঠে থাকিতেন নিত্য উৎসবের মত হইত, কত ভক্তই যে জিনিসপত্র লইয়া আসিত। একদিন বলিলেন, চিংড়ি মাছ নিয়ে আয়; গোটা কতক নারকেল কুর্, নারকেলের দুধ নিংড়ে, না হয় নারকেল কোরা বেটে ওতে দিবি।

বাবুরাম মহারাজ তখন মঠে নাই, পূর্ববঙ্গে। মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঠাকুরের ভোগ, কিছু নেই, কী রান্না হবে? তিনি বলিলেন, সাধুর সংসার, রান্নার ভাবনা? নিয়ে আয় দেখি তোদের কী আছে। তখন আলুটা কেনা থাকিত আর কুমড়াও শিকায় ঝুলিত। বাগান হইতে শাকপাত যাহা পাওয়া গেল মহারাজ তাহাতেই পাঁচতরকারির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

মঠের নৌকায় বৈদ্যবাটীর হাটে বাজার করতে যাইতাম। সনৎ হাল ধরিত, আমি, ছক্কু, আরও দুইতিন জন দাঁড় টানিতাম। একদিন মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাচ্ছিস? বলিলাম, হাটে যাচ্ছি। 'হাটের গান জানস?' 'না।' 'শোন্—

এ হাটে বিকায় না অন্য সুতো, বিকায় নন্দরাণীর সুতো,…[২]

---

২ বহু অনুসন্ধানেও এই পদটি কাহার রচনা, জানা গেল না। সমগ্র পদটি, রামলালদাদার কন্যা কৃষ্ণময়ী যেমন বলিয়াছেন, নিম্নোক্তরূপ:

এ হাটে বিকায় না অন্যসুতো, বিকায় নন্দরাণীর সুতো, দরটি জেনে নামটি শুনে যার ভয়ে পালায় রবিসুত। এ হাটের যে প্রধান তাঁতী—প্রজাপতি পশুপতি; আর আর যত অন্য তাঁতী তাদের কেবল হয় যাতায়াত। লাল কালো জরদ শ্বেত হয় না যাদের মনঃপূত তারা জুড়ে অকুড় করে বসে, খি হারায় জনমের মত॥

কখন ফিরবি ?' 'বাজার করে ফিরব।' 'জোয়ারের মুখে যাবি, তাড়াতাড়ি বাজার করে নিয়ে, নৌকায় তুলে ভাঁটার মুখে নৌকা ছেড়ে দিবি।'

প্রশান্তানন্দের কথা ঃ পড়াশোনা ছাড়িয়া ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া যখন মঠে যোগ দিতে আসিলাম (১৯১৩), মহারাজের নামে এক পত্র লিখিয়া দিয়া শরৎ মহারাজ আমাকে কাশীতে পাঠাইলেন, সেই পত্রে তিনি আমার পড়াশোনার ও স্বাস্থ্যোদ্ধারের ব্যবস্থা করিবার জন্য লিখিয়াছিলেন। আটদশ দিন সেবাশ্রমে চিকিৎসাধীন থাকিয়া অদ্বৈতাশ্রমে চলিয়া আসি ও বাবুরাম মহারাজের উপদেশে, তিনি তখন কাশীতে আসিয়াছিলেন, অন্নদাচরণ তর্কচূড়মণির চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হইয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে থাকি। রোজ সকালে বেড়াইতে বাহির হওয়ার পূর্বে মহারাজ আমাকে ব্যায়াম শিক্ষা দিতেন। মূলারের বই দেখিয়া ও নিজে করিয়া দেখাইয়া তিনি শিখাইতেন; সেই সঙ্গে নিজের উদ্ভাবিত কয়েকটি ব্যায়ামও শিখাইয়াছিলেন। সঙ্গীতনিপুণ নীরদ মহারাজ চিত্রশিল্পীও ছিলেন, তাঁহাকে দিয়া ব্যায়ামের কতকগুলি চিত্র আঁকাইয়া মহারাজ আমার ঘরে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারই শিক্ষার গুণে সক্ষম থাকিয়া এই বুড়ো বয়সেও কঠোর পরিশ্রম করিতে পারিতেছি।[৩]

---

৩ মহারাজের নিজের একজোড়া ছোট ডাম্বেল ও একজোড়া ছোট মুগুর ছিল, সকালবেলা ধ্যান হইতে উঠিয়াই উহাদের সাহায্যে ব্যায়াম করিতেন। শেষবার শরীর অসুস্থ হওয়ার দিন পর্যন্ত তিনি ব্যায়াম করিয়াছিলেন। সাধুদিগকে বলিতেন, জপধ্যান সেরে, একটু ব্যায়াম করে নিয়ে তোরা ঠাকুরের কাজে লাগবি। বেলুড় মঠে একদিন ব্যায়াম করিয়া উঠিয়াই —নিজের ঘরের দরজা ভেজাইয়া তিনি ব্যায়াম করিতেন—ছক্কুকে সামনে দেখিয়া বলিলেন, কিরে ছক্কু, লড়বি আমার সঙ্গে ? হ্যাঁ মহারাজ—বলিয়াই, কুস্তি লড়ার ভঙ্গীতে তাল ঠুকিয়া পালোয়ান ছক্কু যেমন মহারাজকে ধরিতে গিয়াছে, তিনি দুইহাতে তাহাকে শূন্যে তুলিয়া একটা ঘুরপাক দিয়া নীচে শোয়াইয়া দিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ৪৯নং বাঙ্গালী পল্টনকে অভিনন্দিত করা হয় বাগবাজারে দত্তবাবুদের বাড়ীতে। এই পল্টনের নেতা ছিলেন ডাঃ এস কে মল্লিক। অতি আগ্রহের সহিত তাহাদের কার্যকলাপ পরিদর্শন করিয়া মহারাজ তাহাদিগকে আশীর্বাদ জানাইয়াছিলেন।

মুক্তেশ্বরানন্দের কথা ঃ

সকালবেলা ঠাকুর-ভাঁড়ারে কাজ করিতেছি, মহারাজ হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া প্রশ্ন করিলেন, কী করচ? আমি তখন পুষ্পপাত্রে বিবিধ পুষ্প, দূর্বা-তুলসী-বিল্বদল এবং ছোট ছোট বাটিতে শ্বেত ও রক্ত চন্দন সাজাইয়া রাখিতেছিলাম। কাজ দেখিয়া খুশী হইয়া তিনি বলিলেন ঃ বেশ বেশ। যখন কাজ করবে, মনে মনে ঠাকুরের নাম করবে। ঠাকুরের জন্যে মালা করবার সময় ঠাকুরকে স্মরণ করে, তাঁর নাম জপ করে করে মালা গাঁথবে।[৪]

জঙ্গলের ভিতর ঢুকিয়া একটি গাছ হইতে ছাল তুলিতেছি, মহারাজ অনেকটা দূরে পায়চারি করিতেছিলেন, হঠাৎ আমার পেছনে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, কী করচ ওখানে? উত্তর দিলাম, বাবলার ছাল তুলচি। 'কেন তুলচ?' 'মহিমবাবু কবিরাজী ওষুধ খাবেন, অনুপান বাবলার ছালের রস।' 'তুমি আমাদের জিজ্ঞাসা না করে কেন ছাল তুলচ?' আমি ভাবিতেছি, সামান্য একটা জিনিস বাবলার ছাল, তাহার জন্য এত কী বলিবার আছে? মহারাজ কহিলেন, মঠের যা কিছু দেখচ সব ঠাকুরের, মঠাধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন কিছুই নিজের মতলব মত কোরো না।

আমি একজনের কাছে একখানা ক্ষুর চাহিয়া নিয়াছিলাম। মহারাজ দেখিতে পাইয়া বলিলেন, তুই অপরের কাছে ক্ষুর চাইতে গেলি কেন? যা দরকার আমার কাছে চাইবি। কেউ কিছু দিতে এলেও নিবি না। সেই

---

৪ ঠাকুরের পূজার বাসন একজন জলের কলের নীচে রাখিয়া ধুইতেছিল, আর জলের ছাট বাসন হইতে তাহার পায়ে গিয়া পড়িতেছিল। মহারাজ দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন, তোদের সাহস আছে দেখচি; আমরা তো তাঁর কোলে কাঁধে চড়েচি, তবুও ভয়।

[ জগদানন্দ-কথিত ]

কাশীতে মহারাজ একদিন অনেকগুলি বৃহৎ স্বর্ণচাঁপা লইয়া আসিয়া বলিলেন, এগুলি ঠাকুরকে দাও। পূজক ( কৈবল্যানন্দ ) ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন উগ্রগন্ধ ফুল বলিয়া। মহারাজ কহিলেন, তুমি কি আমার চেয়েও বেশী জান? সমস্ত ফুলগুলিই তখন ঠাকুরকে দেওয়া হইল।

দিনই কামাইবার সময় তিনি আমার ক্ষুরখানি চাহিয়া নিলেন এবং নিজের দাড়িতে একটু বুলাইয়া ফিরাইয়া দিলেন।

মাদ্রাজে মঠের নূতন বাড়ীতে মহারাজ যে ঘরটিতে থাকিতেন উহার উল্টা দিকের ঘরে আমরা চারিজন থাকিতাম, মহারাজের তিন সেবক ও মুদালিয়ার নামক বৃদ্ধ এক মাদ্রাজী ভক্ত। মাদ্রাজে ভাল সতরঞ্চ পাওয়া যায় শুনিয়া এক সেবক মুদালিয়ারের কাছে খান তিনেক সতরঞ্চ চাহিয়া বসে এবং তিনিও সানন্দে আনিয়া দেন। একখানা সতরঞ্চ আমাকে দিয়াছিল, দরজা ভেজাইয়া কেমন সুন্দর জিনিস দেখিবার জন্য যেমন মেলিয়া ধরিয়াছি, আচম্বিতে মহারাজ, তাঁহার বিশ্রামের সময় তখন, আসিয়া পড়িলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরে ঈশ্বর, সতরঞ্চ কোথায় পেলি? বেশ ভাল জিনিস তো! আমরা তো হতভম্ব। মুদালিয়ার কহিলেন, আমি এনে দিয়েচি। 'তুমি হঠাৎ এদের দিতে গেলে কেন? এরা চেয়েছিল? তুই চেয়েছিলি?' আমি বলিলাম, না মহারাজ, আমাকে দিয়েচে। মহারাজ তখন সেই সেবককে বলিলেন, তুমি চেয়েছিলে কেন? তোমাকে না কারো কাছে চাইতে বারণ করেছিলাম? এই ব্যাপারের জের কয়েকদিন ধরিয়া চলিল, সতরঞ্চগুলি তো ফেরত দিতে হইলই। সন্ধ্যার পর সাধুরা যখন প্রণাম করিয়া বসিয়াছে, মহারাজ বলিতে লাগিলেন: আমরা আর কী ভোগ করলুম! তোদের ভোগের সীমা পরিসীমা থাকবে না—তোদের গদীর পর গদী, মঠের পর মঠ, ঐশ্বর্যের পর ঐশ্বর্য হবে। দিনকতক চেপেচুপে থাক্, একটু সংযম কর্। মাদ্রাজ মঠে এই সময় অবনী (প্রভবানন্দ), নীরোদ (অখিলানন্দ), যোগেশ (অশোকানন্দ), জিতেন (বিশ্বানন্দ) প্রভৃতি ছিলেন।

মহারাজের জন্য নিতাইবাবু মাঝে মাঝে খুব দামী জিনিস আমার হাতে দিতেন, আর বলিতেন, আমি দিয়েচি একথা বলবার দরকার নাই। মহারাজকে সাধারণতঃ পিয়াস্ঁ সাবান মাখানো হইত। একদিন নিতাইবাবুর দেওয়া সাবান দেখিয়া বলিলেন, আরে, এ সাবান পেলি কোথায়? বলিলাম, নিতাই দিয়েচে। 'এর কত দাম জানিস?' 'আড়াই টাকা তিন টাকা শুনেচি।'

'দেখ্ দিকিনি, এই রকম করে টাকা নষ্ট করে।' 'আমি মানা করেছিলুম, সে বলে, এর চেয়েও দামী সাবান আমি ব্যবহার করি, মহারাজকে দিতে আমার কি একটু ইচ্ছা হয় না?' দেখ্, নিতাইয়ের মনটা খুব বড়। তুই ওর জন্যে একটু প্রার্থনা করতে পারিস না? তুই ওকে কিছু দে।' 'মহারাজ, আপনি থাকতে আমি কী দেব?' 'ওরে, সে তোকে ভালবাসে। ভালবাসার লোকের জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে তাতে তার কল্যাণ হয়। আমার কাছে তো সে আসতে পারে না।'

এক ব্রাহ্মণ প্রায় প্রত্যেক রবিবারেই প্রচুর তরকারি পিঠে ঝুলাইয়া নিয়া মঠে আসিতেন; মহারাজ দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন, এ বেশ মশাই, আমরা তপস্যা করি আর আপনারা সরবরাহ করুন—যেমন আগে ছিল।

৺কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের মোহন্ত[৫] চন্দ্র মহারাজ (নির্ভরানন্দ) বাতরোগে পঙ্গুপ্রায় ছিলেন। এইরূপ অবস্থায়ও আমরণ আশ্রম পরিচালনা এবং প্রস্তরময় পঞ্চরত্ন মন্দিরে ঠাকুরের সুন্দর মর্মরবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা তাঁহার অদ্ভুত কর্মক্ষমতার নিদর্শন। মন্দির নির্মাণ করিতে এক সময়ে মহারাজই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। তখনকার দিনে আশ্রমের নির্দিষ্ট আয় কিছু না থাকায়, টাকাকড়ির ব্যাপারে মোহন্তকে হিসাব করিয়া চলিতে হইত। বিশেষতঃ চন্দ্র মহারাজ কিছুটা ব্যয়কুণ্ঠও ছিলেন। একদিন মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন: জান চন্দ্র, মোহন্ত হওয়া বড় কঠিন। লোকের দেওয়া টাকায় সাধুসেবা করতে হয়। যে উদ্দেশ্যে লোকে টাকা দেয় সেই উদ্দেশ্যে খরচ না করলে মহা অপরাধ হয়—মৃত্যুর পরে কুকুর হতে হয় (রামায়ণে নাকি ইহার উল্লেখ আছে!) মোহন্ত হওয়া বড় কঠিন।

---

৫ মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া চন্দ্র মহারাজকে অদ্বৈতাশ্রমের মোহন্ত পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহাকে উত্তম বসন জামা ও উষ্ণীষে ভূষিত করা হইয়াছিল, আর একজন তাঁহার মস্তকোপরি বৃহৎ এক ছত্র ধারণ করিয়াছিল। প্রতিবৎসর মহারাজ-প্রদত্ত এই গৌরবের সাজে সজ্জিত হইয়া তিনি আমাদের সঙ্গে ৺বিজয়ার কোলাকুলি করিতেন।

গানের আসরে বাহিরের লোকেরাও আছেন, হরিপদকে মহারাজ সরিয়া বসিতে বলেন, কিন্তু তিনি সরিতে পারিতেছিলেন না মহারাজের গায়ে ঠেকিয়া যাওয়ার ভয়ে। 'যেখানে চাঁদের হাট, গুরুশিষ্যে নাস্তি পাট' এই বলিয়া মহারাজ তাঁহাকে নিজের দিকে টানিয়া নিলেন।

শ্রীশচন্দ্র ঘটকের কথা: শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তখন কাশীতে আছেন (১৯১২)। দিন কয়েক তাঁহার ও ঠাকুরের পার্ষদভক্তগণের সঙ্গে আনন্দে কাটাইয়া যখন কর্মস্থলে ফিরিয়া যাইব, মহারাজকে প্রণাম করিবামাত্র তিনি হাসিমুখে বলিয়া উঠিলেন, পুনর্মূষিকো ভব। আর ঐরূপ বলিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন, জগদম্বার সন্তান—সিংহীর বাচ্চা, সিংহীর নিকট ছিলে; এখন আবার সেই কালি কলম কাগজ—মুষিক বইকি। 'উপায় কী মহারাজ?' 'সাধুসঙ্গ কর।' 'সাধু কোথা পাব?' 'সদ্‌গ্রন্থ পাঠ কোরো। বন্ধুবান্ধব আছে, প্রত্যেকের কাছ থেকে মাসে দু আনা এক আনা করে সংগ্রহ করে ভাল ভাল বই আনিয়ে তাই পাঠ কোরো।' রাঁচিতে আসিয়া পুস্তক-সংগ্রহে মন দিলাম। তাহার ফলে ডুরাণ্ডায় ব্রহ্মানন্দ পাবলিক লাইব্রেরী গড়িয়া উঠে।

গোকুল দাসদের কথা: 'কিন্নরী' নাটকের প্লট আমি দিয়াছিলাম বলিয়া মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী আমাকে ফ্রি পাস দেন। মহারাজের কাছে সেই কথা প্রকাশ করিতেই তিনি আমাকে তীব্র তিরস্কার করিয়া কহিলেন, তুই কেন ওদের কাছে চাইতে গেলি? যেচে দিলেও তো নেওয়া উচিত ছিল না। তুই জানিস, মালিকেরা ফ্রি পাসওলাদের কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখে? তাঁহার বকুনিতে আমি যেন মাটিতে মিশাইয়া গেলাম। অশ্রুপূর্ণ চোখে গঙ্গার ধারে চলিয়া গেলাম, কিন্তু সেখানেও শান্তি পাইলাম না। উদ্বোধনে যাইতেই শরৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর মুখটা আজ ভারভার কেন? আমি কারণ বলিলাম। শরৎ মহারাজ কহিলেন, এই জন্যে মুখ ভার করেছিস? মহারাজ তোকে ছেলের মত দেখেন তাই বকেচেন, অপর কাউকে তো এরকম বকেন না। তুই এখনি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আয়। আমি গিয়া দেখি, মহারাজের

আর এক মূর্তি। আনন্দোৎফুল্লমুখে বলিলেন, ওরে, তুই কাল আমাদের সঙ্গে বারুইপুরে বিপিন-জামাইয়ের বাড়ীতে যাবি।

একটি ছেলে বেলতলায় পশ্চিমমুখী হইয়া ধ্যান করিতেছে দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, উত্তরমুখো হয়ে বোস্, যখন আল্লা নাম জপ করবি তখন পশ্চিমমুখো বসবি।

একজন কহিল, ধ্যান করব কী, বাড়ীর কাছে একটা বাঁশঝাড আছে ঐটে সুমুখে এসে হাজির হয়! মহারাজ বলিলেন, ঐটেই ধ্যান করবে।

মহারাজ তাঁহার শিষ্যা রানুর মাতুলালয়ে আসিয়াছেন তাঁহাদের আমন্ত্রণে। রানুর মা অনুযোগ করিয়া বলিলেন, মহারাজ, আপনার মেয়েটি বড্ড রাগী, একটুতেই রেগে যায়। মহারাজ কহিলেন, রাগ? রাগ থাকা ভাল। (রানুর দিকে তাকাইয়া) তবে রানু, একটু 'অনু' যোগ করে দিয়ো।[৬] রানুর মা ও দিদিমা-বুড়ী হাসিয়া গড়াগড়ি।

## (১২) বহুদর্শী

মুক্তেশ্বরানন্দ বলেন:

বিকালবেলা, মহারাজ উপর হইতে নীচে নামিয়াছেন, বেড়াইতে যাইবেন। চায়ের টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, কোথায় যাচ্ছিস? বলিলাম,

---

৬ শ্রীরূপগোস্বামিকৃত উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থে:

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্যতে॥
সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্যতে॥

যে-প্রণয়োৎকর্ষ হেতু অতিদুঃখকেও সুখ মনে হয় তাহাকে রাগ বলে।
যে-রাগ নিত্যনূতন হইয়া সদানুভূত প্রিয়কেও নিত্যনূতন করে তাহাকে অনুরাগ বলে।

গঙ্গাজল আনতে। তিনি কহিলেন ঃ শোন্—কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করা কঠিন নয়, একটু চেপে জপধ্যান করলেই ওগুলো চলে যায়। সব চাইতে কঠিন কী, জানিস? অভিমান অহঙ্কার প্রতিষ্ঠা এগুলো ত্যাগ করা। শেষকালে মানুষ এইগুলোতেই আটকে যায়।

পুরীতে আছি, কিন্তু কাজের চাপে মন্দিরে যাওয়ার সময় পাই না। মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি মন্দিরে যাব? বলিলেন, বিকালে তিনটার সময় যাবি। মন্দিরে যাইতেই এক পরিবারের লোকজন আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল, আর এক বুড়ী আমাকে দেখাইয়া বলিতে লাগিল, এই আমাদের হরিপদ! যত বলি আমি হরিপদ নই, সেই বুড়ী তাহা মানিতে চায় না, বলে, ওর মা দেখলেই চিনতে পারবে; নরেন্দ্রসরোবরে তাহাদের বাসায় আমাকে ধরিয়া লইয়া গেল। মা দেখিয়াই বলিল, আমার হরিপদ নয়। আমাকে তাহারা জগন্নাথের প্রসাদ জিবে-গজা খাইতে দিয়াছিল। সন্ধ্যার পর যখন ফিরিলাম, মহারাজ ধমক দিয়া বলিলেন, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? তারপরে সবকথা শুনিয়া ও গজা খাইয়াছি জানিয়া কহিলেন ঃ কেন খেতে গেলি? হলই বা প্রসাদ। জানিস, মেয়েরা খাবারের সঙ্গে নানা তুক করতে পারে? কখনো অজানা অচেনা লোকের হাতে কিছু খাবি না।

শ্যামানন্দ বলেন ঃ কনখল সেবাশ্রমের জন্য কতকগুলি গাছের চারা একটা বড় কাঠের বাক্সে রাখিয়া মহারাজ আমাকে পার্সেল করিতে হাওড়া ষ্টেশনে পাঠাইলেন। গরুর গাড়ীতে করিয়া লইয়া গেলাম। পার্সেল অফিসে নয়টা হইতে বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়াও পার্সেল করা সম্ভব হইল না। স্নানাহার সারিয়া লইবার জন্য মঠে ফিরিয়া আসিলাম। মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হল রে? বলিলাম, বড় দেরী হচ্চে দেখে ফিরে এলুম, খেয়ে দেয়ে এক্ষুনি যাব। 'বিয়ের মন্ত্র জানিস?' 'আজ্ঞে না।' 'বল্—নটে শাক তুলসীর পাত, ধর্ ঢেমনা ঢেমনীর হাত। অফিস থেকে আমার নাম করে দুটো টাকা নিয়ে আয়। কেরানীবাবুকে বলবি টাকা দুটো দিয়ে—যা খরচ হবে আপনি করবেন, আমার গাছগুলি যেন ভাল জল পায় আর শীগগির পৌঁছে যায়।'

তাঁহার কথামত কাজ করিলাম। কেরানীবাবু তাড়াতাড়ি চেয়ার হইতে উঠিয়া কুলিদের ডাকিয়া আনিয়া গাছে জল দেওয়াইলেন এবং পরবর্তী গাড়ীতেই বাক্সটি তুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন।

প্রশান্তানন্দ বলেন: সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করিবার জন্য শরৎ মহারাজের আদেশে একবার আমাকে দেশে যাইতে হয়। ফিরিয়া আসিতেই তিনি জিজ্ঞাসা করেন, দেশে গেলি, দেশের জন্যে কী করে এলি? ঋণত্রয়মপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ—ফাঁকি দিয়ে কি মোক্ষ নেবে? তাঁহার কথাটি মনে রাখিয়া, পুনরায় যখন দেশে যাইতে হইল, একটি মেয়েদের পাঠশালা ও একটি বয়স্কদের নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করিলাম। এইভাবে পরপর ডাকঘর, ম্যালেরিয়ানিবারিণী সমিতি ইত্যাদি করিয়া কাজে খুবই জড়াইয়া পড়িলাম। জাগ্রত বিবেক বলিতে লাগিল, সাধু হইয়া এইভাবে জড়াইয়া পড়া ঠিক হইতেছে না। ঠিক করিলাম মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করিব। কিন্তু তাঁহার কাছে গেলেই কেমন একটা সঙ্কোচ আসে ও কোন কথা বলিতে পারি না। অন্তর বুঝিয়া একদিন তিনি কহিলেন, কোথাও কাজে জড়িয়ে পড়লে একদিনেই কি ছাড়া যায়? মাঝে মাঝে ফাঁকে থাকতে হয়, এভাবে আসক্তিটা ক্রমশঃ কেটে যাবে। তাঁহার উপদেশ মত চলিয়া, দেশের কাজ দেশের লোকের হাতে তুলিয়া দিয়া, ছয় মাসের মধ্যেই নিজেকে ছাড়াইয়া নিলাম। এইটি তাঁহার লীলাসম্বরণের অব্যবহিত পূর্বের ঘটনা।

"বাইরের গান কিছুই নয়। ভিতরে এমন মধুর গান শুনতে পাওয়া যায় যে, সব জুড়িয়ে যায়।" ইহা মহারাজের আপন অনুভূতির কথা। স্বামিজীর মত তিনি সঙ্গীতসাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না। পরিণত বয়সে তাঁহাকে কখনো গাহিতে দেখা যায় নাই। ভিতরের সহজাত অনুভূতিই কি বাহিরের সঙ্গীত বুঝিবার শক্তি তাঁহাকে দিয়াছিল?

তাঁহার কাছে শরৎ মহারাজ গানের পরীক্ষা দিতেন, যেমন সুরে স্বামিজী গানটি গাহিয়া থাকেন ঠিক সেইরূপ হইল কিনা—সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কোথাও কিছু

ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে কিনা। মহারাজের অভিমতের উপরে সঙ্গীতজ্ঞ শরৎ মহারাজের এমনি বিশ্বাস ছিল।

মহারাজকে একজন গান শুনাইতেছিল। খানিক শুনিবার পর তিনি কহিলেন, একটু গৌড় মিশিয়ে গাও। লোকটি মহারাজের সুরের অভিজ্ঞতা দেখিয়া মুগ্ধ হইল, সে সারঙ্গ রাগে গাহিতেছিল।[১]

মহারাজ অভিনয় দেখিতে গিয়াছেন, গান শুনিয়া প্রশ্ন করিলেন, ভবানী, এটা'কী সুর? ভবানী বলিলেন, মহারাজ, মনে হচ্চে এটি সোহিনী। মহারাজ কহিলেন, হ্যাঁ।

বেলুড় মঠে একদিন রাত্রে আহারের পূর্বে মহারাজ একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁরে, হারমোনিয়াম বাজিয়ে কে গান করচে রে? জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি[২] উত্তর দিলেন, ও সূজ্জি। মহারাজ বলিলেন, নিয়ে আয় তো ওকে ডেকে। তারপরে গায়ককে দেখিয়াই বলিলেন, তুই গতকালও গান করেছিলি, তোর বেসুরো রাগিণী শুনে আমার সমস্ত রাত ঘুম হয় নি। হারমোনিয়ামটা আমার খাটের নীচে রেখে দে।

মহাবাজ একদিন গোকুলদাস দেকে বলিলেন, নানারকম লোকে নাটক লেখে, তোমরা য়ুনিভার্সিটিম্যান, তোমরা লেখ না কেন? গোকুলবাবু নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করায় কহিলেন: ধ্যানধারণা করে আমাদের ক্ষুদ্র মনটাকে বিরাট মনে লয় করে দিতে হয়, তখন সেই মন দিয়ে সবরকম লোকের, সব জীবজন্তুর মনের কথা জানতে পারা যায়। সেই অবস্থায় নাটক রচনা করলেই তা ঠিক ঠিক হয়। গিরিশবাবু যে নাটক লিখতেন তাঁর মনটা সেই

১ জগদানন্দ-কথিত।

২ গৌরীশানন্দ।

সময় বিরাট মনে যুক্ত হয়ে যেত—তিনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন কিরকম অবস্থায় কে কী বলচে।[৩]

পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ যে 'কিন্নরী' নাটক লেখেন তাহার প্লট দিয়াছিলেন গোকুলবাবু অবদানকল্পলতার কিন্নর্যবদান হইতে। কিন্নরী সাফল্যের সহিত মিনার্ভায় অভিনীত হইবার পর ষ্টারে মঞ্চস্থ হয়। মিনার্ভার স্বত্বাধিকারী তখন কিন্নরীর যাবতীয় স্বত্ব দাবি করিয়া হাইকোর্টে নালিশ করেন, এবং সেই অভিযোগে নিজেকে বইয়ের প্লটদাতা বলিয়াও উল্লেখ করেন। ইহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য গোকুলবাবুকে হাইকোর্টে যাইতে হয়। মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তুমি প্রশ্নের ঠিক উত্তরটি ছাড়া বেশী কথা একেবারে বলবে না।

শোনা যায়, রামবাবুদের জমিদারি-সংক্রান্ত কোন মকদ্দমায় বড় বড়

---

৩ মহারাজের কথায় গোকুলবাবু পালিভাষায় লিখিত জাতকসাহিত্যের বিদুরচরিত্র অবলম্বনে নাটক লিখিতে সুরু করেন। মহারাজ তাঁহাকে দেবেন্দ্রনাথ বসুর কাছে নাটক-রচনা শিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। নাটকের প্রস্তাবনার ভাবটিকে দেবেনবাবু নিজস্ব ভাষায় যে রূপ দান করেন তাহা এইরূপ :

ধীরে—ধীরে—কালচক্র ফিরে, নিবিড় তিমিরে নব অরুণ-উদয় ;
মৌন-তুহিন টুটে, কার সুষমা ফুটে, শ্যামমুকুটে শোভে শিখরনিলয় ;
আলোকে পুলকে উৎসবরঙ্গ, তরতর ঝরঝর তানতরঙ্গ ;
কার বিরাট প্রাণ পাখীমুখে করে গান, কার প্রেমধারে প্রবাহিণী বয় ;
কার ছন্দে আজি বন্দে বিপিনরাজি, কার কথা তরুলতা কহিছে কুসুমে সাজি ;
নীরব বিশ্বমাঝে কার বাঁশরী বাজে, অরূপে রূপ রাজে ভরিয়া হৃদয় ;
এক তান তুলি গাও প্রাণ খুলি, বাসনা কামনা ভুলি হও তাঁতে লয়।

মহারাজকে এই প্রস্তাবনা আবৃত্তি করিয়া শোনানো হয়, এবং 'নীরব বিশ্বমাঝে কার বাঁশরী বাজে' এই কথাটি শুনিবামাত্র তিনি ভাবস্থ হইয়া পড়েন। ইহার পরে কিছুদিন যাবৎ গোকুলবাবু যখনই মহারাজের কাছে যাইতেন, তিনি উপস্থিত সকলকে উহা আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে বলিতেন।

আইনজীবীরা যেখানে অন্ধকার দেখিতেছিলেন, মহারাজের একটিমাত্র কথায় সেখানে তাঁহারা নূতন আলোক দেখিতে পান ও সাফল্যের সহিত মকদ্দমাটি পরিচালিত করেন।

একবার রামবাবুদের জমিদারি-সংক্রান্ত ব্যাপারে আশি হাজার টাকার আশু প্রয়োজন দেখা দেয়। মহারাজের নিকট একথা জানিতে পারিয়া কিরণচন্দ্র দত্ত তাঁহার দাদার সহিত পরামর্শক্রমে টাকাটা আনিয়া দেন। বিষয়কর্ম বিধিসম্মতভাবে হওয়াই সঙ্গত, মহারাজ এইরূপ দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করায় বার্ষিক শতকরা ছয় টাকা সুদে টাকা পরিশোধ করিতে হইবে এই মর্মে লেখাপড়া হইয়াছিল। কিরণবাবু পরে কেবল মূল টাকাটাই ফেরৎ নিয়াছিলেন, সুদের টাকা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার যুক্তি ছিল এই যে, রামবাবু তাঁহার বাল্যবন্ধু, তাঁহার নিকট হইতে সুদের টাকা নিতে পারিবেন না, আর টাকা সুদে খাটানো তাঁহার ব্যবসাও নয়। মহারাজ কিন্তু সুদের টাকা না দিতে পারিলে রামের অমর্যাদা হইবে, সে ছোট হইয়া যাইবে বলিয়া মন্তব্য করেন। এই নিয়া বাদানুবাদ হইতে থাকে, কথা উচ্চগ্রামে চড়ে, কিন্তু কোনও মীমাংসাই হয় না। রামবাবু নির্বাক বসিয়া আছেন যেন কিছুর মধ্যেই নাই, মহারাজ কিঞ্চিৎ উত্তেজিত, আর কিরণবাবুও অসহায়। এমন সময় কৃষ্ণলাল মহারাজ আসরে দেখা দিলেন ও করজোড়ে কহিলেন, মহারাজ, মঠে ঠাকুরের ভোগ তোলার বড়ই অসুবিধা হচ্চে, মধ্যে মধ্যে ছোঁয়া পড়ে যাচ্চে। আমার নিবেদন, এই টাকাটা দিয়ে যদি ঠাকুরের ভোগ তোলার জন্যে পেছনদিকে একটি সিঁড়ি তৈরি হয় তো সেই অসুবিধাটা আর থাকে না। কিরণবাবু ইহাতে নিজের সম্মতি জানাইলেন, মহারাজও সায় দিয়া কহিলেন, টাকাটা যেন কিরণবাবুর নামে জমা হয়।

অমূল্য মহারাজ যখন ভুবনেশ্বর মঠের গৃহাদি নির্মাণ করাইতে যান, মহারাজ তাঁহাকে মুখে মুখে সমুদয় প্ল্যান—গৃহাদির সংস্থান ও গঠন-প্রকার বলিয়া দিয়াছিলেন। গোকুলবাবুকে বলিয়াছিলেন, গেটের উপর সিংহ থাকবে, তার

একটা প্রতিকৃতি তুমি দাও। গোকুলবাবুর দেওয়া প্রতিকৃতির অনুরূপ একটি সিংহ ভুবনেশ্বর মঠের তোরণশীর্ষে স্থাপিত আছে।

ভুবনেশ্বর মঠের নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করিতে মহারাজ ব্যস্ত আছেন, কিছু টাকার প্রয়োজন। কেহ হয়তো স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া টাকা দিতে চাহিল, তিনি নিলেন না। কিংবা কেহ কিছু টাকা দিয়াছে, উহার কিয়দংশ রাখিয়া বাকিটা ফেরৎ দিতে বলিলেন। তিনি বলিতেন, কত লোকের কতভাবে সর্বনাশ করিয়া, তাহাদিগকে দুঃখ দিয়া মোটা টাকা এক জায়গায় সঞ্চিত হয়। সেইসব লোকের অভিশাপ তাহাদের কামক্রোধাদির প্রভাব সেই টাকার উপর থাকে। তিনি আরও বলিতেন: গৃহীরা তাদের পরিশ্রমের অর্জন দান করে ত্যাগী হচ্চে, আর ত্যাগীরা তাদের টাকা নিয়ে হয়ে যাচ্চে ভোগী!

ভুবনেশ্বর মঠের কিছু ব্যবধানে গ্রামাঞ্চলে খুব কম মূল্যে উৎকৃষ্ট ধানের জমি পাওয়া যাইতেছিল। তাহাতে সম্বৎসরের ব্যয় সঙ্কুলান হইয়াও কিছু ধান উদ্বৃত্ত হইতে পারিত। মহারাজ প্রথমটা খুব উৎসাহ দেখাইলেন, কিন্তু দেখা-শোনা শেষ হইয়া কিনিবার মুখে আর তেমন উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না। কেহ কথা পাড়িলেই, আচ্ছা, হবে হবে—বলিয়া বিষয়টি চাপা দিতে লাগিলেন। শেষে একদিন পরিষ্কারভাবে বলিলেন, ওসব জমিটমি মঠের না হওয়াই ভাল, জমিদারি দেখতে গিয়ে শেষকালে প্রজাপীড়ন হবে। তাঁহার এই মত-পরিবর্তনের কারণ, ভুবনেশ্বরের কাজ যাহারা দেখিতেছিল বা ঐ অঞ্চলে রিলিফ কাজে নিযুক্ত ছিল, তাহাদের আচরণ সম্বন্ধে অবাঞ্ছনীয় কথা তাঁহার কানে আসিতেছিল।

জ্যোতির্ময়ীর উৎসাহে শেয়ার কিনিয়া একটি লোক বিপন্ন হয়, তাহার বাড়ী ঘর নীলাম হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সে মহারাজের শরণাগত হয় ও তাঁহার কৃপায় সেযাত্রা কোনরূপে রক্ষা পায়। মহারাজ তাঁহাকে বলিয়া-ছিলেন: পয়সা করাটা কি এতই সহজ? একখানা ইংরাজী বইয়ে পড়লাম,

বিধবার সর্বস্বহরণ ইত্যাদি কত কী করতে হয়। জান না, এযুগে যারা সৎপথে থাকবে তাদের রুকু মাথায় তেল জুটবে না।

একজনকে মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, তুমি এখন কত পাও? সে কহিল, আজ্ঞে একশ দশ টাকা। 'কিছু বাঁচে?' 'আজ্ঞে না।' 'দশ টাকাও ফেলে রাখতে পার না? আমার এক দিদিমা-বুড়ী ছিলেন, তিনি অল্প পয়সায় গুছিয়ে চালাতেন।'

সন্ধ্যার পর মহারাজ মঠবাড়ীর পূর্বদিকের নীচের বারান্দায় থামে ঠেস দিয়া ছোট বেঞ্চে বসিয়া আছেন। এক ভদ্রলোক নীচের সিঁড়িতে বসিয়া বলিলেন, আমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে। মহারাজ কহিলেন, কী, বলুন। 'আমার কাছে গুটিকতক ছেলে থাকে, তাদের কিরকম আহার দেব—মাছ-মাংস?' 'রুই মাছের মুড়ো।' 'মাংস?' 'সপ্তাহে একদিন।' 'পেঁয়াজ?' 'ঐ মাংসের সঙ্গে, আলাদা নয়।' 'মহারাজকে একটা কথা বলব?' 'বলুন।' 'আজ্ঞে কিসে প্রাণে শান্তি হয়?' 'দেখুন, সত্যি কথা কইবেন, বাপ-মার সেবা করবেন, more or less (অল্পবিস্তর) ভগবানকে ডাকবেন—এই। সংসারে আর কিছু নেই।'

এক ব্যক্তি সাতজনের কাছে মন্ত্র নিয়াও শান্তি পায় নাই শুনিয়া মহারাজ বলিলেন, বেশ, এখন কী করচ? তিনি বলিলেন, এখন কোনোটাই জপ করি না। 'বেশ, আরও ভাল।' 'এখন কী করব?' 'এখন ঐ সাতটা মন্ত্রই একবার করে জপ করবে; যেটা ভাল লাগবে সেটা জপ করবে বেশী করে।'

## (১৩) ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে

মহারাজ বৃন্দাবনে নিজের তপস্যার স্থান কুসুমসরোবর ও শ্রীমতী রাধারাণীর পৈত্রিক আবাস বর্ষাণার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেন। অন্যত্র দশ বৎসরের তপস্যার ফল বৃন্দাবনে দুই বৎসরে হয়, বর্ষাণায় যেন বর্ষে দেয়, ইত্যাদি কথা তাঁহাকে বলিতে শোনা গিয়াছে। প্রেমের লীলাভূমি বৃন্দাবনের

কথা বলিতে বলিতে তাঁহার মুখমণ্ডল কেমন এক ভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিত। বৃন্দাবন-কথা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন: তখন (১৯০২) আমি ও হরি মহারাজ একসঙ্গে ছিলাম। আমরা নিয়মিতভাবে খুব ধ্যানজপ করতাম। আমাদের মধ্যে কথাবার্তা নেহাৎ প্রয়োজন না হলে একেবারেই হত না। রাত্রি আটটার পর মাধুকরীর রুটি দুএকখানা যা থাকত তাই খেয়ে শুয়ে পড়তাম, আবার রাত ঠিক বারোটার সময় উঠে মুখহাত ধুয়ে জপে বসতাম।[১] জানি না সেদিন কেন একটু বেশী ঘুমিয়েছিলাম, হঠাৎ একটি ধাক্কা খেয়ে আমার ঘুম ভাঙল। কে যেন বল্লে, বারোটা বেজে গেছে, জপে বসবে না? নিদ্রার ঘোর তখনো সম্পূর্ণ যায় নি আমার। ভাবলাম ঘুমুতে দেখে হরি মহারাজ আমায় বোধ হয় জাগিয়ে দিয়েচেন, কিন্তু তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম তিনি জাগান নি। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে জপ করতে বসচি, সামনের দিকে চেয়ে দেখি এক বাবাজী নিবিষ্টমনে জপ করচেন। হঠাৎ বাবাজীকে দেখে বেশ একটু ভয় হল। জপ করি আর মাঝে মাঝে তাঁর দিকে চেয়ে দেখি। যতক্ষণ বসেছিলাম বাবাজীও ততক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে জপ করছিলেন। তারপর নিত্যই দেখতাম তিনি ঐভাবে জপ করচেন।[২]

জগন্নাথ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মহারাজ নিম্নোক্ত ঘটনা দুইটি বলিয়াছিলেন:

একদিন একমনে জগন্নাথ দর্শন করছিলাম। একটি যুবক আমার পাশে দাঁড়িয়ে দর্শন করছিল, আর মাঝে মাঝে আমার গায়ে হাত দিয়ে বলছিল, ও মশায়, আপনি কী দেখচেন? প্রথম প্রথম আমি এতে বিরক্তি বোধ করছিলাম। শেষে বল্লাম, কেন? আমি জগন্নাথ দর্শন করচি। 'আমি

১ 'আমরা জপ করতাম, ঘুম পেলে দাঁড়িয়ে জপ করতাম, আসন ছাড়তাম না।' মহারাজ বলিয়াছিলেন।

২ বলরামবাবুর ভাইপো নিত্যানন্দ বসু বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে ছাদের উপর বসিয়াছিলেন, দেখিতে পাইলেন, এক সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ বাবাজী প্রসন্নমুখে তাঁহার দিকে আগাইয়া আসিতেছেন। তিনি ভয়ে চীৎকার করিয়া ছাদ হইতে নামিয়া আসেন। মহারাজ সেকথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, কোন সিদ্ধাত্মা হয়তো ওকে কিছু বলতে আসছিলেন, ও যদি ভয় খেয়ে পালিয়ে না যেত, উনি কিছু বলতেন—ওর খুব কল্যাণ হত।

যে কিছুই দেখতে পাচ্চি না!' 'কিছুই দেখতে পাচ্চ না?' 'একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখছি।' 'তুমি কি কোন মেয়েকে ভালবাস?' 'পিসীমা আমাকে পালন করেছিলেন, আমিও তাঁকে খুব ভালবাসতুম, এখন তিনি বেঁচে নাই।' তখন আমি বল্লাম, জগন্নাথ তোমার পিসীমার মূর্তিতে দেখা দিয়েচেন, তুমি ঠিকই দেখেচ। এর পরে সে জগন্নাথবিগ্রহকেও দেখতে পায়।

কলকাতা থেকে স্বামী-স্ত্রী তাদের একমাত্র শিশুপুত্রকে নিয়ে পুরী যাচ্ছিল। ছেলেটি খুবই চঞ্চল বলে সারারাত তাকে আগলাতে হয়েচে। শেষ রাত্রের দিকে যখন তাদের একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব এসেচে সেই অবস্থায়ও মা একহাত দিয়ে ছেলের পা ধরে রেখেছিল। হঠাৎ ছেলেটি জানালা গলিয়ে পড়ে যায়। মা জেগে উঠল, শিকল টেনে গাড়ী থামানো হল, ছেলের খোঁজ করতে গাড়ী খানিকটা পিছিয়েও গেল, কিন্তু ছেলের পাত্তা পাওয়া গেল না। তখনো ভোর হয় নি। গাড়ী পুরীতে চলে গেল, পুরী ষ্টেশনে আর থানায় ডায়রী করা হল, তারপরে দিনের আলোয় তল্লাসী চালাবার জন্যে ট্রলির ব্যবস্থা হল। খুঁজতে খুঁজতে শেষে ছেলেকে পাওয়া গেল—সাক্ষীগোপালের নিকট যেখানে অনেক মাথাওলা এক খেঁজুর গাছ আছে তারি তলায় কতকগুলো ওদেশী (কটকী) খেলনা নিয়ে বসে সে খেলচে। খুব হাসিখুশি ভাব। ট্রলির লোকেরা বল্লে, চল আমাদের সঙ্গে। সে বল্লে, যাব না, মামা যেতে বারণ করেচে। 'মামা কোথায়?' 'মামা খাবার আনতে গেছে, আমাকে বলে গেছে ওদিকে যাস নে, রেলে কাটা পড়বি।' ছেলেটি মামার খুবই প্রিয় ছিল, কিন্তু মামা তখন কলকাতায়। এসব ঘটনা জগন্নাথ মহাপ্রভুরই খেলা!

মহারাজ বলিতেন, বৃন্দাবনে মহানিশা, কাশীতে ব্রাহ্মমুহূর্ত ও পুরীতে অপরাহ্নকাল জপধ্যানের প্রশস্ত সময়। তখন তখন ঐসব ধামে আধ্যাত্মিক ভাবের একটা প্রবাহ বহিতে থাকে।[৩]

---

৩ মহারাজ বলিয়াছেন: একবার ভদ্রকে আছি, ক্ষণ ঠিক ধরতে পাচ্ছি না। রাত্রি ২টার সময় উঠে বসতেই ধ্যান বেশ জমে গেল, বুঝলাম ওখানকার ক্ষণ ২টা রাত্রি। বেলুড় মঠে ভোর ৪টা, ভুবনেশ্বরেও তাই। [অচ্যুতানন্দ-কথিত]

মহারাজ যখন কন্যাকুমারী যান, তাঁহার সঙ্গে ছিলেন স্বামী নির্মলানন্দ, শঙ্করানন্দ, ভূমানন্দ, গোপালানন্দ, দুর্গানন্দ, যতীশ্বরানন্দ ও নারায়ণ আয়েঙ্গার। সেখানে তিনি নয়দিন ক্ষেত্রবাস করেন ( ডিসেম্বর, ১৯১৬ )। ভূমানন্দ বলিয়াছেন: কন্যাকুমারীর কালো কষ্টিপাথরের মূর্তি। বিকালে সেই মূর্তির মুখখানি গাঢ় শ্বেতচন্দনে অনুলিপ্ত করা হয়। অধরে রক্তিম রাগ, মনে হইত যেন দেবী মুখ বাঁকাইয়া হাসিতেছেন। সন্ধ্যার উজ্জ্বল দীপালোকে কী সুন্দরই যে দেখাইত! মহারাজ ঐ সময়ে দর্শন করিতে যাইতেন। তিনি দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেন, আমি তাঁহার জপের মালাটি ( ৫৪টি রুদ্রাক্ষে গাঁথা ) হাতে নিয়া পাশেই থাকিতাম ও তিনি হাত বাড়াইবামাত্র তাঁহার হাতে দিতাম। খানিক জপ করিয়াই মালাটি ফিরাইয়া দিতেন ও একদৃষ্টে দর্শন করিতে থাকিতেন। সেই সময়ে তাঁহার ঠোঁট কাঁপিতে থাকিত, মুখের ভাবে মনে হইত যেন কত ভয় পাইয়াছেন। কিন্তু আমার ভিতরটা তখন হাসিতে ফাটিয়া পড়িত, অথচ মুখ ফুটিয়া হাসিতেও পারিতাম না। মহারাজের সঙ্গে যাঁহারা দর্শন করিতে যাইতেন তাঁহাদের প্রত্যেককেই সেকথা বলিয়াছি, সকলেরই ঐ একই অনুভূতি। কন্যাকুমারী হইতে মাদ্রাজে আসিয়া মহারাজ বলিয়াছিলেন: কামাখ্যাতে আর কন্যাকুমারীতে গিয়েছিলুম মার অশেষ দয়ায়। কন্যাকুমারীতে আমার ভিতরটা যেন হাসিতে ফেটে পড়ছিল—আট-দশ বছরের মেয়ে, খিলখিল করে হাসচে। ভারী সুন্দর মূর্তি—অপূর্ব, জীবন্ত!

মহারাজ যখন তিরুপতি গমন করেন, তাঁহার সঙ্গে ছিলেন শর্বানন্দ, শান্তানন্দ ও ঈশ্বর। জোড়হাতে দণ্ডায়মান অবস্থায় তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া "বালাজী বেঙ্কটেশ্বর" বিগ্রহ দর্শন করিতেন, ভাবের ঘোরে তাঁহার শরীর ঈষৎ কাঁপিতে থাকিত। তিরুপতিতে তাঁহার তিনদিন থাকার কথা ছিল, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই এক সপ্তাহ বাস করেন ( মার্চ, ১৯১৭ )। প্রায় সর্বক্ষণ তিনি ভাবের ঘোরে থাকিতেন ও ভাবের ঘোরে কথা কহিতেন। বলিয়াছিলেন, মহাজাগ্রত চৈতন্যময় স্থান।

প্রথমদিন দর্শন করিয়াই তিনি বলিয়া উঠেন, শর্বানন্দ, এ যে দেবীমূর্তি

দেখছি। সঙ্গে সঙ্গেই হাতের ইসারায় বলিয়াছিলেন, এখন থাক, পরে বলব। আস্তানায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আমি স্পষ্ট দেখলুম দেবীমূর্তি, একটু খোঁজ কর দেখি। অনুসন্ধানে জানা গেল, সত্যই এই বিগ্রহ আদিতে দেবী-মূর্তি ছিলেন। 'বালা' নামটিও স্ত্রীদেবতার বাচক। মন্দিরে ঢুকিতে গোপুরমের ভিতর দেবীর বাহন প্রকাণ্ড সিংহ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি শুক্রবার সকালে বিগ্রহের অভিষেক বা মহাস্নান হয়, মোহন্তের ব্যবস্থায় মহারাজ সেই সময়ে দিগম্বরী মূর্তি দর্শন করিয়াছিলেন—কালো পাথরের দণ্ডায়মান সাতআট ফুট উচ্চ বিগ্রহ, পায়ে 'বিছা' রহিয়াছে, তৃতীয় চক্ষুটি ঘসিয়া তোলা সত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। রামানুজী তিলকে এই চক্ষু আবৃত রাখা হয়।

বালাজী-মন্দিরের অনেকটা ব্যবধানে, পর্বতের পার্শ্বস্থিত ঝরণাধারার দুই পাশে অতি মনোরম স্থানে সাধুদের ভজনকুটীরসমূহ বিদ্যমান। মহারাজ সেইস্থান দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হন এবং সাধুদের একজনকে পরদিন তাঁহার কাছে আসিতে আমন্ত্রণ করেন। সাধুটি আসিয়া একতারা সহযোগে ভজন শুনাইতে থাকিলে তিনি তন্ময় হইয়া যান, এবং স্বয়ং একতারাটি হাতে নিয়া বাজাইতে থাকেন। তাঁহার আদেশে ঈশ্বর তাঁহার বাজনার সঙ্গে সঙ্গে গাহিয়াছিলেন, 'তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুঃখ, তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব।' সাধুটিকে মহারাজ প্রচুর ফল দিয়া বিদায় করেন।

গঙ্গার পশ্চিমকূলে বালীতে ৺কল্যাণেশ্বর নামে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ শিব বিরাজমান। ঠাকুর একদিন তাঁহার রাখালকে সঙ্গে নিয়া সেখানে যান ও শিব দর্শন করিয়া ভাবাবিষ্ট হন। এই ঘটনার বহু কাল পরে মহারাজ একদিন বেলুড় মঠ হইতে যাইয়া কল্যাণেশ্বরকে পূজা করিয়া আসেন। ব্রজেশ্বরানন্দ প্রভৃতি অনেকে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। তদবধি প্রতি সোমবার মঠ হইতে কল্যাণেশ্বরের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে।

একবৎসর চৈত্রমাসে দারুণ গরম পড়িয়াছে, বৃষ্টির নামগন্ধও নাই।

ব্রজেশ্বরানন্দকে ডাকিয়া মহারাজ কহিলেন, দেবেন, তুই যদি বারো কলসী গঙ্গাজল দিয়ে কল্যাণেশ্বরকে স্নান করাতে পারিস তো আজই বৃষ্টি হবে। আদিষ্ট ব্যক্তি কলসী নিয়া ছুটিলেন। একে একে দ্বাদশ কলসী জলের মহাস্নান পূর্ণ হইতে না হইতে দেখা গেল কালো মেঘে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। এরূপ অজস্র বারিপাত হইল যে, ব্রজেশ্বরানন্দ মঠে ফিরিয়া দেখেন জমিতে এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে !

## (১৪) ভূত-ভৌতিক-প্রসঙ্গে

মাদ্রাজ মঠের জমিতে নবনির্মিত গৃহের প্রতিষ্ঠাকার্য হইয়া গিয়াছে ও সাধুরা প্রায় সকলেই তথায় চলিয়া গিয়াছেন ( ২৪শে এপ্রিল, ১৯১৭)। ভাড়াটে বাড়ীটা তখনো হাতে থাকায় মহারাজ দুইচারি দিন তথায় থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন, সেবকদের দুইতিন জনও সেখানে রহিলেন। সকালবেলা সেবক যখন তামাক দিতে গিয়াছেন, মহারাজ অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, এখানে কাল রাত্রে খুব নৃত্য হয়ে গেছে। 'কিসের নৃত্য মহারাজ ?' 'ঠাকুর চলে গেছেন কিনা, ভূতেরা তাই আনন্দে সারারাত নৃত্য করেচে, এ বাড়ীতে ভূত আছে।' সেইদিনই তিনি মঠবাড়ীতে চলিয়া আসিলেন (৩০শে এপ্রিল )।

ডাক্তার সীতারাম আয়ারের ঘোড়ার গাড়ীতে সমুদ্রের ধারে বেড়াইয়া সন্ধ্যার মুখে তিনি প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, সঙ্গে ঈশ্বর ও সীতারামের দুই শিশু কন্যা। ভাড়াটে বাড়ীর দোতলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওখানে কিছু দেখতে পাচ্চিস ? ঈশ্বর বলিলেন, হ্যাঁ মহারাজ, দেখচি দুটো মানুষ ছুটোছুটি করচে—একবার ঠাকুর যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে যাচ্চে, আবার আপনি যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে যাচ্চে। মহারাজ কহিলেন, ঐ দুটো ভূত। খবর লইয়া জানা গেল একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক ঐ বাড়ীতে আত্মঘাতী হইয়াছিল।

ঢাকায় কাশিমপুরের জমিদারবাড়ীতে অবস্থানকালে মহারাজ সেই বাড়ীতে কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে কিনা জানিতে চাহেন। ঐ জমিদারের

একমাত্র পুত্র সেখানে আত্মহত্যা করিয়াছিল শুনিয়া কহিলেন, আমি দেখলুম একটি মুসলমান, আমার কাছে এসে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। অনুসন্ধানে জানা গেল, পরপর তিন ব্যক্তি ঐ বাড়ীর একই ঘরে আত্মহত্যা করিয়াছে, তন্মধ্যে একজন মুসলমান।[১]

বসু-ভবনে সেবক মহারাজকে তেল মাখাইয়া দিতেছিলেন এমন সময় টাবু আসিয়া ঐ কাজে যোগ দিলেন। 'হ্যাঁরে টাবু, তুই ভূত দেখেছিস ?' মহারাজ প্রশ্ন করিলেন। 'না মহারাজ।' 'কত রকম রকম ভূত যে আছে তোকে কত বলব। একরকম ভূত আছে, তারা করে কী জানিস ? মানুষের ঘাড়ের উপর বসে রক্ত চুষে খায়, মশারা যেমন হুল বসিয়ে রক্তপান করে তেমনি।' তেল মাখানো শেষ করিয়া সেবক যখন গরম জল আনিতে গেলেন মহারাজ টাবুকে বলিলেন, ভূত দেখবি ?—ঐ দেখ্। একটি উড়িয়া চাকর চলিয়া যাইতেছিল, টাবু দেখিলেন তাহার ঘাড়ের উপর বসিয়া ও দুই হাতে জাপটাইয়া ধরিয়া কি একটা সত্যই রক্তপান করিতেছে! তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।[২]

মহারাজ বলিতেন: অনেকে ভূত দেখে বলিয়া মনে করে, কিন্তু তারা মনের ভয়ে কাল্পনিক কিছু দেখিয়া থাকে; সত্যকার ভূত দুইএক জন মাত্র দেখিতে পান। ভূতেরা দুর্বল মনকে প্রভাবিত করে। আত্মহত্যাকারীর

---

১ বীরেন্দ্রনাথ বসু-কথিত।

২ লোকপরম্পরায় শ্রুত ঘটনা: মঠের ঠাকুরঘর হইতে এক ব্রহ্মচারী সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছিল। হরি মহারাজ চায়ের টেবিলে বসিয়াছিলেন, হঠাৎ ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগলেন, ঠাকুরঘর থেকে আসচ, অমন করে নাবচ কেন ? ব্রহ্মচারী তুমি, তোমার মুখখানা এরকম কেন ? আরও অনেক কঠোর কথা বলিয়া তিনি বকুনি দিতে লাগিলেন। যাহারা শুনিতেছিল তাহারা এই বকুনির কারণ খুঁজিয়া পাইল না। পরে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলন: ও যখন ঠাকুরঘর থেকে নাবছিল দেখলাম একটা মহাতমোভাব পেছন থেকে ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে চাইচে, সেই ভাবটিকে লক্ষ্য করেই আমি বকেচি যাতে ওর হাত থেকে সে রক্ষা পায়।

প্রভাবে পড়িয়া লোকে আত্মহত্যা করে। কামী, ক্রোধী বা হিংসুটে ভূতের প্রভাবে যাহারা স্বভাবতঃ কামী, ক্রোধী বা হিংসুটে নয়, তাহারাও হঠাৎ মন্দ কাজ করিয়া বসে; তাহাদের মধ্য দিয়া ভূতেরা নিজেদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। আবার ব্যক্তিবিশেষকে প্রভাবিত করিয়া তাহাকে দিয়া অপরকেও প্রভাবিত করে। ইহাদের অপেক্ষা সূক্ষ্মতর একশ্রেণীর দেবতারা আছেন যাঁহারা সূক্ষ্মভোগের ছলনা দিয়া সাধককে বিপথগামী করেন। শাস্ত্রে ইঁহাদিগকেই অপ্সরাদি বলা হইয়াছে। কিন্তু আর এক শ্রেণীর সিদ্ধাত্মারা আছেন যাঁহারা প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে সাহায্য করিতে সচেষ্ট, কখন কখন তাঁহারা দেখা দিয়াও থাকেন।

কাশীর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের একটি বেলগাছ কাটিয়া ফেলার কথা হইতেছে জানিয়া মহারাজ বলিয়াছিলেন, কেন কাটবে, গাছটিতে একজন থাকেন, কেন তাঁকে নিরাশ্রয় করবে? গাছটি আর কাটা হয় নাই।

পুরীর শশীনিকেতনে গভীর রাত্রে হঠাৎ অতি বিকট আওয়াজ শুনিয়া একসঙ্গে সকলেরই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। মহারাজ নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া কোথা হইতে আওয়াজ আসিল জিজ্ঞাসা করেন। হরি মহারাজ বরাবর জাগিয়াই ছিলেন, বলিলেন, আমার ঘরের বাথরুমের বাইরের দিকের কোণের কার্ণিসের উপর থেকে আওয়াজটা এসেচে বলে মনে হয়। মহারাজ একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন ও হরি মহারাজের অসাক্ষাতে কহিলেন, এটা ভৌতিক ব্যাপার, বড়ই অমঙ্গলসূচক। হরি মহারাজ তখন রাত তিনটায় উঠিয়া অমূল্য মহারাজের সঙ্গে যাইয়া মন্দিরে মঙ্গলারতি দর্শন করিতেন ও সমুদ্রস্নান করিয়া শশীনিকেতনে ফিরিতেন। এই ঘটনার পরে স্নান করিবার কালে তাঁহার পায়ে ঝিনুক বিদ্ধ হইয়া ক্ষত হয় ও সেই ক্ষত বিষাক্ত হইয়া ভীষণাকার ধারণ করে। তজ্জন্য দুইমাস তাঁহাকে অশেষ দেহকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল।

কলিকাতায় যখন প্লেগ হয় মহারাজ সেই সময়ে বসু-ভবনে। একদিন তিনি দোতলার বারান্দায় পায়চারি করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন,

একটি চতুর্ভুজা মূর্তি, অসিখর্পরধারিণী, নাচিতে নাচিতে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া বাড়ীর অন্দরমহলে চলিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করিয়া তিনি বেলুড় মঠে চলিয়া আসেন। পরে খবর আসিল, শান্তিরামবাবুর স্ত্রী প্লেগে মারা গিয়াছেন, এবং ঐ বাড়ীর একটি ঝিও মারা গিয়াছে।

পুরী হইতে আসিয়া মহারাজ কিছুদিন উদ্বোধনে বাস করেন। দোতলার একটি ঘরে তিনি থাকিতেন, আর উহার ঠিক নীচের ঘরটিতে থাকিতেন প্রজ্ঞানন্দ। একদিন রাত্রি প্রায় নয়টার সময় মহারাজ জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন, একটি সূক্ষ্মদেহী বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। কয়েকদিন পরে সকালবেলা অনুরূপ আর একটি মূর্তিও দেখিলেন। দুইবার দুই মূর্তি দেখিবার পর তিনি বেলুড় মঠে চলিয়া যান। ইহার কয়েকদিন পরেই খবর আসিল, প্রজ্ঞানন্দ দেহরক্ষা করিয়াছেন। মহারাজ কহিলেন, আমি জানতুম, আর একটি যাবে। অল্পদিন পরেই প্রজ্ঞানন্দের সহকর্মী চিন্ময়ানন্দ চিকিৎসা করাইতে আসিয়া উদ্বোধনে দেহরক্ষা করেন।

মুমূর্ষু এক রোগীকে ডাক্তার বৈদ্য সকলেই জবাব দিয়া যায়। ডাক্তার কাঞ্জিলাল হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া উহাকে নিরাময় করেন ও মহারাজের কাছে আসিয়া ঘটনাটি বলেন। চিকিৎসাগুণে রোগী সারিয়াছে, ডাক্তারের এইরূপ মনোভাব লক্ষ্য করিয়া মহারাজ কহিলেন: ভগবান ভাল করেচেন। তুমি ওষুধ দিয়েচ বলেই যে ভাল হয়েচে তা নয়। প্রত্যেক অসুখের, বিশেষতঃ কঠিন কঠিন অসুখগুলির, একএকটি উপদেবতা (অধিষ্ঠাত্রী) আছেন, তাঁদের প্রসন্নতা না হলে রোগী বাঁচে না।[৩]

[৩] বেলুড় মঠের পুরাতন যুগে একদিন দুপুরবেলা শরৎ মহারাজ উঠানে দাঁড়াইয়াছিলেন, দেখিতে পাইলেন এক কুৎসিতা কৃষ্ণাঙ্গী নারী, পরিধানে একখানি গামছা, বাহির হইতে আসিয়াই দ্রুতপদে খাবারের জায়গার অভিমুখে চলিয়াছে। তিনি দুহাত প্রসারিত করিয়া রুখিয়া দাঁড়াইলেন ও বলিলেন, তোমাকে এদিকে যেতে দেব না. মেয়েটি তখন পশ্চিমদিকের খিড়কীর দরজা দিয়া ইটখোলার দিকে চলিয়া গেল। তারপরেই কলেরার মড়ক হইয়া ইটখোলার বহু শ্রমিক মারা পড়ে। শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, ইনি কলেরার দেবতা। [ অসিতানন্দ-কথিত ]

## (১৫) বৃক্ষসেবা

ভুবনেশ্বর মঠের হাতার মধ্যে কাঁকরে পরিপূর্ণ যে প্রশস্ত জমি ছিল সম্বৎসরের মধ্যেই মহারাজ তাহা ফলফুলের গাছে পরিশোভিত করেন। যে কেহ আসিয়া দেখিত সেই মনে করিত মরুভূমিতে যেন মরূদ্যান হইয়াছে। এখানেই তিনি বলিয়াছিলেনঃ গাছেরও প্রাণ আছে, যত্ন করলে বুঝতে পারে। যে যত্ন করে সে কাছে গেলে উৎফুল্ল হয়, তার বিচ্ছেদে বেদনা অনুভব করে—প্রিয়জনের অভাবে মানুষ যেমন বেদনা বোধ করে তেমনি। গাছ কখনো নিমকহারাম হয় না, যে যত্ন করে ফলফুল দিয়ে তার সেবা করে।[১]

ভুবনেশ্বরে তখন খাম আলু, কচু ও মিঠাকুমড়া ব্যতীত অন্য কোন তরকারি বড় একটা পাওয়া যাইত না। এই বিষয়ে স্থানীয় একটি প্রবাদ মহারাজ মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিতেনঃ আরু সারু বৈতি ককারু, তাকু মজা কাইকি পছারু। কলিকাতা হইতে মহারাজের এক শিষ্য সপ্তাহে দুইটি করিয়া তরকারির পার্সেল পাঠাইতেন, কিন্তু তাহাতে সকলের কুলাইত না। একদিন আঁচাইতে বসিয়া মহারাজ দেখিতে পাইলেন পয়োনালীর মুখে একটি চারা গজাইয়াছে। চারাটি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, এটি কুলিবেগুনের চারা, যেমনটি আছে থাক্। পরিচর্যার গুণে বহু ডালপালা মেলিয়া উহা শীঘ্রই ফলিতে শুরু করে এবং রাশি রাশি বেগুন দিয়া বেশ কিছুদিন ধরিয়া আশ্রম-বাসীদের সেবার প্রতিদান করে।

শশীনিকেতনের পেছন দিকে এককোণে কোনও গাছের একটি নিষ্পত্র কলম দেখিতে পাইয়া, বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক চক্রবর্তী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া মহারাজ জানিতে পারেন উহা পাতিনেবুর কলম, দুইতিন বছর ধরিয়া একই

---

১ বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ প্রেমহৃষ্টতনবো বরৃষুঃ স্ম॥ —শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।৩৫।৫
বনের লতা ও তরু নিজেদের মধ্যে বিষ্ণুকে ব্যক্ত করিতেই যেন ফুলে ফলে ভরিয়া উঠিয়াছে এবং শাখাভারে অবনত ও প্রেমে পুলকিততনু হইয়া মধুধারা বর্ষণ করিতেছে।

অবস্থায় আছে। এখনো তো বেঁচে আছে দেখছি—বলিয়াই তিনি গাছটির পরিচর্যা সুরু করিয়া দিলেন। দিন কয়েকের মধ্যেই উহাতে নূতন ফেঁকড়ি দেখা দিল এবং মাস কয়েকের মধ্যে উহা এক প্রকাণ্ড ঝাঁকড়া গাছে পরিণত হইল। মহারাজ শশীনিকেতনে থাকিতেই উহাতে ফুলও দেখা দিয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া যখন তিনি বসু-ভবনে আছেন, পুরী হইতে একদিন এক-ঝুড়ি বড় আকারের পাতিনেবু আসিল—তাঁহারই যত্নবর্ধিত বৃক্ষের প্রথম ফল!

স্বামিজীকে ডাক্তার বাতাবিনেবুর রস খাইতে বলিয়াছিল। মহারাজ কোন্ কোন্ জায়গায় উত্তম বাতাবি গাছ আছে সন্ধান নেন এবং ঐসকল গাছের কলম জোগাড় করিয়া আনিয়া অন্যূন পাঁচটি চারা বেলুড় মঠের জমিতে সারিবদ্ধভাবে লাগাইয়া দেন। তাঁহার একান্ত যত্নে শীঘ্রই গাছগুলি বাড়িয়া উঠে ও প্রচুর পরিমাণে ফলিতে আরম্ভ করে। ফলন্ত গাছগুলিকে সুদৃশ্য ঝাড়ের মত দেখাইত, ফলগুলিকে হাতে করিয়া অনায়াসে পাড়িয়া আনা যাইত। একটি গাছের নেবু ছিল আকারে বৃহৎ, উহার সাদা রঙের কোয়া-গুলি রসে পরিপূর্ণ ও সুমিষ্ট। স্বামিজী বাঁচিয়া থাকিতে গাছগুলিতে কেবল ফুল দেখা দিয়াছিল, সেইজন্য মহারাজ বহু দুঃখ করিতেন।

তাঁহার লাগানো আলফান্সো ও ভুতোবোম্বাই আমের দুইটি সুদৃশ্য গাছ ছিল। আলফান্সো বারমাস ফলিত। এই আমগাছ দুইটি ও বাতাবি গাছগুলি এখন আর নাই; যেখানে পরে ঠাকুরের মন্দির হইয়াছে উহারা সেইখানেই দাঁড়াইয়া ছিল এবং বহু বৎসর ধরিয়া ভক্তভগবানের সেবায় বৃক্ষজন্ম সার্থক করিয়াছিল।[২]

মহারাজের সংগৃহীত চারিটি গাছ—শ্বেতচন্দন, পুন্নাগ, নাগলিঙ্গম ও ঠোঙাবট আজও বেলুড় মঠের জমিতে গঙ্গার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। এই

---

২ শ্রীবৃন্দাবনের ফলপুষ্পভারে অবনত বৃক্ষসমূহকে দেখাইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অগ্রজকে বলিতেছেন:

অহো অমী দেববরামরার্চিতং পাদাম্বুজং তে সুমনঃফলার্হণম্।
নমন্ত্যুপাদায় শিখাভিরাত্মন স্তমোঽপহত্যৈ তরুজন্ম যৎকৃতম্ ॥—শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০।১৫।৫

সকল বৃক্ষের কোনটি মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সাধুদের হাত দিয়া লাগাইয়াছেন, কোনটি বা লোকমারফত পাঠাইয়া দিয়া কোথায় কিভাবে লাগাইতে হইবে বলিয়া দিয়াছেন।

গঙ্গাধর মহারাজের মুখে শুনিয়াছি, মঠের উদ্যানে মহারাজ এত বৃহৎ গোলাপ ফুল ফুটাইয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া স্বামিজী বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, রাজা করেচে কী! পরবর্তী কালে ভুবনেশ্বর মঠেও এইরূপ সুবৃহৎ গোলাপ ফুটাইতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন।

বেলুড় মঠের ফুলবাগান তখন নানাজাতীয় গোলাপে রঙীন হইয়া থাকিত। কেহ বেশী ফুল তুলিয়া গাছগুলি শ্রীহীন করে ইহা তিনি পছন্দ করিতেন না। বলিতেন, বিরাটের পূজো হচ্চে। যে ফুলগুলি পাতার আড়ালে থাকে, বাহির হইতে সহজে চোখে পড়ে না, ঠাকুরপূজার জন্য সেইগুলিই তুলিতে বলিতেন। একদিন খুদুমণিকে বড় গোলাপ তুলিতে উদ্যত দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ওফুলে পূজা হবে না, আমি গাছশুদ্ধ ঠাকুরকে নিবেদন করে দিয়েচি। খুদু শ্রীশ্রীমায়ের ঠাকুরপূজার জন্য লইয়া যাইবেন শুনিয়া বলিলেন, মায়ের জন্যে হলে নিয়ে যা।

মঠের জমিতে মহারাজ কতিপয় ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা নামে প্রসিদ্ধ ফুলের গাছ লাগাইয়াছিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে হরিপদ (প্রণবানন্দ) একদিন ডালশুদ্ধ দুইটি ফুল তুলিয়া ফেলেন। ইহার শাস্তিস্বরূপ হরিপদকে সেদিন বাহিরে ভিক্ষা করিয়া খাইতে হইয়াছিল।

বাঙ্গালোরে থাকিতে মহারাজ প্রায় রোজই বিকালে মহীশূরের মহারাজার বিখ্যাত পুষ্পোদ্যান লালবাগে বেড়াইতে যাইতেন। মহাযুদ্ধ বাঁধিবার আগে ঐ বাগানে একজন জার্মান মালী ছিল। প্রস্ফুটিত ফুলের রাশি ও পারিপার্শ্বিকের সুসমঞ্জস শোভা দেখিতে দেখিতে মহারাজ ভাবস্থ হইয়া যাইতেন। ফুল দেখাইয়া বলিতেন, দেখেচ, দেবকন্যারা যেন হাসচেন! ঘাস দেখাইয়া বলিতেন, মা যেন মখমল বিছিয়ে রেখেচেন! বিভিন্ন ফুল ও লতাপাতা

দেখাইয়া উহাদের নাম বলিয়া দিতেন। তাঁহাকে নিবিষ্টমনে পুষ্পসম্বন্ধীয় গ্রন্থ ( ক্যাটালগ ) পড়িতে দেখা গিয়াছে।

বাঙ্গালোর মঠবাড়ীর ভিতরের দিকের উঠানে একটি আপেলগাছ ছিল, মহারাজের ইচ্ছা হইল গাছটিকে ঘিরিয়া বৃত্তাকারে দোপাটি ফুল লাগাইবেন। অমূল্য মহারাজ লালবাগ হইতে উত্তম দোপাটির বীজ সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইল এবং দেখিতে দেখিতে গাছগুলি ফুলেফুলে একেবারে ভরিয়া গেল—তুষারশুভ্র ফুল, মাঝে মাঝে ভিন্ন রঙের রেখার আমেজ থাকায় সৌন্দর্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আহারান্তে মহারাজ সেই দিকে আচমন করিতে আসিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিতেছেন। ফুলগুলির দিকে চাহিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, ফুলগুলি কেমন দেখতে হয়েচে? ঈশ্বর কহিলেন, অতি চমৎকার ফুল। 'অতি সুন্দর ফুল তো?' 'হ্যাঁ মহারাজ, অতি সুন্দর ফুল।' 'তবে এক কাজ কর্, এখানে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে তিনবার বল্—দোপাটি ফুল অতি সুন্দর। গলার পর্দা ক্রমে ক্রমে উঁচুতে চড়াবি।' সেবক আদেশ পালন করিতেই ব্যাপারখানা কী দেখিবার জন্য ভূমানন্দ, গোপালানন্দ, বিদেহানন্দ প্রভৃতি সকলেই বাহিরে আসিলেন। মহারাজ তখন বিস্মিতচোখে ঈশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। তাঁহারা কী হইয়াছে জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, এই দেখ না, আঁচাতে এসে আমার হাতে জল দেওয়াই হল না, ঠায় দাঁড়িয়ে আছি, আর ঈশ্বর কী বিকট চীৎকারই না জুড়ে দিয়েচে! ফুল দেখে ওর ভাব হয়েচে!

এমনই করিয়া মহারাজ যেখানে যেখানে কিছুদিনও বাস করিয়াছেন, সেই সেই স্থানকেই ফুল ও ফলের গাছে সুসজ্জিত করিয়াছেন। ঐসকল স্থানের কাহারো সহিত দেখা হইলে তিনি গাছপালাগুলির তত্ত্ব লইতে ভুলিতেন না। জিজ্ঞাসিত হইলে সঠিক উত্তর দিতে হইবে বলিয়া সাধুরা তখন মঠের বিভিন্ন গাছপালার সংখ্যা, অবস্থান ইত্যাদি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। সকলেই, বিশেষতঃ সংসারত্যাগী সাধুরা বৃক্ষসেবা করেন মহারাজ ইহা চাহিতেন। বৃক্ষসেবায় মনও ভাল থাকে, তিনি বলিতেন।

ঠাকুরের উৎসবের সময়, বেলগাছগুলি প্রায় নিষ্পত্র হইয়াছে, ফুলও যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে না। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ফুলপাতা সংগ্রহ করিতে হইতেছে। সকালবেলা খুড়ুমণিকে মঠের বাহিরে যাইতে দেখিয়া মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরে, কোথায় যাচ্ছিস? খুড়ুমণি কহিলেন, ফুল বেলপাতার বড় মুশকিল, পাওয়া যায় না। মহারাজ বলিলেন: গাছগুলোর তলা খুঁড়ে দে, গোয়ালের নর্দমার মাটি নিয়ে গিয়ে তলায় দে, একটু একটু জল দিবি, দেখবি দিব্যি ফুল ফুটবে।[৩] কল্যাণেশ্বরের কাছে যা, একটি বেলগাছ পাবি যার নতুন পাতা গজিয়েচে। আর কাশীপুর শ্মশানে পরামাণিক ঘাটের কাছে একটা বেলগাছ আছে, তার একএকটা পাতায় চারটা পাঁচটা ছটা পর্যন্ত [ অবান্তর ] পাতা পাবি।

ভুবনেশ্বর হইতে ২৫-১১-১৯২১ তারিখের এক পত্রে মহারাজ লিখিয়াছেন: "বাঙ্গালোরে থাকিতে লালবাগ হইতে কয়েক প্রকার ভাল ভাল গাছ এবং বীজ ইত্যাদি পাঠাইয়াছিলাম। সঙ্গে করিয়া বিশেষ কিছুই আনি নাই, মাত্র কয়েক প্রকারের জবার চারা আনিয়াছি। এপ্রকার জবা প্রায় দেখিতেই পাওয়া যায় না। একপ্রকার জবা আছে তাহা হাতে লইয়াও ভ্রম হয় যেন একটি বড় স্থলপদ্ম।"

## (১৬) কৌতুকী

রসিকশেখর শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র শ্রীরাখাল আজীবন রঙ্গরসপ্রিয় ছিলেন। একই সময়ে স্তব্ধ গভীরতা ও চঞ্চল বীচিবিক্ষোভ হইয়া সমুদ্র যেমন আপন মহিমায় বিরাজ করে, ব্রহ্মসমুদ্রাবগাহী ব্রহ্মানন্দচরিত্রও তেমনিধারা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কখনো সমাধির নিস্পন্দ গভীরতায়, কখনো বা রস-

---

৩ নিজের তত্ত্বাবধানে মহারাজ বিভিন্ন প্রকার গাছের জন্য বিভিন্ন সার প্রস্তুত করাইতেন।

স্বরূপের নৃত্যধর্মী চঞ্চলতায়। সেই রসোচ্ছলতারই এক বহিরঙ্গপ্রকাশ তাঁহার কৌতুকপ্রিয়তা।

মহারাজের ইচ্ছা হইল, ঠাকুরের মহোৎসব দিনে (১৯১২) মহাপুরুষজীকে অভিনব সাজে সাজাইবেন। বিশাল মঠভূমি যখন লোকে লোকারণ্য সেই সময় তিনি বলিলেন, তারকদা, একটা মজা করা যাক—আপনার জন্যে এই ধুতি পাঞ্জাবি আর চাদর ঠিক করে রেখেচি, গেরুয়া ছেড়ে, এগুলি পরে সমস্ত উৎসবক্ষেত্রটা ঘুরে আসুন, ভক্তেরা দেখে অবাক হয়ে যাবে। মহাপুরুষ সানন্দে সম্মত হইলেন, সাদা ধুতি চাদর পাঞ্জাবি পরিয়া সমস্ত উৎসবক্ষেত্র ঘুরিয়া আসিলেন।

বর্ধমান হইতে আসিয়া এক তরুণ যুবক কনখল সেবাশ্রমে উঠিয়াছে বদরিকাশ্রমে যাইবে। তাহার বাবার বাক্‌স হইতে কিছু টাকা নিয়া সে পলাইয়া আসিয়াছে। মহারাজ তখন কনখলে, ছেলেটিকে তিনি বদরিকাশ্রমে যাইতে নিষেধ করিলেন, নিজের কাছে রাখিয়া কিছুদিন তাহার সেবাও গ্রহণ করিলেন। দুপুরবেলা মহারাজ ও হরি মহারাজ বাহিরে বসিয়া আছেন, ছেলেটিও বসিয়া আছে ; নানাকথা হইতেছে, হঠাৎ মহারাজ দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং বাঁ হাত কোমরে রাখিয়া ও ডান হাতের আঙ্গুল কপালে ঠেকাইয়া নর্তকীর ভঙ্গীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছেলেটীকে বলিতে লাগিলেন : যখন ছিল বয়েস বারো, সুতোয় সুতোয় দিতাম গেরো ; সেই অবধি লাগল গেরো, এখন লাজে তুলি না মাথা।[১]

সকালবেলা মহারাজ মঠের জমিতে পায়চারি করিতেছিলেন। একটি যুবক আসিয়া জোড়হাতে বলিল, আমি ব্রহ্মানন্দ-স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চাই, আমি সাধু হতে চাই। চায়ের টেবিলে তখন মহাপুরুষ বসিয়াছিলেন, মহারাজ কহিলেন, ঐদিকে যাও, দেখবে টেবিলের পাশে একজন বেশ হৃষ্টপুষ্ট বসে আছেন, উনিই হচ্চেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। যুবকটি মহাপুরুষের কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, আমি আপনার কাছে এসেচি। 'যার কাছে এসেছ তার

১ নির্মলানন্দ-কথিত।

নাম কী ?' মহাপুরুষ প্রশ্ন করিলেন। 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ।' 'স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঐ মাঠে বেড়াচ্ছেন।' 'আজ্ঞে তিনি বলে দিলেন আপনিই স্বামী ব্রহ্মানন্দ।' 'না, আমি নই, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঐ মাঠে বেড়াচ্ছেন।' যুবকটি তখন মহারাজের কাছে গিয়া সেকথা নিবেদন করিতেই তিনি কহিলেন, না না, আমি নই; মহাপুরুষরা অনেক ছলনা করে থাকেন, তোমাকে ধরা দিচ্চেন না; আবার গিয়ে তাঁকে ধর, কিছুতেই ছাড়বে না। মহাপুরুষের কাছে গিয়া এবার সে যথেষ্ট বকুনি খাইয়া আসিল। মহারাজ কহিলেন, তোমাকে তো বল্লুম, মহাপুরুষরা ছলনা করে থাকেন, এমনকি মারধর পর্যন্ত করেন, তুমি তাতেও ছাড়বে না, পা আঁকড়ে পড়ে থাকবে। যুবকটি দিশাহারা হইয়া পড়িল। তাহার চক্ষু ছলছল হইয়াছে দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, আচ্ছা, ওখানে যাও, তুমি এখন মঠে থাকবে।

বাবুরাম মহারাজ বসু-ভবনে অসুস্থ। উদ্বোধন হইতে ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়া মহারাজ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে ঈশ্বরের ছিল বকুনি-মধুর সম্বন্ধ।[২] কিন্তু বকুনির মধুর রসটি তৎকালে উপভোগ্য হইত না, আর ঈশ্বরও পারত পক্ষে বাবুরাম মহারাজের সম্মুখে আসিতেন না। অস্থিচর্মসার দেহে বাবুরাম মহারাজ শুইয়া আছেন চিত হইয়া, কুশল প্রশ্নাদির পর মহারাজ কহিলেন : জান বাবুরামদা, আমাদের ঈশ্বর যে কবি, জান ? তার কবিতা শুনেচ ? ওরে ঈশ্বর, এদিকে আয়, তোর কবিতা বাবুরাম মহারাজকে শোনাস নি ? নে, তাঁকে শোনা। ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকিয়া কবি আবৃত্তি সুরু করিলেন—

কোন্ অজানা দেশের অজানা প্রেম আজিগো মোরে ছেয়েছে।
তাই থাকি থাকি আজি পরাণ মোর আনন্দে মাতি উঠিছে ॥

---

২ লীলাসম্বরণের দুইএকদিন পূর্বে বাবুরাম মহারাজ ঈশ্বরকে ডাকিয়া পাঠান, কিন্তু বকুনির ভয়ে ঈশ্বর দেখা করিতে চান না। তখন বকিবেন না বলিয়া কথা দিয়া ঈশ্বরকে তিনি নিজের কাছে আনাইলেন ও ধমক দিয়া বলিলেন : এ বেটা, আমি তোকে বকি ? আমি বকি! স্বামিজী চেয়েছিলেন, তোদের গীতার জীবন হোক। তা দেখতে পাই না বলে বকি। যাদের বেশী ভালবাসি তাদের আমি বকি বেশী।

স্বপনের ঘোরে আপনারে ভুলে ডুবেছিনু ঘোর আঁধারে।

কে যেন আসি স্নিগ্ধ পরশে জাগায়ে দিল যে আমারে॥ ইত্যাদি।

একটি কবিতার আবৃত্তি শেষ হইতে মহারাজ বলিলেন, আরেকটি শোনা। বাবুরাম মহারাজ অমনি তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিলেন ও পাঠোদ্যত কবিকে ধমক দিয়া কহিলেন ঃ থাম্ বেটা। তুমি জান না মহারাজ, ও বেটা মুখ্যু, ও আবার কবিতা লিখবে কী? মাসিক পত্রিকায় ওরকম কবিতা ঢের বেরয়— আমি আজকাল শুয়ে শুয়ে একটু আধটু পড়ি কিনা। তা থেকে নকল করে নিয়ে তোমাকে শুনিয়েচে। বেরো বেটা ঘর থেকে। 'না না, আমি জানি ওই লিখেচে, ও পত্রিকা টত্রিকা পড়ে না।' 'তুমিও যেমন, ও আবার কবিতা লিখবে! ও বেটা আকাট মুখ্যু!'

পূজনীয় কালী মহারাজ (অভেদানন্দ) আমেরিকা হইতে আসিয়াছেন। তিনি কোন কিছু করিতে বলিলেই কর্মকর্তারা বলেন, মহারাজ যদি বলেন তো আমরা করব, আপনি তাঁকে বলুন। এই ধরণের কথা শুনিয়া শুনিয়া তিনি বিরক্ত হইলেন, একদিন মহারাজের খাওয়ার সময় হঠাৎ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ, এ কী তুমি করেচ? সবাই কেবল তোমার নাম করবে, তুমি বল্লেই তবে করবে, আর কেউ বল্লে করবে না, তুমি কি এদের স্লেভ (ক্রীতদাস) তৈরি করেচ?—কেবল মহারাজ, মহারাজ! মহারাজ কহিলেন ঃ দেখ, আমাকে কেউই মানে না। সত্যিকার এরা মানে, শ্রদ্ধা করে হরি মহারাজকে; আর কিছু মানে শরৎ মহারাজকে। এবার তুমি এসেচ, তোমরাই সব দেখাশোনা কর। বুড়ো হয়ে গেছি, চুপচাপ এক জায়গায় পড়ে থাকতে চাই, আমি ভুবনেশ্বরে পড়ে থাকব। আর আমাকে যে মানে বলচ, সেটা আর কিছুর জন্যে নয়, এই যে দেখচ (থালার চারিপাশের বাটিগুলি দেখাইয়া), সবই পড়ে থাকবে, এরই জন্যে! তাহার কথায় ও মুখের ভাবে সকলেই হাসিয়া উঠিল, তোমার সব কথায় ঠাট্টাতামাসা!—বলিয়া কালী মহারাজও হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

মঠের দোতলার বারান্দায় দুইখানি চেয়ারে বসিয়া মহারাজ ও হরিপ্রসন্ন

মহারাজ (বিজ্ঞানানন্দ) কৌতুকচ্ছলে কথা-কাটাকাটি করিতেন। একদিন মহারাজ নিলেন আস্তিকের পক্ষ, হরিপ্রসন্ন মহারাজ নাস্তিকের। হরিপ্রসন্ন মহারাজকে হার মানিতে হইল, মহারাজ তাঁহার সকল যুক্তিই খণ্ডন করিলেন। পরদিন মহারাজ নিলেন নাস্তিকের পক্ষ, আর হরিপ্রসন্ন মহারাজ আস্তিকের। তাহাতেও ফলের ইতরবিশেষ হইল না, মহারাজকে হারাইতে পারা গেল না। কথা-কাটাকাটি হইতে হইতে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যার সময় মহারাজ গঙ্গাজল স্পর্শ করিতেন, সেবক তাঁহার হাতে গঙ্গাজল ঢালিয়া দিতেছেন দেখিয়া হরিপ্রসন্ন মহারাজ তর্কের জের টানিয়া কহিলেন, এ কী হচ্চে মহারাজ, এখন যে আস্তিকের মত কাজ হচ্চে? মহারাজ উত্তর দিলেন, এটা কী জান— সংস্কার; গঙ্গাজল স্পর্শ করা একটা সংস্কারে দাঁড়িয়েচে; কোন মতেই একে আস্তিকতা বলা চলে না।

গঙ্গাধর মহারাজের সঙ্গে মহারাজের কৌতুকাভিনয় একএক সময়ে মাত্রা ছাড়াইয়া যাইত। কোঠার হইতে গঙ্গাধর মহারাজ কলিকাতা ফিরিবেন, জেদ ধরিয়াছেন আর একদিনও থাকিবেন না। রাত্রে আহারের পর পালকিতে চাপিয়াছেন, পাঁচক্রোশ রাস্তা পালকিতে যাইতে হইবে, খানিক পরেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। বাহকেরা মহারাজের ইঙ্গিত অনুসারে কাজ করিল—উল্টাপথে চলিয়া কোঠারের বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করিল, এবং আরোহীর ঘুমের ব্যাঘাত না জন্মাইয়া নিজেরাও বিশ্রাম করিতে গেল।

রামকৃষ্ণ বসুর কন্যা মহামায়া বলেন: মহারাজ একদিন আমার হাতে একটি খাম দিয়া বলিলেন, চিঠিখানা গঙ্গাধর মহারাজকে দিয়ে আয়। গঙ্গাধর মহারাজ খাম খুলিয়াই দেখেন, তাহাতে এমন কিছু জিনিস আছে যাহা অযাত্রা। সেদিন তাঁহার কোথাও যাওয়া হইল না!

মহামায়ার 'যমুনা-সই' চিন্ময়ী বলেন:

মহারাজ কোথা হইতে একটি কাঁকড়ার ছবি যোগাড় করিয়াছেন, আমার হাতে দিয়া বলিলেন, গঙ্গাধর মহারাজকে দিয়ে আয়। কাঁকড়া ভীষণ অযাত্রা, গঙ্গাধর মহারাজ সেদিন ঘর হইতে বাহির হইলেন না।

সকালবেলা আমি ও মহামায়া গঙ্গাধর মহারাজের ঘরে গিয়া বলিলাম, গঙ্গাধর মহারাজ, সুপ্রভাত! তিনি চক্ষু ফিরাইয়া নিলেন। আবার বলিলাম, গঙ্গাধর মহারাজ, সুপ্রভাত! 'না, আমি চাইব না, না, আমি চাইব না—আমি সব জানি, সব রাজার কাজ।' 'না গঙ্গাধর মহারাজ, আমরা আপনাকে প্রণাম করতে এসেচি।' গঙ্গাধর মহারাজ ভাল মানুষ, আমাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া যেমন তিনি আমাদের দিকে তাকাইলেন, আমরাও তাঁহাকে একচক্ষু দেখাইলাম—তাঁহার যাত্রা ভঙ্গ হইয়া গেল!

বেলুড় মঠ হইতে গঙ্গাধর মহারাজ সারগাছি যাইবেন, বিছানাপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়াছেন। মহারাজ তাঁহাকে সেদিন যাইতে মানা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যাইবেনই। মহারাজের ইঙ্গিতে ছেলেরা তখন গঙ্গাধর মহারাজকে ঘিরিয়া কাঁসর-ঘণ্টা-শাঁখ বাজাইতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ একচক্ষু দেখাইল, অন্যেরা কাঁকড়া-কচ্ছপ-ধোপা বলিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল। গঙ্গাধর মহারাজ চোখ বুজিয়া দুর্গা দুর্গা জপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় মহারাজ আসিয়া বলিলেন, গঙ্গাধর, সারগাছি যাবে না? গঙ্গাধর মহারাজ যেন অকূলে কূল পাইয়া কহিলেন, তুমি এ বেটাদের সরিয়ে নাও। মহারাজ বলিলেন, দেখ, তোমাকে এরা কত ভালবাসে! তোমাকে এরা চায়, আমার কথা কি এরা শুনবে? গঙ্গাধর মহারাজের যাত্রা মুলতবী রহিল।[৩]

বাঙ্গালোর মঠের বারান্দায় মহারাজ আরামকেদারায় বসিয়া আছেন। বারান্দার সম্মুখে পানপাতার আকারে সাজানো সুপ্রশস্ত উদ্যান, তাহাতে গোলাপাদি বিবিধ পুষ্পবৃক্ষ ও লতাকুঞ্জ। বারান্দায় বসিয়া লক্ষ্য করিলে, মঠের দিকে আগন্তুক লোকজনকে দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু রাস্তা হইতে বারান্দার লোকজনকে দেখা যাইত না। মিস্ ম্যাকলাউড দেখা করিতে আসিতেছেন বুঝিতে পারিয়া মহারাজ তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন ও তুলসী মহারাজকে বলিলেন, আমার শরীরটা আজ ভাল নাই বলে দিয়ো। উপর উপর তিনদিন একই ব্যাপার ঘটিল, ম্যাকলাউডের দেখা করার জেদও

৩ গৌরীশানন্দ-কথিত।

চরমে উঠিল। চতুর্থ দিন বুদ্ধিমতী মেয়ে গাছপালার মত গাঢ় সবুজ রঙের পোষাকে সর্বাঙ্গ আবৃত্ত করিলেন, এবং গাছপালা ও লতাকুঞ্জসমূহের আড়ালে থাকিয়া, হামাগুড়ি দিয়া কোনরূপে চলিয়া আসিয়া, হঠাৎ মহারাজের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া বলিলেন, দুষ্টু ছেলে, এখন তুমি পালাবে কোথায়? মহারাজ কতকটা থতমত খাইয়া বলিলেন, আজ আমি বেশ ভাল আছি। 'ধরে ফেলেচি কিনা, এখন তো বলবেই!' হাসিতে হাসিতে ম্যাকলাউড প্রত্যুত্তর করিলেন।

প্রশান্তানন্দের বর্ণনা ঃ

কাশীর দুইটি আশ্রমের মধ্যে মন-কষাকষি, মহারাজ জানিতেন। কেহ সাধুদিগকে খাওয়াইবে, তিনি অদ্বৈতাশ্রমে উহার ব্যবস্থা করিয়া সেবাশ্রমের সকলকে নিমন্ত্রণ করাইতেন, কখনো বা সেবাশ্রমে ব্যবস্থা করিয়া অদ্বৈতাশ্রমের সকলকে। এই খাওয়ানোর ব্যাপার বা ভাণ্ডারার তিনি নাম দিয়াছিলেন, 'হরের্নমঃ'। একদিন মহারাজ আমাকে জরির পাড বসানো হিন্দুস্থানী পোশাকে সাজাইলেন। পায়ে নাগরা জুতা, মাথায় পাগড়ি, হাতে লাঠি—ঠিক যেন ঐদেশীয় কোন রাজা বা সম্ভ্রান্ত জমিদারের চাপরাসী। তারপরে একটি আবদ্ধ খাম, খামের উপরে সেবাশ্রমের সেক্রেটারীর নাম টাইপ করা, আমার হাতে দিয়া কহিলেন, সেবাশ্রমে চারুবাবুকে দিয়ে আয়, চারুবাবু যদি চিনতে পারে, তোর মাথা ভেঙে দেব। কিভাবে কুর্নিশ করিয়া খামটি দিতে হইবে তাহাও শিখাইয়া দিলেন। সেবাশ্রমে এই জাতীয় লোক কালে-ভদ্রে আসে। আমি যাইয়া কুর্নিশ করিতেই চারুবাবু মাথা নুয়াইয়া প্রত্যভিবাদন করিলেন। বিশেষ জরুরী খবর মনে করিয়া গম্ভীরমুখে খামটি হাতে নিলেন ও সন্তর্পণে কাঁচি দিয়া কাটিলেন। খামের মধ্যে দেখেন কী, এক টুকরা কাগজে লেখা আছে শুধু 'হরের্নমঃ'। আমার দিকে চাহিয়া তিনি হাসিয়া ফেলিলেন। আমি বলিলাম, জবাব দিজিয়ে। তিনি 'এক্সেপ্টেড' (গৃহীত হইল) লিখিয়া দিলেন।

কোন ঘটনায় রাগ করিয়া অদ্বৈতাশ্রমের মোহন্ত চন্দ্র মহারাজ আমার

সঙ্গে কথা কহিতেন না। কাজকর্ম সবই চলিতেছে, কেবল কথাটি নাই। একদিন বিকালবেলায় মহারাজ সেবাশ্রমের মাঠে বসিয়া আছেন, আর আমি তাঁহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতেছি, জিজ্ঞাসা করিলেন, শালিক পাখীর বুলি জানিস? আমি বলিলাম, না। তিনি কহিলেনঃ বল্—রিরিরী, কটকটকট, পাপীচ পাপীচ, খেন্দিকির্কিচ্, কিদার্কিচ্ ঈশন্মিশন্ ঢ্যাপ্ ঢ্যাপ্, কিষ্টকিশোর কিষ্টকিশোর, ডুগ্‌ডুগাডুগ্, প্লীং প্লাই। কিভাবে বুলি আওড়াইতে হইবে, 'প্লীং প্লাই' বলার সঙ্গে সঙ্গে কিরূপ ভঙ্গী করিয়া সরিয়া পড়িতে হইবে, কয়েকদিন ধরিয়া এই সব শিখাইলেন। তারপরে যখন তখন আবৃত্তি করিতে বলিয়া আশ্রমবাসীদের সমক্ষে অভিনয়ে অভ্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

অদ্বৈতাশ্রমে উৎসব, হলটি লোকে পরিপূর্ণ। হঠাৎ শুনিতে পাইলাম চন্দ্র মহারাজ উচ্চৈঃস্বরে আমার নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। কাছে যাইতেই বলিলেন, মহারাজ ডেকেচেন! মহারাজ তখন হলেই বসিয়াছিলেন, কহিলেন, শালিক পাখীর বুলিটি বল। আমি কেবলই ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার আদেশ করিলেন। আদেশ পালন করিলাম। সকলে হাসিয়া খুন, এমনকি মোহন্ত চন্দ্র মহারাজও। সেই দিন হইতে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন ও আমার সঙ্গে কথা কহিতে সুরু করিলেন।

বেলুড় মঠে বিপিন ডাক্তারকে মহারাজ অনেক রগড়ের চিঠি লিখিতেন। চিঠিগুলি চন্দ্র মহারাজের নামে যাইত, আর চন্দ্র মহারাজই লিখিয়াছেন মনে করিয়া সে রাগিয়া গালাগাল দিয়া উত্তর দিত। সেই উত্তরের আবার প্রত্যুত্তর যাইত বাঙলা সংস্কৃত বা ফরাসী ভাষায়। এলাহাবাদের এক বহুভাষাবিৎ উকিল কাশীতে মহারাজের কাছে আসিতেন, তাঁহাকে দিয়া ফরাসী ভাষায় লেখাইতেন, আর সেই চিঠিতে কী গালাগাল আছে জানিবার জন্য ডাক্তারকে কলিকাতায় ফরাসী-জানা লোকের কাছে

ছুটিতে হইত। আমাকে দিয়া একবার সংস্কৃত পদ্যে লেখাইয়াছিলেন, একটি শ্লোক আজও মনে আছে ঃ

জেৎস্যস্যস্মান্ রণে কিং ত্বং দুরাশা মহতী তব।

জয়ঃ সিংহাহবেঽজস্য ক্ব বিপিনবিহারিণঃ॥

যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজিত করিতে চাও কি তুমি? তোমার পক্ষে ইহা অতি বড় দুরাশা। সিংহের সহিত লড়াই যেখানে, বুনো ( অথবা বিপিন-বিহারী নামক ) ছাগলের জয়সম্ভাবনা সেখানে আছে কি?

চিঠির সঙ্গে পার্সেল করিয়া ডাক্তারকে মহারাজ কখন কখন উপহার পাঠাইতেন। প্যাক করা বাক্সটি খুলিবামাত্র হয়তো প্রকাণ্ড সাপ ফণা ধরিয়া দাঁড়াইল, কিংবা গিরগিটি লাফ দিয়া মাথায় উঠিল। বলা বাহুল্য, ইহারা খেলনার সাপ ও গিরগিটি মাত্র।

কলিকাতা হইতে কাইজার ( ললিত চাটুজ্যে ) মহারাজকে লিখিয়াছেন তাঁহার মত লোকের উদ্ধারের একটা সহজ উপায় বাতলাইবার জন্য। পত্র খানি পদ্যে লেখা। বাঙ্গলায় পদ্য লেখার অভ্যাস এককালে আমার ছিল জানিয়া মহারাজ কহিলেন, এই এই কথাগুলো...লিখে ওর চিঠির জবাব দিতে হবে, আর তাতে নরী পরী নাম দুটো জুড়ে দিবি। নরী পরী থিয়েটারের দুই অভিনেত্রী, কাইজারের পরিচিত লোক। জবাবের প্রথম কথাই হইল, 'কত নরী পরী আদি মহাপাপী উদ্ধারিলে।' অর্থাৎ, যে-তুমি উহাদের মত কত লোককেই উদ্ধার করিয়াছ সেই তোমাকে আবার উদ্ধারের উপায় বাতলাইতে হইবে? ভুবনেশ্বর মঠের জন্য কাইজার থিয়েটারের বেনিফিট নাইট আদায় করিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু তখন পর্যন্ত কিছুই করেন নাই। আমি বলিলাম, নীচে লেখা থাকুক—বেনিফিটেড বাই ইয়োর বেনিফিট নাইট কশ্চিৎ আনন্দঃ। মহারাজ বলিলেন, ঠিক হয়েচে।

জবাবটি কাইজার বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের দুইএক জন জাঁদরেল সভ্যকে দেখান ও তাঁহারা প্রথমশ্রেণীর লেখা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁহাদের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া কাইজার তখন শরৎ মহারাজকে

এক পত্র দেন। সকালবেলা মহারাজকে প্রণাম করিতে যাইতেই তিনি কহিলেন, তোর একটা সার্টিফিকেট এসেচে। কলিকাতায় পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছি, সার্টিফিকেটের কথায় ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় সেটি? উত্তর দিলেন, শরৎ মহারাজের কাছে আছে। অমনি লক্ষ্মীনিবাসে শরৎ মহারাজের কাছে ছুটিলাম। এত সকালে যে এলি?—তিনি প্রশ্ন করিলেন। সার্টিফিকেটের কথায় প্রথমটা অবাক হইলেন, তারপরে মহারাজ বলিয়াছেন শুনিয়া বুঝিয়া নিলেন ও ভূমানন্দকে বলিলেন, চিঠির তাড়ায় ওর সার্টিফিকেট আছে, বের করে দাও। অনেক ঘাটাঘাটি করিয়াও ভূমানন্দ সার্টিফিকেট পাইলেন না, কাইজারের চিঠি শরৎ মহারাজ তখন নিজেই বাহির করিয়া দিলেন।

মুক্তেশ্বরানন্দের বর্ণনা:

সুকিয়া ষ্ট্রীটে ডাক্তার কাঞ্জিলালের বাসায় নৈশভোজন সারিয়া ভবানী ও আমি যখন বসু-ভবনে ফিরিলাম তখন রাত্রি প্রায় দুইটা। নূতন দারোয়ান কাপড় মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে, ডাকাডাকিতে কোনই ফল হইল না। উপরে মহারাজ আছেন, জোরে ডাকিতে সাহস নাই। প্রথমতঃ ছোট ছোট ঢিল পরে বড় বড় ইটের টুকরা জানলা গলাইয়া দারোয়ানের গায়ে ছুঁড়িতে লাগিলাম। তাহাতেও সে নড়ে না দেখিয়া একটি কাঁটাওয়ালা ডাল মাদার গাছ হইতে ভাঙ্গিয়া আনিলাম। সেই ডাল দিয়া উহার মুখে ও মাথায় দুইএক ঘা দিতেই সে উঠিয়া পড়িল ও ফটক খুলিয়া দিল। কেন এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল জিজ্ঞাসা করায় কহিল সে ভূত মনে করিয়াছিল। ভবানী শেষরাত্রে উঠিয়া মহারাজকে তামাক দিল। তামাক খাওয়ার পর ভিতরের দিকের বারান্দায় তিনি পায়চারি করিতেছেন, আর ইটের টুকরাগুলি ও মাদারের ডালটি হাতে নিয়া দারোয়ান সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া আছে—তাহার মুখে কাঁটার দাগ পড়িয়াছে। মহারাজ গম্ভীরভাবে পায়চারি করিতেছেন, যেন দেখিতেই পান নাই, আর দারোয়ানও কাছে আসিতে সাহস পাইতেছে না। মহারাজ একটু দূরে চলিয়া যাইতেই ভবানী দারোয়ানকে জাপটাইয়া ধরিয়া নীচে

লইয়া গেল ও কহিল, মহারাজকে বলিস না, তোকে বকশিস দিচ্চি। সেদিন আমার পকেটে কিছু ছিল, একটি টাকা দিতেই সে খুশী হইয়া গেল।

তাহার পরের ঘটনা। উৎসবের দিন মঠে ঘুরিয়া বেড়াইয়া ও কীর্তন শুনিয়া ক্লান্ত হইয়া—ইহাই তাঁহার শেষ উৎসব দেখা—মহারাজ উপরে গেলেন ও বলিলেন, 'ভবানী, আমি এখন বিশ্রাম করব, কেউ যেন না আসে। পাহারার জন্য সিঁড়ির নীচে দুইজন স্বেচ্ছাসেবক রাখা হইল, ভবানী রহিল উপরে। খানিক পরেই বশী আসিয়া উপস্থিত হইল। কোনরূপে স্বেচ্ছা-সেবকদের পাশ কাটাইয়া আসিয়াছে, এখন ভবানী ছাড়িয়া দিলেই হয়। প্রথমতঃ আপত্তি করিলেও, মহারাজের সঙ্গে সম্পর্ক বিবেচনা করিয়া ভবানী তাহাকে যাইতে দিল। বশীকে দেখিয়া মহারাজ খুশী হইলেন ও তাঁহার শরীর টিপিয়া দিতে বলিলেন। ওদের তো বারণ করে দিয়েছিলুম, তা তোকে ঢুকতে দিল?—মহারাজ প্রশ্ন করিলেন। বশী কহিল, আমাকেও মানা করেছিল, বিশেষভাবে ধরায় ছেড়ে দিয়েচে। আঙ্গুলে টাকা বাজাইবার নকল করিয়া মহারাজ বলিলেন, কিছু? (অর্থাৎ, টাকা ঘুষ দিয়ে ছাড়ান পেলে কি?)

গোকুলদাস দে লিখিয়াছেন ঃ

"কোন সময়ে বিবাহের ঘটককে তাহার কাজের অনুকূল কথাবার্তা মহারাজ শিখাইয়া দিতেছেন শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। হাস্যরস সৃষ্টি করিতে তাঁহার মত আর কাহাকেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তিনি আনন্দময় জগতের রাজরাজেশ্বর—সেই আনন্দের এক কণা মর্ত্যবাসীর নিকট ছড়াইয়া দেওয়া তাঁহার পক্ষে বিচিত্র কি!"

## (১৭) ক্রীড়া-কৌতুকে শিশুদের সাথে

বালকভাবটি মহারাজের স্বভাবসিদ্ধ। বালকভাবের আতিশয্যবশতঃ তিনি মুরুব্বি বা জ্ঞানপ্রবীণ লোকদের, শিষ্যস্থানীয় হইলেও, 'তুমি না বলিয়া 'আপনি' বলিতেন। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ও স্বামী কেশবানন্দের বেলায় ইহা দেখা গিয়াছে।

ফতুয়া-গায়ে মহারাজের একখানি ফটো পুলিনবিহারী মিত্রের ঘরে আছে। সেই ফটোখানি দেখাইয়া পুলিনবাবুকে বলিয়াছিলেন, দেখ্ দেখি কেমন বীরের মত বসে আছি!

মোটর গাড়ী করিয়া মহারাজ আসিতেছেন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট দিয়া, বালক কার্তিক সেই সময় ঐ রাস্তার ফুটপাথ দিয়া স্কুল হইতে ফিরিতেছিল। পরদিন কার্তিকের সঙ্গে দেখা হইতেই কহিলেন, কিরে, কাল আমি কেমন মোটরগাড়ী চড়ে আসছিলুম, দেখলি তো?

বসু-ভবনে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে অনেক আসিয়া জড় হইত, মহারাজ তাহাদের সঙ্গে তাহাদের মত হইয়া খেলা করিতেন। কখনো চোর-চোর খেলা, কখনো বা তাস। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে একত্র হইয়াছে, মহারাজ হয়তো একখানি মুখোশ পরিয়া হঠাৎ তাহাদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, আর তাহারা মাগো বাবাগো বলিতে বলিতে যে যেদিকে পারিল দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।

ছোটরা গল্প শুনিতে ভালবাসে। মহারাজ তাহাদিগকে গল্প বলিতেছেন: এক গয়লানীর ঘি-দই-দুধ বিক্রী করে অনেক টাকা হয়েচে, সেই টাকায় সে অনেকগুলি গয়না করেচে, দুটি হাত তার গয়নায় ভর্তি। খদ্দের এসেচে দেখে সে কী করে যে গয়না দেখাবে—দুটি হাত উপরে তুলে তালে তালে পা ফেলচে আর বলচে, ঘি নিবি কি দই নিবি, ঘি নিবি কি দই নিবি? বলিবার সঙ্গে সঙ্গে গয়লানীর চলার ভঙ্গীটিও তিনি অভিনয় করিয়া দেখাইতেছেন, ছেলেমেয়েরা হাসিয়া লুটোপুটি।[১]

---

১ মহামায়া-কথিত।

নিতাইবাবুর ছোট ছেলে একটা কাঠের হাতী লইয়া আসিয়া অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিল, মহারাজ, তুমি চড়—তুমি চড়—তুমি চড়। মহারাজ তখন বারান্দায় পায়চারি করিতেছিলেন। তাহার হাত হইতে হাতীটি নিয়া চড়িবার মত করিয়া গায়ে ঠেকাইয়া তিনি খানিক হাঁটিলেন উঁ-উঁ শব্দ করিতে করিতে। অদূরে দাঁড়াইয়া গোকুলবাবু দৃশ্য উপভোগ করিতেছিলেন, তাঁহার দিকে। চাহিয়া মহারাজও হাসিয়া উঠিলেন।

কাশ্মীর হইতে আনিয়া শ্যামবাবু মহারাজকে একটি আস্ত ভল্লুকের চর্ম উপহার দিয়াছিলেন। উহা পরিধান করিয়া দাঁড়াইলে সত্য সত্যই ভল্লুক বলিয়া ভ্রম জন্মিত। সন্ধ্যার পর মহারাজের ঘরটি অনুজ্জ্বল আলোকে ঈষৎ আলোকিত। তিনি বসু-বাড়ীর যাবতীয় বালক বালিকাকে আহ্বান করিয়াছেন শুনিয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। বহুকুটুম্বী বসু-পরিবারে তখন উহাদের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। সকলেই দেখিল এক বিকটাকার ভল্লুক দাঁড়াইয়া দাঁত বাহির করিয়া হাত নাড়িতেছে। সে দৃশ্য এমনই ভীষণ যে, বয়স্ক লোকেরাও ভয় পাইতেছিলেন, সকল ব্যাপার জানিয়া বুঝিয়াও। ছেলে-মেয়েগুলি তো দেখিবামাত্র মাগো বাবাগো বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল। কেবল তুলসীরামবাবুর মেয়ে বিশ্বেশ্বরীর ছোট ছেলেটি, যাহাকে মহারাজ খুবই স্নেহ করিতেন, পলাইল না। ভয়ে তাহার চোখে জল আসিয়াছে, কাঁদিতে কাঁদিতে, 'আমি জানি তুমি মহারাজ' বলিতে বলিতে, দুই হাত বাড়াইয়া সে মহারাজের দিকেই অগ্রসর হইল। মহারাজ তৎক্ষণাৎ ভালুকের সাজ খুলিয়া ফেলিলেন ও ছেলেটিকে তুলিয়া নিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

কলিকাতা হইতে মহারাজ যখন শেষবার কাশীতে যান, বলরাম বসুর কন্যা কৃষ্ণময়ী ও কৃষ্ণময়ীর ছেলেমেয়ে কয়েকজন তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। মহারাজ ও হরি মহারাজের জন্য আহার্য প্রস্তুত করিয়া কৃষ্ণময়ী তাঁহার বালিকা কন্যা চিন্ময়ীকে দিয়া পাঠাইয়া দিতেন। চিন্ময়ীর ডাকনাম চিনি। চিনি সকালবেলা অদ্বৈতাশ্রমে গিয়াছে, ঠাকুরপ্রণাম সারিয়া মহারাজকে প্রণাম

করিয়া আসিবে। তাহাকে দেখিয়াই মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, এক গ্লাস সরবৎ খাব। আর সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সাধুরাও বলিতে লাগিলেন, চিনি এসেচে, ওকে ধরে জলের ড্রামে ফেলে দাও, সবাইর একএক গ্লাস হয়ে যাবে। ভীষণ চটিয়া চিনি উপরে গিয়া মহারাজকে বলিল, আমি আজ আর আপনার খাবার আনব না। মহারাজ বলিলেন, না না না, আর আমি বলব না, আর আমি বলব না।

## (১৮) ফষ্টিনাষ্টি করা

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন, 'কালী পঞ্চাশৎবর্ণরূপিণী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।' জগন্মাতাকে সম্বোধন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'মা, বেদবেদান্তের অ আ ক খ তুই আর খিস্তিখেউড়ের অ আ ক খ কি তুই নস?' যেসব শব্দ শ্রবণে উচ্চারণে পশুসংস্কার মানবমন অপবিত্রভাবে পূর্ণ হইয়া যায়, সেই সব শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে ঠাকুরের দিব্যভাবে ভাবিত মন সমাধির অতলে ডুবিয়া যাইত। ইহাতেই ঐসব শব্দের মধ্যে যে বিশেষ শক্তি নিহিত তাহা বোঝা যায়। বোঝা যায় যে, পাত্রভেদে উহারা অতি দ্রুত সম্পূর্ণ বিপরীত ফল, অতি ভাল বা অতি মন্দ, উৎপাদন করিতে সমর্থ।

'অশ্লীল' সংজ্ঞায় অভিহিত প্রসঙ্গমাত্রেই যাঁহাদের মনে জগৎকারণের উদ্দীপন করে, তাঁহাদের মধ্যে শক্তিমান বিরল কোন কোন মহাপুরুষ ঐসকল প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া অপরের মনেও অনুরূপ ভাবতরঙ্গ উৎপাদন করিতে পারেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণে ঐ শক্তি পূর্ণমাত্রায় প্রকট ছিল, তাঁহার মানসপুত্রের মধ্যেও ঐ শক্তির বিশেষ প্রকাশ। প্রয়োজনবোধে উহার সাহায্যে তাঁহারা ব্যক্তিবিশেষের সাধনার পথের প্রবল অন্তরায় তাঁহার জাগতিক সংস্কাররাশিকে পরিশুদ্ধ করিয়াছেন, বা দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিয়াছেন। মহারাজের তিরোভাবে সংঘমধ্যে ঐ শক্তির অধিকারী আর কেহই রহিলেন না, স্বামী জগদানন্দ এই কথাটি লেখককে বলিয়াছিলেন।

নিজের অবস্থার কথায় ঠাকুর বলিয়াছেন, 'ভক্তের অবস্থায়—বিজ্ঞানীর অবস্থায়—রেখেচে। তাই রাখাল প্রভৃতির সঙ্গে ফচকিমি করি। জ্ঞানীর অবস্থায় রাখলে উটি হত না।' [ক ৪।১১] 'বালকের অবস্থার ভিতর বাল্য, পৌগণ্ড, যৌবন। পৌগণ্ড অবস্থায় ফচকিমি।' [ক ৪।১৫]

গোপাল নামে এক যুবক, কালো গোলগাল চেহারা, ভুবনেশ্বরে আসে তাহার কাকার সঙ্গে ও স্যানিটোরিয়ামে বাস করিতে থাকে। সদ্যঃ-পত্নীহারা সরল যুবক মঠে আসিয়া মহারাজকে দর্শন করে। তাহার শোকার্ত হৃদয়ের দৈন্য মহারাজের করুণা উদ্রিক্ত করিল। দিনের পর দিন কৃষ্ণ ও গোপীগণের প্রেমলীলা বর্ণনার ছলে গোপালকে তিনি নানা কথা শুনাইতে লাগিলেন। তিনি পায়চারি করিতে করিতে বলিতেন, আর গোপাল হাসিয়া গড়াগড়ি দিত। এত হাসিলে আমি বলি কী করে?—মহারাজ কহিতেন। না, আপনি বলুন, আমি হাসব না—সে বলিত, কিন্তু হাসি কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিত না, হাসিয়া লুটাপুটি খাইত। পত্নীশোক সে ভুলিয়া গেল। মঠ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহিত না, খাওয়া শোয়ার সময় ছাড়া মঠেই পড়িয়া থাকিত। ভুবনেশ্বরে তাহার একমাস থাকার কথা, তিনমাস কাটাইয়া গেল।

আলিপুরে কোচবিহারের রাজপ্রাসাদে মহারাজ বিকালবেলা রামলাল-দাদা ও পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদের সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি করিতেছিলেন। সেই আসরে বহিরাগত তিনজন ভদ্রলোকও উপস্থিত ছিলেন; তাঁহারা কী ভাবিতেছেন মনে করিয়া সেবকের মন চঞ্চল হয়, কিন্তু মহারাজের কিছুমাত্র সঙ্কোচের ভাব দেখা গেল না, উপস্থিত প্রসঙ্গও পরিত্যাগ করিলেন না। প্রায় একঘণ্টা পরে মহারাজ তাঁহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কিছু মনে করবেন না, আমরা রোজ এরকম করি না। এইকথা শুনিবামাত্র ঐ ভদ্রলোকদের একজন কান্নায় ফাটিয়া পড়িলেন ও মহারাজকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, আজ আমার জীবনের একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।[১]

---

১ নির্বাণানন্দ-কথিত।

বারুইপুরের কেদারনাথ ভট্টাচার্য মহারাজকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। একদিন রাত্রিবেলা এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়া তিনি বসু-ভবনে আসেন। মহারাজ তখন বয়স্যস্থানীয় দুইএক জনের সঙ্গে বসিয়া ফষ্টিনাষ্টি করিতেছিলেন। কে, কেদারবাবু? বসুন—বলিয়া তিনি উপস্থিত প্রসঙ্গই করিয়া যাইতে থাকেন। কেদারবাবু বন্ধুর কথা চিন্তা করিয়া অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন, আর বন্ধুটিও চলিয়া যাইবার জন্য উসখুস করিতে লাগিল। কেদারবাবু বিদায় নিলেন। রাস্তায় যাইতে যাইতে বন্ধু বলিতে লাগিল, এই তো তোমাদের বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট!—জমিদারের মত হালচাল, বড়লোকের বাড়ীতে থাকেন, সোনার (প্রকৃতপক্ষে পিতলের) গড়গড়ায় তামাক খান, ইয়ারকি দিয়ে সময় কাটান। অনেক কথা বলিয়া, অনেক বুঝাইয়াও কেদারবাবু উহার মত পরিবর্তন করিতে পারিলেন না। পরে যখনই উহার সঙ্গে দেখা হয়, কেদারবাবুকে এইরূপ নানাকথা শুনিতে হয়। প্রায় ছয়মাস পরে একদিন সে আসিয়া কহিল, এতদিন চেষ্টা করেও আমি সেই ভদ্রলোককে ভুলতে পারচি না! তারপরে একটু বিচারবুদ্ধিও এসেচে—মনে হচ্চে, নূতন লোক দেখেও তো তিনি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নি বা উপস্থিত প্রসঙ্গ চাপা দেন নি? তাঁকে আরো দুএকবার না দেখে আমি স্থির হতে পারচি না—আমাকে আরেক দিন নিয়ে চল। বিকালবেলা দুইবন্ধু আসিয়া উপস্থিত হইতেই, কেদারবাবুকে কিছু না বলিয়া মহারাজ তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, আপনি এসেচেন? আরেক দিন এসেছিলেন না? দেখুন আপনি আমাকে যতটা বখাটে মনে করেচেন আমি ততটা বখাটে নই। তারপরও কিছু কিছু কথা হইল, কিন্তু ঈশ্বরীয় কথা মহারাজ একটিও কহিলেন না। লোকটির ঔৎসুক্য বাড়িয়াই চলিল। মাঝে মাঝে আসিয়া মহারাজকে সে দর্শন করিয়া যায়, প্রথম প্রথম বন্ধুর সঙ্গে, শেষের দিকে একা একা। শেষকালে মহারাজের পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়া দীক্ষাপ্রার্থী হইল ও তজ্জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল!

কাশীতে এক ভদ্রলোক এই সঙ্কল্প নিয়া আসিয়াছিলেন যে, মহারাজের

কাছে বসিয়াই সেই কুচিন্তাগুলি করিবেন যেগুলি বাড়ীতে তাঁহার মনকে অভিভূত করিয়া রাখে। আর ইহার দ্বারা মহারাজ যে কতবড় মহাপুরুষ তাহারও একটা পরখ হইয়া যাইবে, তিনি ভাবিয়াছিলেন। মহারাজের কাছে আসিয়া বসিবামাত্র ভদ্রলোকের মন সাংসারিক ভাবনার বহু ঊর্ধ্বে চলিয়া গেল, ক্রমাগত দুই ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও মনকে তিনি নীচে নামাইতে পারিলেন না।[২]

যাঁহাদের সঙ্গে, বা যাঁহাদের শ্রুতিগোচরে মহারাজ ফষ্টিনাষ্টি করিতেন তাঁহাদের জীবনের উপর মহারাজের অসামান্য শুভপ্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজের মধ্যে তাঁহারা এমন এক প্রেমিকের সন্ধান পাইয়াছেন, অসংখ্য দোষত্রুটি সত্ত্বেও মানুষকে যিনি ভালবাসেন, মানুষের আত্মীয়তার বন্ধনে ধরা দিতে চাহেন। 'আপনি সকলের সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি করেন, কাউকে ভগবানের কথা বলেন না।' এই অনুযোগের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, দেখুন এরা সব সংসারে জ্বলেপুড়ে এখানে আসে আনন্দ পাবে বলে।

প— ও ল— প্রবীণ ভক্ত, দিলদরিয়া লোক। থিয়েটারের লোকদের সঙ্গে তাঁহাদের খুবই ঘনিষ্ঠতা। মহারাজ তাঁহাদিগকে ভালবাসিতেন ও তাঁহাদের সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি করিতেন। একদিন বলিলেন : কলিকাতাব বন্দরে একবার দুখানা জাহাজ এল মিথ্যার বেসাতি নিয়ে। কাউকে খদ্দের পায় না। প— দাঁড়াল এক নম্বর, ল— দাঁড়াল দু'নম্বর।

প্রশান্তানন্দ বলিতেছেন : সকালবেলা মহারাজকে প্রণাম করিতে গিয়াছি বসু-ভবনে। গঙ্গাধর মহারাজও তখন আছেন সেখানে। তাঁহার কাছে বড় হলঘরে যাইতে যাইতে চোখ টিপিয়া মহারাজ আমাকেও যাইতে ইসারা করিলেন। কিছু রগড়ের কথা হইবে মনে করিয়া, কিঞ্চিৎ বিলম্বে যেমন আমি সেই ঘরে ঢুকিতে গেলাম গঙ্গাধর মহারাজ ধমক দিয়া বলিলেন, এখানে কী? —এখানে তোমাদের কী? আমি সবিনয়ে বলিলাম, মহাপুরুষদের কথাবার্তা একটু শোনবার আশায় এসেচি। 'এখানে কিছু নাই, বেরোও, আমাদের

২ জগদানন্দ-কথিত।

প্রাইভেট কথা হচ্চে।' মহারাজ কহিলেন, ওগুলোর কথা ছেড়ে দাও, থাকুকগে। আমি আসিবার আগে হইতেই ফষ্টিনাষ্টি সুরু হইয়াছিল, মহারাজ এখন তাহার মাত্রা চড়াইয়া দিলেন, আর গঙ্গাধর মহারাজ চোখ রাঙাইয়া মাঝে মাঝেই বলিতে লাগিলেন, বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে। মহারাজ কিন্তু আমাকে কিছুই বলিতেছেন না, আর তাঁহার সেই প্রসঙ্গেরও বিরাম নাই। ভাব বুঝিয়া, পকেট হইতে কাগজ পেনসিল বাহির করিয়া আমি কিছু লিখিবার উপক্রম করিতেই গঙ্গাধর মহারাজ অতিষ্ঠ হইয়া প্রশ্ন করিলেন, এসব তুমি আবার কী লিখতে সুরু করলে? আমি বলিলাম, মহাপুরুষদের বাণী নিয়ে কিছু লেখার ইচ্ছা আছে, সেজন্যে টুকে নিচ্চি। তিনি ভীষণ চটিয়া গেলেন ও 'বেরোও এখান থেকে' বলিয়া লাঠি হাতে আমাকে তাড়া করিলেন। মহারাজ তাঁহার লাঠি-সমেত হাত ধরিয়া ফেলিতেই তিনি বলিতে লাগিলেন, এগুলোকে তোমার এরকম নাই দেওয়া ঠিক নয়। দেখচ কিরকম অবাধ্য— যেতে বলচি, নড়চে না; আবার কী লিখচে! মহারাজ কহিলেন, আহা, লিখুকগে। ঠাকুরের কথা নিয়ে কথামৃত লেখা হয়েচে, ওরাও না হয় মহাপুরুষদের কথা নিয়ে কিছু লিখবে, তাতে আমাদের কী?

## (১৯) মাছধরা ও তাসখেলা

বেলুড় মঠের জমিতে তখন গোয়ালপুকুর ও পদ্মপুকুর নামে ছোটবড় দুইটি পুষ্করিণী ছিল। মহারাজ কখন কখন ঐ দুই পুকুরের যেকোনটিতে ছিপ নিয়া মাছ ধরিতে বসিতেন। মঠের বাহিরেও দুইচারি বার তিনি মাছ ধরিতে গিয়াছেন আমন্ত্রিত হইয়া।

বসু-ভবনে অবস্থানকালে মহারাজ মাঝে মাঝে তাস খেলিতেন। খেলার সঙ্গী কোন গুরুভ্রাতা—হরি মহারাজ কিংবা গঙ্গাধর মহারাজ, আর বাবুরাম মহারাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা তুলসীরামবাবু, গৌরবাবু প্রভৃতি। মহারাজকে আনন্দ দিবার জন্য হরি মহারাজের মত অতি গম্ভীর ব্যক্তিও খেলিতে বসিতেন,

কিন্তু মহারাজ যখন উঁকি মারিয়া তাঁহার হাতের তাসগুলি দেখিবার চেষ্টা করিতেন তখন তিনি চটিয়া যাইতেন। একদিন বলিয়াছিলেন, মহারাজ, তোমার সঙ্গে আর আমি খেলতে বসব না ; তোমার এসব লীলা, কিন্তু মনে থাকে না বলে চটে যাই।

হয়তো কোন কাজের কথা বলিবার জন্য শরৎ মহারাজ বসু-ভবনে আসিয়াছেন, মহারাজ তাঁহাকে নিয়াই খেলিতে বসিয়া গেলেন। মহারাজের প্রতিপক্ষে খেলিতে বসিয়া শরৎ মহারাজ ইচ্ছা করিয়া হারিতে থাকিতেন; আর 'তুমি একেবারেই খেলতে জান না শরৎ!'—বলিয়া মহারাজ জয়ের আনন্দ প্রকাশ করিতেন। শরৎ মহারাজ বলিতেন, কী করে জানব ভাই, তোমাদের মত আমি তো খেলতে পাই না, তাই ভুলচুক হয়ে যায়।

উপরোধে পড়িয়া বয়োজ্যেষ্ঠ মহাপুরুষজীও কখন কখন তাস খেলিয়াছেন বলিয়া জানা যায়।[১] তবে তিনি তাস খেলা ও মাছ ধরা হইতে মহারাজকে নিবৃত্ত করিতেই চেষ্টা করিতেন। বলিতেন, মহারাজ, তুমি মঠের প্রেসিডেন্ট, তুমি এসব করলে লোকে কী বলবে! মহারাজ সেকথার উত্তর করিতেন না, এবং একএক দিন মহাপুরুষ না জানিতে পারেন এমনভাবে লুকাইয়া মাছ ধরিতে যাইতেন।

মাছ ধরিতে আমন্ত্রিত হইয়া মহারাজ দুইবার আলিপুরে কোচবিহারের রাজপ্রাসাদে গিয়াছেন ও একএক বারে তিনচারি দিন করিয়া সেখানে বাসও করিয়াছেন। রাজপ্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক শৌর্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহারাজকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন, আর মহারাজও তাঁহাকে খুবই ভালবাসিতেন। সপরিকর মহারাজকে আনন্দে রাখিবার জন্য শৌর্যেনবাবু অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। মহারাজের উপস্থিতিতে একবার সেখানে যীশুখ্রীষ্টের জন্মোৎসব (ক্রীচ্‌মাস ইভ্‌) অনুষ্ঠিত হয় রামলালদাদাকে 'ফাদার' করিয়া (১৯২০)। রামলালদাদা ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদকে বাইবেল

১ প্রশান্তানন্দ-কথিত।

পাঠ করিতে অনুরোধ করেন, 'আই রিকোয়েষ্ট' ইত্যাদি বলিয়া। বলা বাহুল্য, রামলালদাদা এক অক্ষরও ইংরাজী জানিতেন না।'

ডাক্তার হারান বানার্জীর বন্দোবস্তে, মহারাজ একদিন বেলগাছিয়ায় আর-জি-কর মেডিকেল কলেজের পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে যাইবেন ঠিক হইয়াছে, কিন্তু সেইদিন কেবলই বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। যাত্রার মুখে মহাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত! ভবানী ও ঈশ্বরের আগেভাগে যাইয়া চার ফেলিবার কথা, ভবানী দেখা না করিয়াই চলিয়া গেলেন। কিন্তু ঈশ্বর উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারিলেন না, প্রণাম করিতে যাইয়া মহাপুরুষের জেরার উত্তরে সকল কথা ফাঁস করিয়া দিলেন। কোনরূপে এই ফাঁড়া কাটাইয়া, ছেলেদের আবদার ইত্যাদি সদ্‌যুক্তি দেখাইয়া ও কথা কহিয়া, মহারাজ যদিও বা গন্তব্যস্থানে গিয়া পৌঁছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাঁহার সেখানে থাকাই হইল না—কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার কেদার দাস আসিতেছেন খবর পাইয়াই হঠাৎ চলিয়া আসিলেন। যাহা হউক, ভবানী ও ঈশ্বরের ছিপে সেদিন অনেকগুলি মাছ পড়িয়াছিল।

কিরণচন্দ্র দত্ত দমদমায় নিজেদের বাগানবাড়ীতে উৎসবের আয়োজন করিয়া মহারাজকে লইয়া যান। সেখানে গিয়াই মহারাজের মাছ ধরিবার ইচ্ছা হইল ও সঙ্গে সঙ্গে উহার ব্যবস্থাও হইয়া গেল। ছিপ ফেলিয়া তিনি পুকুরঘাটেই বসিয়া রহিলেন। নিঃশব্দে অনেকক্ষণ কাটিয়া যাইবার পর হঠাৎ পুকুরঘাটে হৈচৈ। মহারাজের গলাও শুনিতে পাওয়া গেল—ডাক ডাক, সকলকে ডাক, কিরণবাবুকে ডাক। সকলে ছুটিয়া গিয়া দেখিল মহারাজের ছিপে ছোট্ট একটি চেলামাছ পড়িয়াছে!

মহারাজ ছিপ হাতে বসিয়া আছেন, কিন্তু ছিপের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নাই। এক যুবক তাঁহাকে পুনঃপুনঃ আহ্বান করিয়াও সাড়া পাইল না, তাঁহার মন বাহ্যভূমিতে ছিল না। যুবকটি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় ও পরে তাঁহার কাছে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করে। ইহা বারুইপুরের ঘটনা।[২]

২ নির্বাণানন্দ-কথিত।

মেদিনীপুর হইতে এক অফিসার মঠে মহারাজকে দর্শন করিতে আসিলে বাবুরাম মহারাজ বলেন, মহারাজ ঐ পুকুরে মাছ ধরচেন। ভদ্রলোকের মনে কেমন অশ্রদ্ধার উদয় হয় ও দূর হইতে মহারাজকে দেখিয়াই সরিয়া পড়েন। মহারাজ তাঁহার দিকে একবারমাত্র আড়চোখে তাকাইয়াছিলেন। দশদিন পরে ঐ ভদ্রলোক আবার মঠে আসেন ও মহারাজের দর্শন লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে থাকেন। মহারাজকে আগে বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার অনুশোচনার অন্ত ছিল না।[৩]

মহারাজের ছিপে মাছ ধরা পড়িলে, যে কাছে থাকিত তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন, এ ভারী পয়া। আর ধরা না পড়িলে, সে অপয়া হইয়া যাইত। তাসখেলার সময়েও একই ব্যাপার। জিতিয়া গেলে বলিতেন, এ ভারী পয়মন্ত, তুই থাকবি। আর হারিয়া গেলে বলিতেন, এই শালার জন্যে হেরে গেছি! তাসখেলা বা মাছধরার সময় কেহই তাঁহার কাছে ঘেঁষিতে চাহিত না অপয়া হওয়ার ভয়ে, তামাক দেওয়া বা অন্য কোন প্রয়োজনে কাছে গেলেও তাড়াতাড়ি পলাইয়া আসিতেই চেষ্টা করিত। ঘ— নামে একটি ছেলেকে মহারাজ খুব ভালবাসিতেন। ঘ—কে দেখিলে তিনি প্রসন্ন হইতেন বলিয়াই মনে হইত। তাহার জিজ্ঞাসার উত্তরে সাগ্রহে অনেক কথা কহিতেন, সময়ে সময়ে নিজের ঘরে ডাকিয়া নিয়া নির্জনে উপদেশ দিতেন। উদ্বোধনে একদিন ভোরবেলা শরৎ মহারাজকে বলিয়াছিলেন, দেখ, আমি একটি ছেলে যেন এদ্দিন পরে পেয়েচি। তারপরে ঠাকুরের কথিত ভূতের সঙ্গী না পাওয়ার গল্পটি উল্লেখ করিয়া কহিলেন, কত ছেলে এল গেল, সঙ্গী কেউ আর হল না! এ ছেলেটি বেশ, কত দর্শনাদি তার হয়েচে। শরৎ মহারাজ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, বলিলেন, খুব ভাল ছেলে? বেশ বেশ।

কলেজ হইতে বাহির হইয়াই ঘ— সন্ন্যাসী হইবে স্থির করিয়া মঠে চলিয়া আসে। মহারাজের প্রিয় বলিয়া কেহই তাহার মঠে যোগদানে আপত্তি করে নাই। মহারাজ তখন কলিকাতায় ছিলেন, একথা জানিতেন না। যখন

৩ নির্বাণানন্দ-কথিত।

দেখিলেন ঘ— মঠে ঢুকিয়াই ব্রহ্মচারীর বেশ ধরিয়াছে তখনই বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। বিরক্তির ভাব ক্রমেই বাড়িয়া চলিল, তাহাকে দেখিলেই রাগিয়া যাইতেন বলিয়া মনে হইত। বলিতেন, ও কেন আমার কাছে আসে? ভারী অপয়া, ওকে দেখলে সেদিন আমার ছিপে আর মাছ পড়ে না!

বেলুড়ের চারুবাবু মহারাজকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন তাঁহার বাগানের পুকুরে মাছ ধরিবার জন্য। মহারাজের ভারী আনন্দ। বলিলেন, কাল সকালে ও বেটা যেন আমার কাছে না আসে, আমি যেন মাছ ধরায় যাবার আগে ওর মুখ না দেখতে পাই। ঘ— ভোরে উঠিয়াই বাহির হইয়া গেল।

ভবানী ও ঈশ্বরকে মহারাজ এই বলিয়া আগে পাঠাইয়া দিলেন, তোরা গিয়ে সব ঠিক কর্, আমি যাচ্চি। বেলা দশটার সময় তিনি হন্তদন্ত হইয়া বাগানে আসিলেন ও বলিলেন, আমি আজ আর মাছ ধরতে বসব না, তোরাই ধর্। 'কেন মহারাজ?' উভয়েই প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন: মঠ থেকে বেরিয়ে ভাবলুম, বেলা হয়েচে, ও বেটা হয়তো ফিরতে পারে। পাছে দেখা হয়ে যায় সেই ভয়ে রাস্তা দিয়ে না এসে জঙ্গলে ঢুকলুম। খানিকটা এগিয়েই শুকনো পাতার উপর দিয়ে কেউ চলে গেলে যেমন মচমচ শব্দ হয় তেমনি শব্দ শুনতে পেলুম। ভাবলুম শেয়াল টেয়াল হবে। লাঠি দিয়ে লতাপাতা সরিয়ে সরিয়ে এগুচ্ছিলুম, হঠাৎ দেখি গাছের আড়ালে সাদা চাদরের মত কী দেখা যাচ্চে। কাছে যেতেই দেখি অপয়াটা দাঁড়িয়ে আছে আর আমাকে দেখে ভয়ে কাঁপচে। বল্লুম, তুমি এখানে কেন? তোমার ভয়ে আমি জঙ্গল দিয়ে আসছিলুম, তোমাকে দেখলে আমার মাছ ধরা পণ্ড হবে, আর তুমি কিনা সেই জঙ্গলে এসে হাজির? সে বলে কিনা—মহারাজ, আমিও তো আপনার সঙ্গে দেখা হবার ভয়ে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গল দিয়ে ফিরছিলুম; এরকম যে হবে তা তো জানতুম না! আর তো আজ আমার ছিপে মাছ পড়বে না! তোরাই ধর্।[৪]

---

৪ এই ঘটনার পরে ঘ— বাড়ীতে ফিরিয়া যায় ও বিবাহ করে।

তাসখেলায় তুলসীবাবু ওস্তাদ ছিলেন, সহজে তাঁহাকে হারানো যাইত না। মহারাজ তুলসীবাবুকে জুড়ি করিতেন ও ক্রমাগত জিতিয়া যাইতেন। হারিয়া হারিয়া গঙ্গাধর মহারাজ একদিন বলিয়া উঠিলেন, তুমি তুলসীবাবুকে পার্টনার করে আমাদের হারাও, আমি আজ তাকে আমার পার্টনার করব, দেখি তুমি কেমন জিততে পার। মহারাজ সেকথায় চটিয়া গিয়া বলিলেন, বেশ তাই হবে। তারপরে ঈশ্বরকে কহিলেন, তুই বস্, তোকে নিয়েই গঙ্গাধরকে হারাব। গঙ্গাধর মহারাজ হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, দেখা যাবে কেমন হারাও। জোর খেলা চলিল। প্রথম দুইএক পিট মহারাজ জিতিলেন। তৃতীয় পিটে ছক্কার পালা। সকলের হাতে যখন দুইখানি করিয়া তাস অবশিষ্ট, ঈশ্বর কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না কোন্‌টি ছাড়িবেন—রঙের তাস, না অন্যটি। মহারাজ গম্ভীর হইয়া চোখ পাকাইয়া ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া আছেন দেখিয়া গঙ্গাধর মহারাজ বলিলেন, খবরদার, তুমি ইসারা ফিসারা কোরো না। সাহসে ভর করিয়া ঈশ্বর রঙের তাস ফেলিয়া দিতেই মহারাজ আনন্দে উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন; রঙটা যদি না ছাড়তিস এই হুঁকোটা দিয়ে তোর মাথা ফাটিয়ে দিতুম! (গঙ্গাধর মহারাজের দিকে চাহিয়া) বলেছিলুম না, ঈশ্বরকে নিয়েই তোমাকে হারাব? গঙ্গাধর মহারাজের মুখ চুন।[৫]

সাহিত্য-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি পুরীতে আসিয়াছেন, মহারাজের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। মহারাজ তাস খেলিতেছিলেন, প্রায় দুই ঘণ্টা পরে উঠিয়া আসিয়া কহিলেন—কিছু মনে করবেন না, বড় দেরী হয়ে গেছে; তাস খেলছিলুম, খেলাটা খুব জমেছিল। সমাজপতি অবাক।

---

৫ কিরণবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র শিবরাম একজন পাকা দাবা-খেলোয়াড় ছিলেন। একদিন অমূল্য মহারাজ বসু-ভবন হইতে আসিয়া শিবরামকে বলিলেন, শীঘ্র চল, মহারাজের কাছে দাবা খেলতে হবে; মাদ্রাজ থেকে একজন বড় দাবা-খেলোয়াড় এসেচেন—মিঃ নারায়ণ আয়েঙ্গার। খেলা দেখিতে দেখিতে মহারাজ মাঝে মাঝে খুব আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। শেষে শিবরামেরই জয় হয় ও মহারাজ তাহাকে জিলাপি খাইতে দেন।

কিছুই লুকানো ছাপানো নাই, খেলায় মসগুল হইয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন। সমাজপতি তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়িলেন।[৬]

সঙ্গীতশিল্পী পুলিনবিহারী মিত্র যিনি মহারাজের সঙ্গে বহু মিশিয়াছেন বলিতেন, তাসখেলা বা মাছধরা কোনটাই মহারাজ ভাল জানিতেন না, ঐ দুই বিষয় নিয়া আমোদ করিতেন মাত্র, মনটাকে নীচে রাখিবার জন্য। একবার কনখলে মহারাজ যখন তাস খেলিতেছিলেন সেই সময়ে কতিপয় ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি জোড়হাতে তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, মশাই, আমরা কিন্তু সাধু, যদিও তাস খেলচি।

একবার এক উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ জজ, মহারাজকে দর্শন করিতে আসেন। মহারাজ তখন উপস্থিত ব্যক্তিগণের সঙ্গে লঘু পরিহাস করিতেছিলেন। সেই অপরিচিত ভদ্রলোকের সমক্ষেও তাঁহার কিছুমাত্র ভাবান্তর লক্ষিত হইল না, উপস্থিত প্রসঙ্গও পরিত্যাগ করিলেন না। ভদ্রলোকটির চলিয়া যাইবার সময় হাসিমুখে কহিলেন, এ যা দেখলেন এটাই এখানকার সব নয়, এ ছাড়াও আছে, আবার যখন আসবেন, অন্যরূপ হবে।[৭]

বসু-ভবনে একদিন বিকালবেলা কেদারবাবু বলিতেছিলেন, মহারাজ, আজ আর কিছু হবে না? মহারাজ অমনি তাঁহার দিকে ভ্রূকুটিপাত করিয়া কহিলেন, কেদারবাবু, জীবনটা কি শুধু খেলায়ই যাবে, আর কি কিছু নাই? জীবনের উদ্দেশ্য কি শুধু খেলাই?

জিতেন দত্তকে বাবুরাম মহারাজ বলিয়াছিলেন, ঠাকুর বলতেন, রাখাল ত্রিগুণাতীত। এইজন্যে মহারাজ যে ছিপে মাছ ধরেন বা লোকের সঙ্গে ফষ্টিনাষ্টি করেন তাতে তাঁর কোন দোষ হয় না।

পূর্ববঙ্গের কোন ভক্ত শ্রীমকে চিঠি লিখিয়াছে—শ্রীম তখন মঠেই থাকেন—পোষ্টকার্ডে: যে ঠাকুর বলতেন নান্যবাচা নান্যচিন্তা, তাঁরই মানস-

৬ হরানন্দ-কথিত।

৭ সত্যানন্দ-কথিত।

পুত্র রাখাল মহারাজকে দেখলাম ছেলেদের নিয়ে হুড়োমুড়ি—তাস খেলচেন, ছিপ দিয়ে মাছ ধরচেন! শ্রীম সেই চিঠি মঠের কোন কোন সাধুকে দেখাইয়াছেন এবং তাহাদের কেহ কেহ সেকথা মহারাজকে বলিয়া দিয়াছে। বাবুরাম মহারাজকে ডাকিয়া মহারাজ বলিতে লাগিলেন: বাবুরামদা, ঠাকুর আমাদের সঙ্গে কিরকম আনন্দ করতেন? আমরা তো ভাই, এই সব ছেলেরা যারা বাপ মা ভাই বাড়ীঘর সব ত্যাগ করে আমাদের কাছে এসেচে তাদের সঙ্গে এর সিকির সিকিও করতে পারি না। ঠাকুরের কাছে কে আসত, কে থাকত? বর্ষাকালে জল প্যাচপ্যাচ করত, শীতের সময় গঙ্গার হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিত, গরমের সময় রোদ্দুরে বুকের ছাতি ফাটিয়ে দিত! ন মাসে ছ মাসে কখন কার ছুটি ফুরসৎ হবে, সকালে বা বিকালে একবার এলেন, দুএক ঘণ্টা, বড় জোর এক আধ রাত্তির রইলেন! ঠাকুর আমাদের সঙ্গে উলঙ্গ হয়ে থাকতেন, যদি কেউ গৃহী ভক্ত আসত, তাড়াতাড়ি কাপড়খানা নিয়ে কোলের উপর চাপা দিতেন। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, সে আর বলতে! ঠাকুরের কথা কি বলা যায়, এখনো মনে করলে প্রাণ আনন্দে ভরে যায়। শ্রীম সকল কথা শুনিলেন।[৮]

## (২০) বড় মন

বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজার আয়োজন হইয়াছে। মহারাজের ইচ্ছা যে, খুব বড় থালায় মায়ের বিরাট ভোগ হয়। বরাহনগরের নারায়ণ দত্ত থালা খুঁজিতে বাহির হইলেন ও অতি প্রকাণ্ড এক থালা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। সেই থালায় ভোগ সাজানো হইলে চারিজনে ধরাধরি করিয়া উপরে লইয়া গেল। নিবেদনান্তে মহারাজ আসিয়া দর্শন করিলেন।

বাঙ্গালোর মঠে মহারাজের ইচ্ছায় ঘটে দুর্গাপূজা হইল। সেই পূজায়

---

৮ শ্যামানন্দ-কথিত। তিনি বলেন, বাবুরাম মহারাজ যখন ঠাকুরের কথা কহিতেন উপসংহারে বলিতেন, এসব জাবদা-খতেনে নেই। কথামৃত তখন তিনভাগ বাহির হইয়াছে।

ভোগরাগের এমন ঘটা হইল যে, উপচারসংখ্যায় উহা সেই বৎসরের বেলুড় মঠের দুর্গাপূজাকেও ছাড়াইয়া গেল।

একবছর স্বামিজীর উৎসবের সময় মহারাজ কহিলেন, এবার দরিদ্র-নারায়ণদের চালোয়া মাছের কালিয়া খাওয়াও। সেবকেরা শিয়ালদহ ষ্টেশনে ছুটিলেন, বড় বড় রুইমাছ অনেকগুলি কিনিয়া আনা হইল। সেই মাছ কাটিবার জন্য মেছোনীরা বড় বড় বঁটি লইয়া আসিল। অপরাপর জিনিস আগের বছরের মতই হইয়াছিল, কেবল মাছটা অতিরিক্ত ও পরিমাণে প্রচুর। অন্য বছর দরিদ্রনারায়ণদের বড় বড় পানতোয়া খাওয়াইবার আদেশ দিলেন। অমনি ছানা সংগ্রহ করিতে কেহ গেল হাওড়া, খুদুমণি ছুটিলেন ঘুঘুডাঙ্গা। প্রচুর ছানা আসিল, বড় বড় পানতোয়া তৈরী হইল। এইরূপে একবছর রকমারি বেগুনি, এবং অন্য একবছর ঝুড়ি ঝুড়ি পাঁপরভাজা করাইয়াছিলেন।

কাশীতে মহারাজ একদিন সকালে একাকী বেড়াইতে বেড়াইতে খোজোয়ার বাজারে যান, অনেকগুলি মিঠাকুমড়া কিনেন ও দুইতিন জন মুটের মাথায় চাপাইয়া লইয়া আসিয়া অদ্বৈতাশ্রমের মোহন্তকে বলেন, চন্দর, এগুলি ভাল কুমড়া, অনেক দিন থাকবে। কুমড়াগুলির ভিতর অত্যন্ত পুরু, বীচিগুলিও মিষ্টি; কোন কোন সাধু খাইয়া বলিতেন, তরকারিতে বড় বেশী মিষ্টি দিয়ে ফেলেচে। আর একদিন দুইতিন ঝাঁকা পেয়ারা লইয়া আসিয়া বলিলেন, এগুলি ঠাকুরকে নিবেদন করে দাও। ঠাকুরের সম্মুখে ঝুড়িশুদ্ধ পেয়ারাগুলি রাখা হইল, তারপরে একটি একটি করিয়া সকলকে বিতরণ করা হইল।

কাশী ও কনখল সন্ন্যাসীদের স্থান, নাগা ও পরমহংস সন্ন্যাসীদের বহু আখড়ায় ও মঠে পরিপূর্ণ। পুরি-কচৌরি-লাড্ডু-জিলেবা-বালুসাই এবং নিকৃষ্ট টক দইয়ের লস্যি বা ঘোল—এইসকল বস্তুই সাধুরা সাধারণতঃ খাইয়া থাকেন ভাণ্ডারায় বা ভোজে আমন্ত্রিত হইয়া, আর এইসকল বস্তুই উৎকৃষ্ট খাদ্য বিবেচিত হয়। একবার মহারাজ কাশীতে সাধুদের সমষ্টি ভাণ্ডারা দেন। তাহাতে পুরি-কচৌরি-লাড্ডু সহ বাঙ্গলার উপাদেয় খাদ্য রাধাবল্লভী, উৎকৃষ্ট তরকারি, উৎকৃষ্ট চিনিপাতা দই, পানতোয়া রসগোল্লা ইত্যাদি রকমারি ছানার

মিষ্টান্ন প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সাধুরা ইচ্ছাসুখে ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, জীবনে তাঁহারা এমনটি আর কখনো খান নাই। উদ্বৃত্ত মিষ্টান্নাদি পরদিনও সাধুদের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। কোতোয়ালের ভুলে—সাধুদের নিমন্ত্রণ করা কোতোয়ালের কাজ—এক সাধু এই ভাণ্ডারার খবর পান নাই। তিনি এতই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে, লাঠি দিয়া কোতোয়ালকে প্রহার করিতে গিয়াছিলেন। যেবার মহারাজ কনখল সেবাশ্রমে ছিলেন ( ১৯১২ ) সেইবার বৈশাখী পূর্ণিমার দিন কনখলস্থ সাধু-দিগকেও অনুরূপভাবে ভোজন করাইয়াছিলেন। তখনকার দিনে ভাণ্ডারাদিতে সম্প্রদায়ভেদ ছিল না, সন্ন্যাসী উদাসী গরীবদাসী দাদুপন্থী কবীরপন্থী প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের সাধুরাই ভাণ্ডারাতে আসিয়াছিলেন।

মুক্তেশ্বরানন্দ বলেন ঃ

মহারাজ একদিন ভুবনেশ্বর মঠে বলিয়াছিলেন, তোরা ভাল করে তপস্যা কচ্চিস না, ভজন কচ্চিস না, তাই ভাঁড়ার খালি। তপস্যা করলে সব আপনা থেকে এসে যায়। ভাল খেলে দেলে ব্রেণসেল ( মাথা ) খোলে।[১]

থালার চারিদিকে রকমারি খাবার দেখিলে মহারাজ ছোট ছেলের মত খুশী হইতেন, কিন্তু মুখে দিতেন একটু একটু। প্রায় সবই পড়িয়া থাকিত। তিনি বলিতেন ঃ যখন খাবার বয়স ছিল, জুটত না। তপস্যার সময় কুসুম-সরোবরাদি স্থানে শুকনো বাজরার রুটি শুধু নুন দিয়ে খেতে হত। তাও পেটভরা জুটত না, জল খেয়ে পেট ভরাতে হত। এখন খেতে পারি না কিনা, তাই এত জুটচে।[২]

আহারান্তে মহারাজ উদ্বৃত্ত অন্নব্যঞ্জনাদি হইতে কিছু কিছু নিয়া একটা

---

১ জনৈক ভক্তকে মহারাজ বলিয়াছিলেন : সাধনভজনের জন্যে পুষ্টিকর খাদ্য চাই। এক পয়সার চিংড়ি মাছ এনে গুষ্টিসুদ্ধ খাবে, ঈশ্বর দেখতে গিয়ে ভূত দেখে বসে থাকে।

২ মহারাজ দিনের বেলায় ভাত ও রুটি খাইতেন। দইয়ে আটা মাখিয়া প্রায় দুইঘন্টা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া রুটি করা হইত। দুইবেলা আহার্যের মধ্যে ফল দুধ অধিক পরিমাণে থাকিত। রাত্রে ফল দুধ মিষ্টি, কখনো বা এক আধখানা রুটি।

বাটিতে মিশাইয়া রাখিতেন। ইহার নাম দিয়াছিলেন 'গালগপ্পা'। আমরা সকলেই সেই প্রসাদ পাইতাম। কখনো বা কাহাকেও ডাকিয়া নিয়া নিজেই দিতেন। উদ্বৃত্ত ফল দুধ মিষ্টি আর একটা বাটিতে মিশাইতেন, কখনো একটু মুখে দিয়া দেখিতেন কেমন খাইতে হইয়াছে। এই বস্তুটির নাম 'উইলিয়াম ভট্'।

শীতের সকালে একএক দিন 'গোপালগপ্পা' তৈরি করাইতেন সকলের জন্য। তাহাতে সোনামুগের ডাল, আতপ চাউল, কড়াইশুঁটি, ধনেপাতা, আলু, বীট-গাজর কখনো কখনো, খোয়াক্ষীর ও ঘি থাকিত। অতি উপাদেয় খেচরান্ন। নিজেও একটু খাইতেন, নতুবা সকালে তিনি কিছুই খাইতেন না। গোপাল-গপ্পার সঙ্গে কখন কখন একটা চাটনিও থাকিত। মনাক্কা বা কিসমিস, খেজুর, ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা, তেঁতুল, চিনি ও নুন একসঙ্গে বাটিয়া সেই চাটনি তৈরি হইত—দেখিতে চ্যবনপ্রাশের মত।

ফুটন্ত দুধে পরিমাণ মত গরম মশলা ( ছোট এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ) নেকড়ায় বাঁধিয়া সিদ্ধ করা হইত। কখনো বা আখনির জল আগে করিয়া নিয়া দুধে মিশানো হইত। পৃথকভাবে চায়ের জল তৈরি করিয়া সেই দুধে ছাড়া হইত। সবশেষে তাহাতে জাফরান ও চিনি মিশানো হইত। মহারাজ ইহার নাম দেন 'মোগলাই চা'। শীতকালে, বিশেষতঃ উৎসবাদি উপলক্ষে মোগলাই চা করাইয়া সকলকে খাওয়াইতে তিনি ভালবাসিতেন।

কৃষ্ণলাল মহারাজ তামাক খাইতেন না। তাঁহার ইচ্ছা যে সকলেই তাঁহাকে অনুসরণ করে, অন্ততঃ নূতন ব্রহ্মচারীরা তামাকে অভ্যস্ত না হয়। এই বিষয়ে মহারাজকে দিয়া তিনি এক আদেশ জারি করিতে চাহিলে মহারাজ বলিয়াছিলেন : স্বামিজী নিয়ম করে গেছেন, মঠে অপর কোন নেশা করা চলবে না, কেবল তামাক খাওয়া চলবে। আমার বয়েস যখন চোদ্দ তখন তামাক খেতে শিখি। আর সেই থেকে খেয়েও আসচি। আমি কিরূপে ছেলেদের মানা করব ?

কোন প্রবীণ সাধু মহারাজের এক সেবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন, —সে যখন তখন সিগারেট খায়, আমাদের দেখেও সমীহ করে না; নিতাইয়ের ঘরে বসে আড্ডা মারে, তার পাউডার স্নো মাখে। প্রথম অভিযোগের উত্তরে মহারাজ বলেন, ও এত সিগারেট খায় কেন? সিগারেট বেশী খাওয়া ভাল নয়, ফুসফুসের ক্ষতি করে। বিড়ি খাওয়া আরো খারাপ। এসবের চেয়ে তামাক খাওয়া ঢের ভাল। আচ্ছা, ওকে বলে দেব যেন সিগারেট বেশী না খায়, আমার কাছে কত ভাল তামাক রয়েচে! দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে, খানিক গম্ভীরভাবে থাকিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, কত আর ভোগ করবে, ও আপনা থেকে চলে যাবে। নিতাই ওকে ভালবাসে, তাই তার কাছে যায়।

কাশীতে একদিন মহারাজের উড়িয়া ভৃত্য বুলবুল বায়োস্কোপের বিজ্ঞাপন কুড়াইয়া আনিয়া হৃষীকেশের (প্রশান্তানন্দের) হাতে দিয়াছে —তাঁহার সঙ্গে যাইয়া সে ছায়াছবি দেখিবে। হৃষীকেশ সেকথা মহারাজকে জানাইলেন। বায়োস্কোপে তখন ভিক্টর হিউগোর 'লা মিজারেবল' দেখাইতেছিল, হৃষীকেশ পড়িয়াছিলেন। মহারাজ কহিলেন, বেশ তো, তোরা দুজনে গিয়ে দেখে আয়। একটাকা খরচ পড়িবে শুনিয়া কহিলেন, অ—র কাছ থেকে নিয়ে যাবি। অ—কে সেইকথা বলিতেই তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, সাধু হতে এসেচে, বায়োস্কোপ থিয়েটার দেখবে! হৃষীকেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া আসিলেন। বিকালবেলা মহারাজ সেবাশ্রমের মাঠে বসিয়াছিলেন, হৃষীকেশকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বায়োস্কোপ দেখতে গেলি না? তারপরে টাকা পাওয়া যায় নাই শুনিয়া সেবাশ্রমের চারুবাবুকে কহিলেন, চারুবাবু, আমাকে একটি টাকা ধার দিন। চারুবাবু তৎক্ষণাৎ টাকা আনিয়া দিলেন, আর বুলবুলকে নিয়া হৃষীকেশও বায়োস্কোপ দেখিতে ছুটিলেন।

বুলবুল বেশী কাজকর্ম করিত না, ভাল কাপড়জামা পরিয়া আরামে থাকিতে চাহিত। মহারাজ তাহাতে বাধা দিতেন না, বরং তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেন। ত্যাগী সেবক ও বেতনভুক ভৃত্য দুইজনকেই তিনি সমভাবে ভালবাসিতেন, সমভাবে তাহাদের সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন।

বেদান্তের উপাধি-পরীক্ষা দিবার জন্য হৃষীকেশ প্রস্তুত হইতেছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনীয় পুস্তকের অভাবে অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলেন। এমন সময় জানিতে পারিলেন যে, শঙ্করভাষ্যের টীকাটীপ্পনীসংবলিত ব্রহ্মসূত্রের দুইটি বৃহৎ সংস্করণ বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। একখানিতে আছে রত্নপ্রভাদি পাঁচটি টীকা, এবং অপরখানিতে আছে ভামতী টীকা, সেই টীকার উপর টীকা ( ভামতী-কল্পতরু ), ও সেই টীকার টীকায় টিপ্পনী ( কল্পতরু-পরিমল )। মহারাজকে হৃষীকেশ ইহা জানাইলেন। অবিলম্বে বই দুইখানি কিনিয়া পাঠাইবার জন্য মহারাজ বোম্বাইয়ে বরেন ঘোষকে পত্র লিখিয়া দিলেন।

বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা হইতেছে ( ১৯১৬ ), মহারাজ কহিলেন, আপনারা সবাই তো জানেন আপনাদের প্রেসিডেন্ট মুখ্যু মানুষ, আপনাদের সকলকে এবার ঠাকুরের কথা শোনাবেন স্বামী শর্বানন্দ। শর্বানন্দ তাঁহার শিষ্য।

কর্মশ্রান্ত সাধুদের বিশ্রাম ও তপস্যার জন্য মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠ করিয়াছিলেন। আন্তরিকতার সহিত সকলকেই সেখানে আহ্বান জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, ওখানে কবে যাচ্চ ?

তাঁহাকে কেহ প্রশ্ন করিয়াছিল, ভুবনেশ্বর মঠের গেট অত উঁচু করলেন কেন ? হাসিতে হাসিতে তিনি উত্তর দিলেন, ওরে, আমরা আর ক'টাকার মোহন্তালি করে গেলুম, এরপর বেলুড় মঠের মোহন্ত হাতী হাওদা চড়ে মঠে ঢুকবে, তার ব্যবস্থা করে গেলুম !

## (২১) শ্রীশ্রীমা ও মহারাজ

[ এই বিষয়ে অনেকগুলি সুন্দর ঘটনা 'শ্রীশ্রীসারদা দেবী' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ]

বীরেন্দ্রনাথ বসু বেলুড় মঠে আসিয়াছেন মহারাজকে ঢাকায় লইয়া যাইবার জন্য, কিন্তু তিনি পূর্ববঙ্গে যাইতে চাহিতেছেন না বাবুরাম মহারাজের সুপারিশ

সত্ত্বেও। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, এমনিতে হবে না, মা-ঠাকরুণের কাছে যাও, তিনি অনুমতি দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কৃষ্ণলাল মহারাজকে সঙ্গে দিয়া বীরেনবাবুকে তিনি মাতাঠাকুরাণীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণলাল কহিলেন, মা, এটি মহারাজের ছেলে, তাঁকে ঢাকায় নিয়ে যেতে এসেচে, তিনি যেতে চাইচেন না। অনুমতি আদায় করিবার জন্য বীরেনবাবু দুইহাতে মায়ের পা জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। মা বলিলেন, বাবা, পা ছাড়। ছেলে এসেচে নিয়ে যেতে, তা যাবে বইকি। দেখ বাবা, খুব সাবধানে নিয়ে যাবে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, মহারাজ আর অমত করিলেন না।

উদ্বোধনের কর্মচারী চন্দ্রমোহন দত্ত সকালের দিকে একবার করিয়া মহারাজের কাছে আসিতেন। মহারাজ তাঁহাকে কোনদিন এক পয়সার কাঁচাকলা, কোনদিন বা দুই পয়সার শাক আনিয়া দিতে বলিতেন। একদিন চন্দ্র বলিলেন, মহারাজ, আপনার কথা মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আপনি মার কাছে যান না কেন? মা বল্লেন— 'কী বল্লেন?' 'বল্লেন, রাখাল তো নারায়ণ, সে আমার কাছেই আছে!' বসু-ভবনে নিজের ঘরে ছোট খাটটিতে মহারাজ বসিয়াছিলেন, শোনামাত্র এমনই স্থির ও গম্ভীর হইয়া গেলেন যে, তাঁহার দেহের হুঁশ আছে বলিয়া মনে হইল না। চন্দ্র ভীত হইয়া পলাইয়া গেলেন।

মহারাজের ঘরে গরম কাপড়ে মোড়া একটি কাঠের বাক্সে কতকগুলি হোমিওপ্যাথি ঔষধ থাকিত, প্রয়োজন হইলে নিজে ব্যবহার করিতেন এবং অপরকেও দিতেন। একবার মা যখন জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন, সকালবেলা আপন মনে বেড়াইতে বেড়াইতে মহারাজ মায়ের বাড়ীতে আসিলেন ও দোতলায় মায়ের কাছে উপস্থিত হইয়া ছেলেমানুষের ঢঙে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, কেমন আছেন? মায়ের মুখে তখন ঘোমটা ছিল না, কাপড় মাথার উপরে টানা। মা কহিলেন, বাবা, পায়ে বাতের ব্যথা, বড় কষ্ট পাচ্চি; একটু একটু জ্বরও হয়। মহারাজ মায়ের কথা শুনিতেছেন আর চঞ্চল বালকের মত এদিকে ওদিকে তাকাইতেছেন,

যেন ছবিগুলি দেখিতেছেন। মা, আপনাকে আমি হোমিওপ্যাথি ওষুধ দেব, আমি হোমিওপ্যাথির বই অনেক পড়েচি, ওষুধও আমার কাছে আছে, আপনাকে দেব, ভাল হয়ে যাবেন—এইকথা বলিয়াই পূর্ববৎ প্রণাম করিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন।[১]

মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠে আছেন। মঙ্গলবার গভীর রাত্রে শ্রীশ্রীমার যখন শরীর গেল (২০শে জুলাই, ১৯২০), মহারাজ বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন, দেখ্ তো কটা বেজেচে, আমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল, মা-ঠাকরুণ কেমন আছেন কে জানে! বৃহস্পতিবার সকালবেলা স্তবপাঠ শুনিয়া তিনি যখন বেড়াইতে বাহির হওয়ার উপক্রম করিতেছেন, সেই দুঃসংবাদ বহন করিয়া শরৎ মহারাজের নিকট হইতে টেলিগ্রাম আসিয়া পৌঁছিল। মহারাজ বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, শুইয়া পড়িলেন। খানিক পরে উঠিয়া বলিলেন, আমি হবিষ্য করব। মায়ের শিষ্য যারা আছ তিনদিন হবিষ্য করবে, জুতা পরবে না। নিজেও তিনি তিনদিন হবিষ্য করিলেন ও কয়েকদিন জুতা ব্যবহার করেন নাই। দুঃখ করিয়া একবার শুধু বলিয়াছিলেন, এতদিন পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম।[২]

---

১ বাসুদেবানন্দ-কথিত। মায়ের সান্নিধ্যে মহারাজ ভাবাবিষ্ট হইতেন, ভার চাপিবার জন্যই এইরূপ আচরণ করিতেন। মায়ের কাছে তিনি যেমন বেশী আসিতেন না, মঠের ঠাকুরঘরেও বড় একটা যাইতেন না। যেদিন যাইতেন—যেমন, ঠাকুরের জন্মতিথির দিন—স্নানান্তে গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া যাইতেন। সেই সময় তাঁহার অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুইটি কাঁপিতে থাকিত, সেই অবস্থায়ই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন। প্রণাম করিয়া উঠিবার পরেও দেখা যাইত, তাঁহার অঞ্জলিবদ্ধ করদ্বয় থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। বেলুড় মঠে তাঁহাকে দিয়া বাবুরাম মহারাজ একদিন ঠাকুরের সন্ধ্যাকালীন আরাত্রিক করাইয়াছিলেন (১৯১৫), ভাবাবেগে কম্পমানদেহে তিনি সেই আরতি সমাধা করিয়াছিলেন।

২ শালিখার পঞ্চাননবাবু শ্রীশ্রীমায়ের অস্থি সংগ্রহ করিয়া নিজের বাড়ীতে রাখেন। পত্রে সেকথা অবগত হইবামাত্র মহারাজ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন: যত শীঘ্র পার শ্রীশ্রীমার অস্থি মঠে দিয়া আসিবে, আর তাহা না হইলে গঙ্গায় দিবে। গৃহস্থ-ঘরে নানা অশুচিতার মধ্যে এবস্তু রাখিতে নাই।

## (২২) মহারাজ ও গুরুভাইরা

স্বামিজী তাঁহার মাকে দেখাশোনা করিবার জন্য মহারাজকে বলিয়া যান। ভুবনেশ্বরী আহ্বান করিলেই মহারাজ অগোণে তাঁহার সহিত দেখা করিতেন ও তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করিয়া দিতেন। তিনি তীর্থ করিবার জন্য পুরী-ধামে যাইতে চাহিলে মহারাজ তাঁহার পুরীতে যাওয়ার ও থাকার সকল বন্দোবস্তই করিয়া দিয়াছিলেন।[১]

পুরীধামে ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমারকে মহারাজ বলিয়াছিলেন ঃ

স্বামিজীর সবই অদ্ভুত রকমের ছিল। এই চৈতন্যময় পুরুষের কাছে সব সময় ঘেঁষা যেত না। আবার একএক সময় কত নিকটের মানুষ হয়ে যেতেন। তাঁর প্রেমের খেই আমরা পেতাম না। বেলুড় মঠে একদিন সকালে এক মাতাল এল, নেচে গেয়ে হাসি তামাসা করে, আসর জমিয়ে, ঘণ্টাখানেক বাদে বিদায় হল। তখন ঠাকুরপূজা হয় নি। স্বামিজী উপরে নিজের ঘরে বসে বিলাতের চিঠির জবাব লিখছিলেন আর মাতালের গান শুনছিলেন। মঠের খুঁটিনাটি কোথায় কি হচ্চে সব তিনি টের পেতেন। মাতালটি চলে যেতে সিঁড়ির কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গেল রে সে?—কী দিলি তাকে খেতে এত যে আনন্দ দিয়ে গেল? তাকে প্রসাদ দেওয়া হয়েচে শুনে চটে গিয়ে বল্লেন, হ্যাঁ। লোকটার লাখ টাকার আমোদের বদলে একটু বাতাসা হাতে! ধর্‌ যা, এই টাকা দুটো দিয়ে আয়, বেশ আনন্দ করে খেতে বলিস। আমরা মাতালকে মদ খেতে টাকা দিতে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। তাঁর ছিল প্রেমের দৃষ্টিতে কাজ, আমরা তাঁর বাঁধা গৎ বাজাচ্চি, তাও ঠিক হচ্চে না।

আর একদিন আমেরিকার এক চিঠির ভিতর ৭৫০্ টাকার একটি চেক এসেছিল। আমাকে ডেকে, আমার হাতে চেকটি দিয়ে বল্লেন, আমার যাবার

---

১ পুরী হইতে প্রত্যাগমনের পরেই নিউমোনিয়া জ্বরে ভুবনেশ্বরীর দেহান্ত হয় (২৫শে জুলাই, ১৯১১)।

পর ক্রিশ্চিনা দেশে যেতে চাইবে, তখন টাকা কোথায় পাবি ? যাবার আগে সবদিকের ব্যবস্থা তিনি এইভাবে করে গেছেন।

বেলুড় মঠে একদিন মহারাজ খাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার হাতমুখ ধুইবার জন্য ঘটিতে জল রাখিয়া খুদুমণি কার্যান্তরে গিয়াছিলেন এমন সময় তিনি হঠাৎ আহার শেষ করিয়া উঠিয়া পড়েন। বাবুরাম মহারাজ ঘটি নিয়া তাঁহার হাতে জল ঢালিয়া দিতে যাইতেই মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, বাবুরামদা, তুমি কেন, তুমি কেন ? তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া খুদুমণি ঘটি ছিনাইয়া নিলেন। বাবুরাম মহারাজ কহিলেন, তোমার সেবা তো আমাদেরই করবার কথা, আমাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তোমার সেবা থেকে এরা আমাদের বঞ্চিত করেচে।

চায়ের টেবিলে মহারাজ বসিয়া আছেন, বাবুরাম মহারাজ একগাছি মালা হাতে করিয়া আসিলেন, এবং মহারাজ, দেখ কেমন সুন্দর মালাটি !—বলিয়াই তাঁহার গলায় পরাইয়া দিলেন। তারপরে পরস্পর মুখনিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া দুই মহাপুরুষ অনেকক্ষণ অবধি স্থির নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন।[২]

'অহেরিব গতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।' প্রেমের গতি স্বভাবকুটিলা, ঠিক সাপের গতির মত—রসশাস্ত্র একথা বলেন। মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজের মধ্যে কখন কখন মানের অভিনয়ও হইত। ঠাকুরের বাগানের একটি লাউ বাবুরাম মহারাজ 'জয়-মা-কালী'কে দিয়াছেন। জয়-মা-কালী প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ, অতি দরিদ্র, জয়-মা-কালী বলিয়া ধেই ধেই নৃত্য করিত। লাউটি লইয়া যাইবার সময় মহারাজের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। বাবুরাম মহারাজকে উদ্দেশ করিয়া মহারাজ বলিলেন, সবাই যদি যাকে তাকে এমনি-ধারা দিতে থাকে, ঠাকুরের সেবা চলবে কেমন করে ? সেকথা শুনিবামাত্র গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া বাবুরাম মহারাজ গেটের দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু গেট পর্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসিলেন। বলিয়াছিলেন : ঠাকুর পথ

২ ব্রজেশ্বরানন্দ-কথিত।

আগলে দাঁড়িয়ে, গামছা-কাঁধে কোথায় যাচ্চ চাঁদ ?—বলে, গামছাখানা আমার গলায় জড়িয়ে টেনে নিয়ে এলেন।

পূর্ববঙ্গের ভক্তদের ঠাকুরের প্রতি অনুরাগের প্রশংসা করিয়া বাবুরাম মহারাজ ঢাকা ও ময়মনসিংহে যাইবার জন্য মহারাজকে অনুরোধ করেন। মহারাজ কহিলেন, তোমার হচ্চে সাপটা প্রেম, আমি বেছে বেছে প্রেম করি।

পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করিবার কালে, ময়মনসিংহ জেলার ঘারিন্দা গ্রামে শৌর্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাড়ীতে, বাবুরাম মহারাজ এক বিধর্মীর সঙ্গে এক-থালা হইতে ঠাকুরের প্রসাদী ফলমিষ্টি ভক্ষণ করেন। মুসলমান মৌলবী হিন্দুধর্মের সমদর্শিতাকে চ্যালেঞ্জ করিয়া তাহার সঙ্গে একপাতে খাইতে বলিয়াছিল। পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া বাবুরাম মহারাজ মারাত্মক কালাজ্বরে আক্রান্ত হন। এই ঘটনায় মহারাজ এতই ব্যথিত হইয়াছিলেন যে, শৌর্যেন-বাবুর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, যদি তাঁকে রক্ষা করতে পারবে না তো নিয়ে গিয়েছিলে কেন ?

বসু-ভবনের বড় হলঘরে যেদিন বাবুরাম মহারাজ দেহরক্ষা করেন (৩০শে জুলাই, ১৯১৮), সেইদিন সকাল হইতেই তাঁহার দেহের অস্বস্তি অত্যন্ত বাড়িয়া যায় ও তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকেন। তাঁহার শয্যাপার্শ্বে নিজের এক সেবককে দেবদেবীর স্তব পাঠে নিযুক্ত করিয়া, মহারাজ বিমর্ষগম্ভীরভাবে পায়চারি করিতে থাকেন। একবার নিজের ঘর পর্যন্ত যান, আবার হলঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়ান, এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতে থাকে। হঠাৎ একখানা ঠাকুরের ফটো লইয়া আসিয়া ও বাবুরাম মহারাজের কাছে বসিয়া তিনি বলিয়া উঠেন, বাবুরামদা, ঠাকুরকে দেখ। তাঁহার শরীর যাইতে 'চল মুসাফির বাঁধো গাঁটরিয়া বহুদূর যানা হোয়েগা' এই কথাগুলি বলিতে বলিতে, অতি বিহ্বলভাবে মহারাজ তাঁহার প্রিয় গুরুভ্রাতার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করেন ও নিজের ঘরে আসিয়া শিশুর মত ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন : স্বামিজী চলে গেলেন, তখন থেকে আমি বাবুরামদাকে অবলম্বন করে ছিলাম—হায় হায়! ধীরতার প্রতিমূর্তি শরৎ

মহারাজ ততক্ষণ তাঁহাকে বাহুবেষ্ঠনে রাখিয়া স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া দিতেছিলেন।

উমানন্দ ( যোগীন ) নামে মহারাজের এক শিষ্য ছিলেন, বেলুড় মঠে তিনি গুরুদেবের সেবার কাজ করিতেন। প্রথমবার মহারাজ যখন দাক্ষিণাত্যে যান উমানন্দ তখন মাদ্রাজ মঠের কর্মী। বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া উমানন্দকে হাসপাতালে যাইতে হয়, তাঁহার অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্গীন হইয়া উঠে। শশী মহারাজ প্রতিদিন হাসপাতালে যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। মৃত্যুর দুইতিন দিন আগে মহারাজকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, জানি, হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে আসতে তিনি নার্ভাস হতে পারেন, আমি তাঁকে ভিতরে আসতে বলব না ; গাড়ীতেই থাকবেন তিনি, জানালা দিয়ে একটিবার তাঁকে দেখব। শশী মহারাজের মুখে সেকথা শুনিয়াই মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, বল কি শশী, কত রকম রোগী সেখানে, আমার অসুখ হবে না ? পরপর দুইতিন দিন অনুরোধ জানাইয়াও শশী মহারাজ একই উত্তর পাইলেন।[৩] উমানন্দের শরীর যাইতে তাঁহার প্রাণে বিষম লাগিল। সকালবেলা মহারাজের ঘরে যাইতেই মহারাজ তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শারীরিক কুশল জানাইয়া শশী মহারাজ আবেগভরে বলিতে

---

৩ দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যে আসিয়া মহারাজ যখন বাঙ্গালোর মঠে ছিলেন, শহরে তখন প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু মহারাজকে সেকথা বলা হইত না, পাছে তিনি ভয় পাইয়া চলিয়া যান। খবরের কাগজে অবশ্য সকল খবরই বাহির হয়, আর মহারাজ খবরের কাগজ পড়েনও। একদিন মঠে ভীষণ পচা দুর্গন্ধ পাওয়া যাইতে লাগিল, সকলে ভয়ে অস্থির। অনুসন্ধানে দেখা গেল রান্নাঘরের ছাদে কয়েকটি ইঁদুর মরিয়া পচিয়া আছে। দরজা বন্ধ করিয়া ঘর পরিষ্কার করা হইতে লাগিল যাহাতে মহারাজ না জানিতে পারেন, কিন্তু তিনি নিজেই বলিতে লাগিলেন, দরজা বন্ধ করে তোরা কী কচ্চিস রে ? ইঁদুর মরেচে বুঝি ? তা হবেই তো, শহরে যা প্লেগ লেগেচে। তাঁহার একটুও নার্ভাস ভাব দেখা গেল না। ইহার পরে আরও কয়েকবার মরা ইঁদুর সাফ করা হইয়াছে, প্রত্যেকবারই তিনি সাবধানে, নাকে কাপড় বাঁধিয়া কাজ করিতে বলিয়া দিয়াছেন।

লাগিলেন, তুমি কী নিষ্ঠুর মহারাজ, উমানন্দ তো এখানকারই ছেলে, অন্তিম-কালে একটিবার দেখতে চাইল, আর তুমি দেখা দিলে না? বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। মহারাজও গম্ভীর হইয়া গেলেন, খানিক পরে আস্তে আস্তে কহিলেন, শশী, চোখের দেখাটাই কি সব, আমি কি তার কাছে যাই নি? সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া শশী মহারাজ কহিলেন, মহারাজ, তোমাকে আমরা বুঝে উঠতে পারি না!

মহারাজ মাদ্রাজ মঠে আছেন। সকালবেলা তাঁহার ঘরে যাইয়া শশী মহারাজ তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। কৃষ্ণলাল মহারাজও সেই সময়ে গিয়াছিলেন, তিনি হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিলেন। নিজের ঘরে আসিয়া শশী মহারাজ কৃষ্ণলালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ও মহারাজকে এভাবে নমস্কার করার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণলাল কহিলেন, মহারাজ চান না যে আমি তাঁকে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করি; মহারাজের কায়স্থশরীর, আমার ব্রাহ্মণশরীর কিনা। শশী মহারাজ অমনি কৃষ্ণলালের হাত ধরিয়া টানিয়া মহারাজের ঘরে লইয়া গেলেন ও দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িয়া মহারাজের পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিয়া কহিলেন, ওরে কেষ্টলাল, (নিজের শরীর দেখাইয়া) এটা চণ্ডালশরীর নয়, এটা চণ্ডালশরীর নয়; যদি কল্যাণ চাস, এরকম করে মহারাজকে প্রণাম কর্, তা না হলে নিপাত যাবি। কৃষ্ণলাল আদেশ পালন করিলেন।

মহারাজ ও হরি মহারাজ পুরীতে আছেন শশীনিকেতনে। মহারাজের দুপুর বেলার আহার হইয়া গিয়াছে, সেবককে কহিলেন, চল্, কাল যে গাছটা লাগানো হয়েচে তার গোড়াতে আঁচাব। বাগানে গিয়া তিনি সেই গাছের গোড়ায় আঁচাইতে সুরু করিয়াছেন, এমন সময় ছুটিয়া গিয়া হরি মহারাজ তাঁহার মাথায় ছাতা ধরিলেন। প্রচণ্ড রৌদ্র তখন, বারান্দা হইতে হরি মহা-রাজ দেখিতে পাইতেছিলেন। ছাতা ধরিয়াই তিনি সেবককে কহিলেন, দেখতে পাচ্চ না, মহারাজের মাথায় রোদ্দুর লাগচে? তাঁহার দিকে চাহিয়া মহারাজ

বলিতে লাগিলেন, আপনি কেন ধরচেন, ছাতাটা ওর হাতে দিন। দেখুন দিকিনি, আপনি খালি পায়ে ছুটে এসেচেন, কাঁকর টাকর ফুটে একটা কাণ্ড করবেন দেখছি। তিনি তাড়াতাড়ি আঁচাইয়া উঠিয়া পড়িলেন।

রামবাবুর মা কাশীপ্রাপ্তা হইয়াছেন, তাঁহার শ্রাদ্ধে নিতাইবাবু প্রভৃতি অনেকে কাশী যাইবেন। নিতাইবাবুর ইচ্ছা ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়া কাশীতে যান। ঈশ্বর সেকথা মহারাজকে জানাইলে তিনি কহিলেন, তুই নিতাইয়ের সঙ্গে যা, বিশ্বনাথ দর্শন করে আয়; ফেরবার সময় অযোধ্যা, এলাহাবাদ, বিন্ধ্যাচল দর্শন করে আসিস। হরি মহারাজ সেবাশ্রমের যে বাড়ীতে থাকিতেন, কাশীতে যাইয়া ঈশ্বর সেই বাড়ীতে উঠিলেন ও ধূলাপায়ে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলেন। হরি মহারাজ অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন, ঈশ্বরকে দেখিয়াই উঠিয়া বসিলেন ও বলিলেন, ঈশ্বর, তুমি? মহারাজ এসেচেন? ঈশ্বর বিশ্বনাথ দর্শন করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া বলিলেন, আমি ভেবেছিলাম তুমি যখন এসেচ, নিশ্চয়ই মহারাজও এসেচেন। তুমি মহারাজকে ফেলে বিশ্বনাথ দর্শন করতে এসেচ?—সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ ছেড়ে বিশ্বনাথ-দর্শন? শেষের 'বিশ্বনাথ-দর্শন' কথাটা তিনি এমন জোরে উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন যে, ঈশ্বর ঘাবড়াইয়া গেলেন ও কোনরূপে প্রণামটি সারিয়াই চলিয়া আসিলেন।

শ্রীশ্রীমা যখন অন্তিমশয্যায়, ছোলাভাজা সহ একবাটি মুড়ি কেহ তাঁহাকে আনিয়া দিয়াছিল, তিনি খাইতে চাহিয়াছিলেন। শরৎ মহারাজ তাহা জানিতে পারিয়া মায়ের ঘরে যান ও তাঁহার কাছে ভিক্ষা চাহিয়া বাটিটি হস্তগত করেন। কিন্তু কর্তব্যবোধে করিয়াও এই কাজটির জন্য তাঁহার অনুশোচনার অন্ত ছিল না। মায়ের অপ্রকট হওয়ার পরে কলিকাতায় ফিরিয়া মহারাজ একদিন সকালবেলা যখন উদ্বোধনে আসিয়াছেন, শরৎ মহারাজ কাতরভাবে কহিলেন, মহারাজ, তোমার মধ্যে মা আছেন, ছোলাভাজা দিয়ে দুটি মুড়ি আজ খাও। মহারাজ বলিলেন, তাই নিয়ে এস শরৎ, আজ মুড়ি-ছোলাভাজাই

খাওয়া যাক। মহারাজ খাইতেছেন, আর দীনহীনভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, বুকের উপর দুই হাত রাখিয়া সজল নয়নে শরৎ মহারাজ দেখিতেছেন!

গি— নামে পূর্ববঙ্গের এক ভদ্রলোক সন্ধ্যার পর উদ্বোধনে শরৎ মহারাজের কাছে আসিতেন ও নীচের ছোট ঘরটিতে বসিয়া কথাবার্তা শুনিতেন। একদিন শরৎ মহারাজ বলিলেন, তুমি আমার কাছে আস, কাছেই মহারাজ আছেন, তাঁর কাছে যাও না কেন? তাঁর কাছেও যাবে। গি— তথাপি মহারাজের কাছে যাইতেন না, মহারাজকে তাঁহার ভাল লাগিত না, তাঁহাকে বুঝিতে পারিতেন না। শরৎ মহারাজ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি যদি মহারাজের কাছে না যাও তো আমার কাছেও এসো না। অতঃপর একদিন সন্ধ্যার সময় গি— বসু-ভবনে গেলেন। মহারাজ তখন নিজের ঘরে স্থির-ভাবে বসিয়া গড়গড়ায় তামাক খাইতেছিলেন। মেজেয় দুইটি ভদ্রলোক চুপ-চাপ বসিয়াছিলেন, মহারাজের দৃষ্টি সেদিকে ছিল বলিয়া মনে হইতেছিল না। গি— প্রণাম করিয়া তাঁহাদের পাশেই নিজের স্থান করিয়া নিলেন। প্রায় একঘণ্টা পরে মহারাজের দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পড়িল, তিনি গি—র পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন: ঠাকুরকে চিন্তা করবে, তাঁকে ডাকবে, তা হলেই সব পাবে। আমি আর কী বলব, ঠাকুর তোমাদের কৃপা করুন, তোমাদের চৈতন্য হোক। গি— নিজেকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করিলেন, শরৎ মহারাজের কাছে যাইয়া সেকথা নিবেদন করিলেন।

মহারাজ যখন উদ্বোধনে থাকিতেন (১৯১৭) শরৎ মহারাজ তাঁহাকে ঠাকুরের প্রতীকবিগ্রহ জ্ঞান করিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন। উদ্বোধন হইতে বসু-ভবনে চলিয়া যাওয়ার পর, কার্তিক (নির্লেপানন্দ) একদিন প্রণাম করিতে গেলে মহারাজ কহিলেন, কিরে তোদের আজকাল আর বুঝি গপ্পাটপ্পা হয় না?—তোদের ওখানে (উদ্বোধনে) যাব কি! কার্তিক বলিলেন, গপ্পা হওয়া তো আপনার উপরেই, আপনি চলুন, আবার গপ্পা হবে। 'এক বনে কি দুই সিংগি থাকে রে?' মহারাজ মন্তব্য করিলেন।

# অন্ত্যলীলা

## (১) স্বরূপের উদ্দীপনা

মুক্তেশ্বরানন্দের বর্ণনা :

বালগোপালের উপাসিকা কতিপয় মারহাট্টা রমণী মাদ্রাজের এক বাড়ীতে থাকিতেন। কোন মহাপুরুষের দর্শন পাইলে তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া গিয়া সাক্ষাৎ গোপালবুদ্ধিতে পূজা করিতেন, নতুবা তাঁহাদের ভজনালয়ে বাড়ীর কর্তা ছাড়া অপর কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। একদিন বাড়ীর কর্তার সঙ্গে আসিয়া ঠাকুরকে তাঁহারা ভজন শুনাইলেন ও মহারাজকে তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া যাইতে চাহিলেন। শরীর অসুস্থ বলিয়া মহারাজ যাইতে সম্মত হইলেন না, তাঁহাদের পীড়াপীড়িতে তিনি মহাপুরুষকে পাঠাইয়া দেন।

মহাপুরুষের সঙ্গে গিয়াছিলাম আমি, রামলালদাদা, স্বামী শর্বানন্দ ও মাদ্রাজ মঠের কতিপয় ব্রহ্মচারী। মহারাজ আমাদের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনিলেন। মেয়েরা জনে জনে ঠাণ্ডা জলে পা ধুয়াইয়া দেয় শুনিয়াই বলিলেন, ওরে বাবা, আমি যাব না। তিনি স্নানের সময় ছাড়া পায়ে জল দিতেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে যাইতেই হইল, তাঁহাদের একান্ত প্রার্থনা তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। মহারাজের সঙ্গে গিয়াছিলাম আমি ও শর্বানন্দ। আমার যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না, সেদিনকার ব্যাপার আমার ভাল লাগে নাই। মহারাজ কহিলেন, নারে, তুই চল্ ; ওরা নানারকম করে, তুই বারণ করবি যাতে বারবার পা না ধোয়ায়।

সিংহাসনে বালগোপালের মনোরম পটমূর্তি স্থাপিত। অপর একটি উত্তমাসনে তাঁহারা মহারাজকে বসাইলেন। সম্মুখে পূজার উপকরণ—ফুল-চন্দন, ধূপদীপ, নৈবেদ্য, রূপার ভৃঙ্গারে জল, ছোট ছোট ভৃঙ্গারে সুগন্ধি জল, রূপার অনেকগুলি কেঁড়েতে দুধ, প্রত্যেকটি কেঁড়ের মুখে একটি করিয়া সোনার ছোট গেলাস। প্রথমতঃ মহারাজকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা গুরুবন্দনা গাহিলেন।

তারপরে গোপালকে পূজা করিয়া, গোপালের মুখের কাছে দুধের গেলাস ধরিয়া মানসে দুধ খাওয়াইলেন। মেয়েরা দেখিতে দেবীর মত, তাঁহাদের পরিধানে নানাবর্ণের শাড়ী—সবুজ, হলদে, লাল—আঁটসাঁট করিয়া পরা, মাথায় এলোচুল। মহারাজকে প্রণাম করিয়া তাঁহারা অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়াইলেন।

জলচৌকির উপরে রূপার পাত্রে মহারাজের পা-দুইখানি রাখিয়া, ও নিজে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাঁহাদের একজন পা ধোয়ানোর উপক্রম করিতেই আমি বলিয়া উঠিলাম, মহারাজের পায়ে জল দেবেন না। আমার দিকে তাঁহাদের লক্ষ্যই ছিল না, এই কথায় সকলেই বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিলেন। মহারাজ বলিলেন, আচ্ছা, একদিনই তো? আমার কিছু হবে না, তুই আর বারণ করিস না। আশ্বস্ত হইয়া মেয়েরা পূজা সুরু করিলেন।

প্রথমতঃ বড় ভৃঙ্গারের জলে, এবং পরে পরে ছোট ছোট ভৃঙ্গারগুলির সুগন্ধি জলে পা ধুয়াইয়া সেই উপবিষ্টা মেয়েটি নিজের চুল দিয়া মুছাইলেন। তারপর একটা ভেলভেটের গদীর উপর স্থাপন করিয়া পা-দুইখানিতে ফুল-চন্দনাদি দিলেন ও ছোট একগাছি মালা রাখিলেন। এইভাবে পরপর প্রত্যেকটি মেয়ে—তাঁহাদের সংখ্যাও দশবারো জন হইবে—পা ধুয়ানো, পা মুছানো ও পা পূজা সম্পূর্ণ করিলেন। পা ধুয়ানোর জলে কাঁধ-উঁচু প্রশস্ত পাত্রটি কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া গেল, পাত্রটি তাঁহারা সরাইয়া নিলেন। তারপরে প্রত্যেকে একএকটি দুধের কেঁড়ে বগলে ও গেলাস হাতে নিয়া মহারাজকে ঘিরিয়া গান ও নৃত্য সুরু করিলেন। নামদেব-রচিত যে গানটি তাঁহারা গাহিয়াছিলেন ঃ

দুধ পিও মেরে রাজগোপালা, দুধ পিও মেরে নন্দদুলালা।
কালারে বাছোরা কপিলা গাই, দুধ দোহায়ন নাম লাগি ॥
সোনেকা কছুয়া দুধ ন ভরিয়ো, পিও নারায়ণ আগে ধরিয়ো।
পাষাণকী মূরত দুধ নহি পিওত, শির পছারত নামদেবানি ॥
শির পছারত নামা রোয়ে, শির পছারত নামদেবানি।
এ্যায়সী ভকতি হাম কভে নহি পায়ো, নামদেবানে দুধ পিলায়ো ॥

গাহিতে গাহিতে একএক জন করিয়া যেমন সম্মুখে আসিতেছেন অমনি কেঁড়ে হইতে গেলাসে দুধ ঢালিয়া, দাঁড়ানো অবস্থায়ই মাথা নীচু করিয়া, মুখে গেলাস ধরিয়া দুধ খাওয়াইতেছেন। দুধ খাওয়াইতেছেন আর গানও গাহিতেছেন। এইভাবে একএক জন কতবারই যে দুধ খাওয়াইলেন। মহারাজ তখন ভাবমগ্ন, তাঁহাকে জীবন্ত গোপালবিগ্রহ মনে হইতেছিল। একটা দিব্য ভাবে ও সুগন্ধে ঘরটি ভরিয়া গিয়াছিল। মেয়েদেরও দেহের হুঁশ আছে বলিয়া মনে হইতেছিল না। আমি তো কাছেই দাঁড়াইয়াছিলাম, তাঁহাদের এলোচুল ও আঁচল পুনঃপুনঃ আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছিল, আমার পুরুষ-বুদ্ধিটি তখনকার মত বিলুপ্ত হইয়াছিল। কেবলই মনে হইতেছিল,—এই কি বৃন্দাবন? ইনিই কি ব্রজের গোপাল? ইঁহারাই কি ব্রজরমণী? আর গোপালকে লইয়া ইহাই কি তাঁহাদের বাৎসল্যরসের সম্ভোগ?

এইভাবে কতক্ষণ অতিবাহিত হইল বলিতে পারি না, সময়ের হুঁশ কাহারো ছিল না। মেয়েদের কেঁড়ের দুধ যখন নিঃশেষ হইল, তাঁহাদের গান ও নৃত্য থামিল, মহারাজের ভাবের গাঢ়তাও কমিয়া আসিল। মহারাজকে তাঁহারা প্রণাম করিলেন। হঠাৎ একটু উত্তেজিতভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন, ঈশ্বর, তুই একটা গান গা। অদ্ভুত ভাবাবেগে, দেশকালপাত্রের বিচার না করিয়াই গান ধরিলাম: ডমরু হরকর বাজে বাজে। ভাবান্তর হইয়া গেল, মহারাজ প্রকৃতিস্থ হইলেন।[১]

---

১ মেয়েরা অতঃপর মহারাজের সঙ্গীদের হাতে গোপালের ফলমিষ্টি প্রসাদ দেন। পরেও তাঁহারা নারিকেল কদলী ইত্যাদি ফল হাতে নিয়া মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে গান শুনাইয়াছেন। তাঁহার মাদ্রাজ পরিত্যাগের পূর্বদিনেও আসিয়াছিলেন। মাদ্রাজ হইতে ২২-১০-১৯২১ তারিখের পত্রে মহারাজ লিখিয়াছেন: কাল সন্ধ্যার সময় এখানকার মহারাষ্ট্রীয় ভক্তরা আমাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আমি আর যাই নাই, বাকি সকলেই প্রায় গিয়াছিল। তাহারাও দুইদিন মঠে আসিয়া ভজনাদি করিয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে সকলেই ভদ্রঘরের স্ত্রীলোক, দোহারে গায় এবং মোহড়ায় একজন মাত্র পুরুষ থাকে—বড় চমৎকার গায়, সকলেই বিশেষ ভক্তিমতী। শুনিলাম গতকাল তাহারা বেশ ভজনাদি করিয়াছিল এবং পরে আমাদের সংক্ষেপ রামনাম শুনিয়া বড় আনন্দ করিয়াছে।

এই দিনের ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ শুনিয়া শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, এখানেই মহারাজের স্বরূপস্মৃতি উদ্দীপিত হয়ে গিয়েছিল।

মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া, ভুবনেশ্বর মঠ হইতে কলিকাতায় আসিয়া, মহারাজ আছেন বসু-ভবনে। দোতলায় গানের আসর বসিয়াছে, ঢপওয়ালী সাজিয়া রামলালদাদা গাহিতেছেন ঃ

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিন দুয়েকের মত।
তোর মন মানে তো থাকবি সেথা, নইলে আসবি দ্রুত ॥
( জল বেড়েছে হে ) ( শ্রীযমুনার জল বেড়েছে হে )
( ব্রজগোপীর নয়নজলে জল বেড়েছে হে )
আগে ছিল এক হাঁটু জল, এখন যমুনা অতল, সাঁতার দিতে হবে।

মহারাজের সম্মুখে হাত মুখ নাড়িয়া নৃত্য সহকারে দাদা গাহিতেছেন, আর মহারাজও সেই নৃত্যের তালে তালে নিজের গা দোলাইতেছেন—উভয়ের মধ্যেই একটা হালকা রঙ্গরসের ভাব। ক্রমে গায়কের ভাবান্তর লক্ষিত হইল, তাঁহার চক্ষু দুইটি অশ্রুসজল হইয়া উঠিল। মহারাজও হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন—নয়নযুগল ঈষৎ মুদিত হইয়াছে, ভাবের আবেগে তনু মৃদু আন্দোলিত হইতেছে। একটা গাম্ভীর্যভরা ভাবে সমস্ত ঘরটি থমথম করিতে লাগিল। মহারাজের স্বরূপস্মৃতি আর একবার উদ্দীপিত করিয়া ব্রজে ফিরিবার কাকুতি জানাইয়া—গানও থামিয়া গেল।[২]

## (২) আকর্ষণী শক্তির উন্মাদনা

সহজপ্রেমে জীবকে নিজের অভিমুখে আকর্ষণ করেন যিনি তিনিই কৃষ্ণ। বৃন্দাবনের প্রেমোন্মাদনার মূলে আছে সহজপ্রেমের এই আকর্ষণ, যাহার প্রভাব ব্রজের পশুপক্ষী বৃক্ষলতা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। কৃষ্ণসখা শ্রীরাখালের মধ্যে এই

২ 'বনকুসুমের মধুর সৌরভে তোমায় রাখিব সখা হে।' বেলুড় মঠের চায়ের টেবিলে বসিয়া মহারাজ একদিন গাহিয়াছিলেন, কোনও ভক্ত লিখিয়াছেন। সময় উল্লিখিত নাই।

আকর্ষণশক্তির বিশেষ প্রকাশ। যখন যেখানে মহারাজ অবস্থান করিতেন তাঁহার চারিপাশে একটা আনন্দের পরিমণ্ডল সৃষ্ট হইত। যেকেহ ইহার মধ্যে আসিয়া পড়িত সেই প্রাণে প্রাণে ইহা অনুভব করিত। আর সেইজন্যই বেলুড় মঠে, অপর কোন আশ্রমে বা গৃহী ভক্তের বাড়ীতে মহারাজের আগমন-সম্ভাবনায় তত্রত্য অধিবাসীরা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিত।

মহারাজ যখন বেলুড় মঠে থাকিতেন, সকালে বিকালে দক্ষিণপ্রান্তের গেট হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরপশ্চিম কোণের খিড়কীর দরজা পর্যন্ত মঠভূমির সর্বত্র পায়চারি করিয়া বেড়াইতেন। কখনো ফুলবাগানে, কখনো বা সবজি-বাগানে যাইতেন, গাছপালা শাকসবজির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিতেন, এবং তথাকার কাজে নিযুক্ত বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিতেন।

তিনি যখন গোচারণভূমিতে যাইতেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র গরুগুলি তৃণ-ভোজন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কাছে চলিয়া আসিত এবং অর্ধবৃত্তাকারে তাঁহাকে ঘিরিয়া, তাঁহার মুখপদ্মে নয়ন সংস্থাপিত করিয়া, তাঁহার আদর লাভের আশায় ঊর্ধ্বমুখ হইয়া দাঁড়াইত। তাহাদের প্রত্যেকের গায়ে লাঠি বুলাইয়া তিনি আদর করিতেন। পশ্চিমদেশীয় গাভী 'নাগরী' ইহাতে সন্তুষ্ট হয় না, তাহার গায়ে গলায় হাত বুলাইয়া দিতেন। দূর হইতে মহারাজ যখন নাগরীকে আহ্বান করিতেন, ছোট বাছুরের মত ঊর্ধ্বপুচ্ছ হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে সে ছুটিয়া আসিত।[১]

---

১ বসু-ভবনের দক্ষিণদিকে একটি খাটাল ছিল। একদিন বামবাবু দেখিলেন একটি হারিয়ানা শ্রেণীর গাভীর বাচ্চাকে গয়লা কসাইয়েব নিকট বিক্রী করিয়া দিতেছে। বাচ্চাটি যথেষ্ট দুধ খাইতে না পাইয়া আধমরা হইয়াছে। তিনি পাঁচটাকা দিয়া বাচ্চাটি কিনিয়া নিলেন, এবং গাড়ীর পেছনদিকে বাঁধিয়া বেলুড়মঠে লইয়া গিয়া মহারাজকে উপহার দিলেন। বাচ্চাটির জন্য মহারাজ প্রথমতঃ একসের দুধ, এবং সে একটু সবল হইয়া উঠিলে আধসের দুধ ও দুইখানা রুটি বরাদ্দ করেন। তিনি স্বহস্তে খাওয়াইতেন ও নাগরী বলিয়া ডাকিতেন।

মহারাজের মন্ত্রশিষ্য কেদারনাথ বসু আপিস করিয়া যখন বাড়ী ফিরিলেন রাত তখন নয়টা। তাড়াতাড়ি মুখ-হাত-পা ধুইয়াই মঠে যাইবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। পরিবার তাঁহাকে যাইতে দিবেন না বলিয়া জেদ ধরিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ফল হয় নাই। আহিরীটোলার ঘাটে আসিয়া দেখেন তাঁহার গুরুভ্রাতা সুরেন সেনও মঠে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। দুইজনে মিলিয়া এক নৌকা ভাড়া করিলেন। ভাঁটা উজাইয়া মঠে পৌঁছিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল, আর তখনই দেখা গেল, আরো দুইখানি নৌকা ঘাটে ভিড়িতেছে। একখানি হইতে ডাক্তার কাঞ্জিলাল ও অপরখানি হইতে কালীপদ বাঁড়ুজ্যে—দুইজনেই মাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য—বাহির হইয়া আসিলেন ও সবিস্ময়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। চারিজনেরই মুখে তখন একটিমাত্র কথা, 'বাড়ীতে মন টিকল না!' মহারাজ হয়তো ঘুমাইতেছেন, এত রাত্রে কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকা যাইবে, ইত্যাদি বলাবলি করিতে করিতে দোতলায় আসিয়া দেখেন মহারাজ বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহারা প্রণাম করিয়া উঠিতেই কহিলেন, ওখানে প্রসাদ রাখা আছে, খেয়ে আয়। পূর্বেই তিনি চারিজনের মত প্রসাদ আনাইয়া রাখিয়াছিলেন।

মহারাজ তাঁহার শিষ্যা রানুর মাতুল শচীন রায়ের শাঁখারীটোলার বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছেন, তিনদিন থাকিবেন (ফেব্রুয়ারী, ১৯২২)। রানু বিবাহিতা হইয়াও ব্রহ্মচারিণী, ভগিনীপতি অধ্যাপক কানাইলাল পালের কাছে বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিল। মহারাজ বলিতেন, রানু ব্রহ্মবাদিনী—খুব ভাল মেয়ে, ভাল আধার। প্রগাঢ় বিশ্বাসে শ্রীগুরুপদে আত্মসমর্পণ করিয়া সে তাঁহার বিশেষ স্নেহপাত্রী হইয়া উঠিয়াছিল।

শচীনবাবুদের বৃহৎ পরিবারের অপর কেহই মহারাজের শিষ্য ছিলেন না, কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁহাকে ভক্তি করিতেন এবং পরমাত্মীয়বুদ্ধিতে সেবা করিতেন। মহারাজকে পাইয়া আজ তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই, সেই আনন্দ সকলেরই চোখেমুখে খেলিয়া বেড়াইতেছে। এককালে তাঁহাদের এই

বৃহৎ ভবনে দুর্গাপূজা হইত, আবার যেন সেই প্রাণমাতানো মহোৎসব সুরু হইয়াছে।

মহানন্দে দুইদিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন আনন্দের মধ্যেও একটা বিষাদের ভাব জাগিয়া উঠিতে লাগিল, পরদিন মহারাজ চলিয়া যাইবেন। রাত্রিবেলা সেই ভাবটি প্রকট হইয়া পড়িল, সকলেরই মুখে বিষণ্ণতার ছায়া। কাঁদিতে কাঁদিতে একটি কচি মেয়ে মহারাজের সেবককে জিজ্ঞাসা করিল, আজকের রাত্তিরটা যদি না পোহায় তাহলে তো মহারাজ এখানেই থাকবেন? আরো দুইএক দিন থাকিয়া যাইবার জন্য সকলেই একান্তভাবে অনুরোধ করিতে থাকিলে মহারাজ কহিলেন, আমার কি যাবার ইচ্ছা ছিল? মঠে মিটিং আছে, শর্বানন্দ নিতে আসবে। বিকালবেলা শর্বানন্দ যখন মোটরগাড়ী লইয়া আসিলেন, সকলের চক্ষু হইতে জল গড়াইতে লাগিল। শর্বানন্দকে মহারাজ নীচে যাইয়া অপেক্ষা করিতে বলিলেন, আর এমন এক গল্প জুড়িয়া দিলেন যে, সকলেই হো হো করিয়া হাসিতে সুরু করিল। মুখে হাসি আর দুই গণ্ডে বহমান অশ্রুর ধারা—এক অপূর্ব দৃশ্য! এক বুড়ী তো হাসিয়া গড়াগড়ি। সেই অবসরে গড়গড়া ইত্যাদি জিনিসপত্র গাড়ীতে তুলিয়া দিতে সেবককে মহারাজ ইঙ্গিত করিলেন। তারপরে গল্প করিতে করিতেই সকলের সঙ্গে তেতলা হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন। যখন তিনি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন, গল্প বলাও শেষ হইল, আর তিনি যে চলিয়া যাইতেছেন এই সম্বিৎও ফিরিয়া আসিল। সকলে তখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

নবগোপাল ঘোষের স্ত্রী শ্রীমতী নিস্তারিণী ব্রজগোপীর ভাবে ভাবিতা ছিলেন, ঠাকুরকে স্বহস্তে খাওয়াইয়াছিলেন। স্বামিজী যেদিন তাঁহাদের রামকৃষ্ণপুরস্থ ভবনে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিতে আসেন সেদিন তাঁহাকেও কয়েক চামচ পোলাও খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন। 'বৌদিদি' সম্বোধনে স্বামিজী তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন।

নিস্তারিণীর পরিবারস্থ অনেকেই মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, অনেকবার মহারাজ রামকৃষ্ণপুরে তাঁহাদের বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছেন। যখনই তিনি

আসিতেন, দিন কয়েক না থাকিয়া যাইতে পারিতেন না। একবার তাঁহার এখানে অবস্থানকালে শরৎ মহারাজ আসিয়া পড়েন কাগজপত্র সঙ্গে লইয়া, আর অনুযোগ করিয়া বলেন, মহারাজ, চল ; তোমার জন্মে যে কাজ আটকে আছে। মহারাজ কহিলেন, কাগজপত্র এখানেই নিয়ে এলে হয় না শরৎ? নীরদের মার ভক্তিতে যে আমাকে বেঁধে রেখেচে ! নীরদের মা ( নিস্তারিণী ) মহারাজকে দেখিতেন, আর তাঁহার দুই চক্ষে ধারা বহিত।

ভূমানন্দ লিখিয়াছেন : "একবার তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলে কেহ বড় সহজে উঠিতে চাহিত না। সকলেই প্রাণে প্রাণে একটা বিপুল আনন্দধারা অনুভব করিত। এই আনন্দধারা আফিমের মৌতাতের ন্যায় ক্রিয়া করিত। যে একবার আসিত সে আবার না আসিয়া পারিত না। যে বহুবার আসিয়াছে সে বহুবার আসিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না। সে যেন কিএক অদ্ভুত প্রহেলিকার রাজ্য যাহা বাক্যে বলা যাইত না, অথচ তাহার প্রভাব ও আকর্ষণী শক্তি অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না।"

## (৩) প্রয়াণের প্রাক্কালে

মহারাজ যখন দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্য-পরিভ্রমণে যান তখন ভূমানন্দকে সঙ্গে নিয়াছিলেন অন্যতম সেবকরূপে। তথা হইতে ফিরিবার পর ভূমানন্দকে শরৎ মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন, মহারাজকে কেমন দেখলে? ভূমানন্দ বলিলেন : দেখলাম আপনাদের মত তাঁর কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নাই ; তাঁর সেবা করতে হলে, মতলব ছেড়ে, যখন তিনি যেমন বলবেন তেমনটি করতে হবে ; আপনাদের বেশ সুনিয়ন্ত্রিত জীবন, কিন্তু মহারাজের কোন বিষয়ে নিয়মও দেখলাম না, ভাবের মধ্যে ইতিও করেন না ; খাওয়া দাওয়াতে পর্যন্ত একঘেয়ে ভাব নাই—তিনি আপনাদের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুষ। শরৎ মহারাজ প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, তা হলে তুমি মহারাজকে লক্ষ্য করে দেখেচ !

ভুবনেশ্বরে আসিয়া ডক্টর বিধুভূষণ রায় মাসেক কাল মহারাজের সঙ্গলাভে

কৃতার্থ হন (১৯২০)। স্যানিটোরিয়ামে থাকিয়া দুইবেলা তিনি মঠে আসিতেন ও অনেকক্ষণ মহারাজের কাছে বসিয়া থাকিতেন। তিনি বলিয়াছিলেনঃ আমরা বৈজ্ঞানিক লোক, বাইর দেখেই বিচার করি। মহারাজকে দিনের পর দিন দেখে দেখে এই ধারণা হয়েচে যে, তিনি এমন একজন লোক যাঁর সঙ্গে দুনিয়ার কোন মানুষেরই মিল নাই।

কিন্তু এই মিল না থাকাটাই মানুষের বুঝিবার পক্ষে মস্ত বড় প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়, বিশেষতঃ সমসাময়িক মানুষের পক্ষে। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণের লোকোত্তর জীবনই ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। সখেদে কৃষ্ণসখা উদ্ধব বলিয়াছিলেনঃ এই দুনিয়ার মানুষ কী হতভাগা, বিশেষ করে যদুবংশীয়েরা, একসঙ্গে ঘর করিয়াও কৃষ্ণকে যাহারা চিনিতে পারিল না।[১]

'ব্রজের রাখালে'র বৈচিত্র্যময় চরিত্র যে তাঁহার প্রাণসখা কৃষ্ণেরই বহু-বৈচিত্র্যময় চরিত্রের ছাঁচে গড়া, রামকৃষ্ণের মানসপুত্র হওয়া সত্ত্বেও, রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটিই যে তাঁহার চরিত্রে সমধিক প্রতিফলিত, যতই তাঁহাকে চিন্তা করিয়াছি, যতই তাঁহার লীলাকথা আন্দোলন করিয়াছি, ততই একথা আমাদের মনে হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে ভালবাসা, পতিততাপিতের প্রতি করুণা, বালকবৎ ক্রীড়াকৌতুক ও রঙ্গরসপরায়ণতা, স্বতন্ত্র আহারবিহার, সর্বোপরি তাঁহার যোগস্থ গুরুগাম্ভীর্যভাব—সব কিছু মিলিয়া সাধারণ সিদ্ধ-পুরুষের মাপকাঠিতে তাঁহার চরিত্রের পরিমাপ করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। অন্যের কথা কী, মঠের কোন কোন প্রবীণ সাধুও তাঁহাকে বুঝিতে গিয়া বিভ্রান্ত হইতেছিলেন।

উদ্বোধনে একদিন কিরণ (অশেষানন্দ) শরৎ মহারাজের গা টিপিয়া দিতেছিলেন যখন, শরৎ মহারাজ বলিয়াছিলেন, মহারাজকে তুমি কি যা তা ভাব? তিনি আমাদের সকলের মন নিয়ে কাদার তালের মত যেমন ইচ্ছা

১ দুর্ভগো বত লোকোঽয়ং যদবো নিতরামপি।
যে সংবসন্তো ন বিদুর্হরিং মীনা ইবোডুপম্॥—শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৩।২।৮

গড়ন দিতে পারেন! শেষের দিকে মহারাজও একাধিকবার বলিয়াছেন, মঠে আমাকে কেউ বুঝতে পারে না, এক শরৎ ছাড়া।

দেহরক্ষার বছরখানেক আগেকার কথা। বেলুড় মঠে একদিন নিজের ঘরে তাঁহার সেবকদিগকে মহারাজ বলিয়াছিলেন: এতদিন আমার সঙ্গে রইলি, আমার ভাব কি কিছুই বুঝতে পারলি নি—নিতে পারলি নি? তোদের জন্যে আমাকেও কত কথা শুনতে হচ্চে, লোকে বলতে কসুর করচে না; তোদের জন্যে আমি বাদুড়ঝোলা হয়ে আছি।

সেবকদিগকে মহারাজ কাহারো কাছে কোন জিনিস চাহিয়া লইতে বারণ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজে জনৈক সেবক সেকথা অমান্য করায় তাহাকে তিরস্কার করেন। মাদ্রাজ হইতে ভুবনেশ্বরে ফিরিবার পর অনুরূপ আর একটি ঘটনায় তাঁহাকে বিচলিত হইতে দেখা যায়। মহাপুরুষ তখন ভুবনেশ্বর মঠে ছিলেন, দুঃখে ও ক্ষোভে মহারাজ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, দেখুন তারকদা, কতবার এদের বলেচি, কারু কাছ থেকে কিছু চেয়ে নিয়ো না, তা আমার কথা এরা কেউ শোনে না; এদের নিয়ে, এদের ব্যবহারে আমি যে কী যন্ত্রণা ভোগ করি তা বলে বোঝাবার নয়। মঠ-মিশনের বৃহৎ ব্যাপার নিয়া যত ঝামেলা তাঁহাকে পোয়াইতে হইতেছে—বিরুদ্ধ প্রকৃতির লোকদের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো, বহুদোষে দোষীকেও ক্ষমা করিয়া সংশোধনের চেষ্টা, আর সহ্য করা, ইত্যাদি বলিয়া বলিয়া শেষে কহিলেন, আমি আর পারচি না তারকদা, এবার আপনারা সব দেখেশুনে নিয়ে আপনারাই চালান। আমি এক জায়গায় পড়ে থাকতে চাই, প্রেসিডেন্ট হবার ঝকমারি আর সহ্য হয় না। বাঙ্গালোরে, মাদ্রাজে, সর্বত্র তিনি মহাপুরুষকে এইজাতীয় কথা বলিয়া আসিতেছিলেন।

দেহরক্ষার প্রায় দুইমাস আগেকার ঘটনা। মঠের দোতলার বারান্দায় মহারাজ ও হরিপ্রসন্ন মহারাজ দুইখানি চেয়ারে বসিয়াছিলেন। সাধুদের কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বা বসিয়া। মহারাজ বলিতে লাগিলেন: দেখ, অনেকেই

মনে করে, স্বামিজী যদি আজ থাকতেন আমাদের ঠিকঠিক চালিয়ে নিতে পারতেন, রামকৃষ্ণ মিশনেরও আরো প্রসার হত। স্বামিজীকে কে বুঝেচে, কে বুঝতে পারত? তাঁর বই পড়ে তাঁকে বোঝা, আর তাঁর কাছে থেকে তাঁকে বোঝা এক জিনিস নয়। তাঁর কাছে থাকা, তাঁকে সহ্য করা যে কত কঠিন ছিল তা এরা জানে না। তাঁর বকুনি সহ্য করতে না পেরে আমারই কতবার মনে হয়েচে, মঠ ছেড়ে চলে যাই। একদিন বকুনি খেয়ে দুঃখে অভিমানে দরজা বন্ধ করে কাঁদচি, কিছুক্ষণ পরেই স্বামিজী দরজায় টোকা মারচেন। দরজা খুল্লুম। চোখে জল দেখে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন, রাজা, ঠাকুর তোমাকে কত আদর করতেন, ভালবাসতেন; সেই তোমাকেই আমি বকি, রাগ করে কত কটুকথা বলি, আমি আর তোমাদের কাছে থাকার যোগ্য নই। বলতে বলতে স্বামিজীর চোখে জল ঝরচে। আমি তখন তাঁর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে দিতে বল্লুম, তুমি ভালবাস বলেই বক, বুঝতে পারি না বলে অনেক সময় কান্না পায়। স্বামিজী বলতে লাগলেন: আমি কী করব, আমার শরীরটা চব্বিশ ঘণ্টাই যেন জ্বলচে, মাথার ঠিক থাকে না। আমি বেঁচে থাকলে তোমাদের হয়তো আরো বেশী বৃথা কষ্ট দেব। দেখ রাজা, একটা কাজ করতে পার? ওদেশে রেসিং হর্স ( দৌড়ের ঘোড়া ) যখন অকেজো হয়ে পড়ে তখন কী করে জান? তাকে বন্দুকের গুলিতে মেরে ফেলে। আমি তোমাকে একটা রিভলবার জোগাড় করে দেব, তুমি আমাকে গুলি করে মারতে পারবে? আমাকে মারলে কোন ক্ষতি হবে না, আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে।

ঐরূপ সময়ে একদিন মহারাজ মহাপুরুষের ঘরে আহার করিতেছিলেন, মহাপুরুষ চেয়ারে বসিয়া। খাইতে খাইতে হঠাৎ, কতকটা আত্মস্থভাবেই যেন, বলিয়া উঠিলেন, তারকদা, বেলুড় মঠের মায়া কখনো ত্যাগ করতে পারব না; শরীরটা যদি যায়ও, শূন্যে থেকে বেলুড় মঠকে দেখব।

অন্যদিন বলিয়াছিলেন, একএক বার স্বর্গ থেকে এসে দেখে যাব ছেলেরা সব কী করচে।

লীলাসম্বরণের কাল যতই নিকট হইতেছিল, মহারাজের অন্তর্মুখী ভাবও ততই বাড়িয়া যাইতেছিল। ভুবনেশ্বর মঠে পায়চারি করিতে করিতে তিনি আপন মনে কথা কহিতেন, আর তাহাও একএক সময়ে এমন জোরে যে, তিনি কাহারো সঙ্গে কথা কহিতেছেন বলিয়াই বোধ হইত। ঊর্ধ্বমুখী সমাধি-উন্মুখ মনকে এইভাবে তিনি নীচে নামাইয়া আনিতেন। ঠাকুরের কথায় একদা তিনি বলিয়াছিলেন ঃ সমাধির পর বিড়বিড় করে কী বলতেন, মনে হত যেন কারো সঙ্গে কথা বলচেন !

ছোট একটি ঘটনা, স্থান বেলুড় মঠ। পুরাতন মঠবাড়ীর দক্ষিণদিকের রোয়াকের দক্ষিণপশ্চিম কোণে মহারাজ দাঁড়াইয়া, ভাবাবিষ্ট। তাঁহার ডান হাতে বেড়ার পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার উড়িয়া চাকর কৃষ্ণ, আর বাঁ হাতে রোয়াকের কোল ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া তরুণ যুবক গৌরাঙ্গ। শ্যামবর্ণ কৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া ও গৌরবর্ণ গৌরাঙ্গের দিকে চাহিয়া মহারাজ বলিতে লাগিলেন ঃ 'এ কালুয়া, তোর জাতি গলা, কুল গলা, মানও গলা!' বারবার এই কথাটি বলিতে বলিতে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হইয়া তিনি স্থানত্যাগ করিলেন।

ভুবনেশ্বর মঠ নির্মিত হওয়ার পর হইতে তিনি সেখানেই পড়িয়া থাকিতে চাহিয়াছেন, কাজের ঝঞ্ঝাট হইতে যথাসম্ভব দূরে, আপনভাবে থাকিতে পারিবেন বলিয়া। কিন্তু কাজ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহে নাই, আর যখনই কাজের জরুরী আহ্বান আসিয়াছে সে আহ্বান তিনি প্রত্যাখ্যানও করেন নাই। তাঁহার কাশীতে ও দাক্ষিণাত্যে গমন ( ১৯২১ ) এইরূপেই হইয়াছিল।

সংগৃহীত কতকগুলি পত্রের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া আমরা স্থানে স্থানে মহারাজের জীবনলীলার শেষের দিনগুলির অনুসরণ করিব। এইসকল পত্র সাধারণতঃ তাঁহার এক সেবক লিখিতেন ও একবার চোখ বুলাইয়া তিনি স্বাক্ষর করিতেন।

১৯-১২-২১, ভুবনেশ্বর ঃ "আগামী পরশ্ব শ্রীশ্রীমার তিথিপূজা। এখানেও সামান্য রকমের ভোগ দেওয়ার ইচ্ছা, সেইজন্য একজনকে কটকে আজ বাজার করিবার জন্য পাঠাইয়াছি।"

২২-১২-২১ : "শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং মার সামান্যরকমের ভোগরাগাদি হইয়াছিল। পোলাও, পঙ্গল (ইহা মাদ্রাজী পোলাও), আলুর দম, আলুকপির ডালনা, অপর দুইএক প্রকারের তরকারি, নানাবিধ ভাজা, চাটনি, পায়েস, মিষ্টি ইত্যাদি হইয়াছিল। রাত্রে লুচি, পায়েস সুজির এবং ছানার (একটি ভক্ত দিয়া গিয়াছিল), বেগুনভাজা, ডাল ও এক-প্রকার তরকারি। বাহিরের বড় বেশী ছিল না—৫।৭ জন ভক্ত, তাঁহারা এখানে চেঞ্জে আসিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই ছিলেন। সন্ধ্যার পর সকলে মিলিয়া খুব ভজনাদিও করিয়াছিল।"

২৩-১২-২১ : "দাদা (রামলালদাদা) আজকাল বেশ আনন্দে আছেন—শরীরও তাঁর ভাল আছে। তিনিও আমার সঙ্গে দুইবেলা বেড়াইতে গিয়া থাকেন। কলিকাতায় যাইবার জন্য শরৎ মহারাজ খুব তাড়া দিতেছেন।"

২৮-১২-২১ : "আজ চতুর্দশী ছিল বলিয়া সকলে মন্দিরে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম।"

যাই যাই করিয়াও মহারাজের কলিকাতায় যাওয়া হইয়া উঠিতেছিল না। অবশেষে শরৎ মহারাজ যখন তাঁহাকে লইয়া যাইতে নিজে ভুবনেশ্বর যাইবেন কিনা জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র দিলেন তখনই তিনি যাত্রার দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। ১০ই জানুয়ারী যাত্রার মুখে প্রবল ঝড়বৃষ্টি সুরু হওয়ায় বাধা পড়িল, ১১ই সন্ধ্যার পর ভুবনেশ্বর ছাড়িয়া পরদিন সকালে তিনি বেলুড় মঠে পৌঁছিলেন।

১৯-১-২২ : "আজ একটি বিশেষ কাজের জন্য অল্পক্ষণের জন্য একবার হাইকোর্টে যাইব।"

২৩-১-২২ : "স্বামিজীর উৎসব নির্বিঘ্নে হইয়া গিয়াছে।...প্রায় ৫০০০ লোক বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছে। দিবারাত্রব্যাপী একটা আনন্দস্রোত বহিয়াছিল। রাত্রে ভজনাদিও হইয়াছে। পূজা শেষ হয় রাত্রি প্রায় ৪৷৷০টায়। তাহার পর ১৪ জন ছেলেকে ব্রহ্মচর্য দেওয়া হয়।"

২২-১-২২ : "আজ সকালে...আমি এখানে [ বসু-ভবনে ] আসিয়াছি।... বৈকালে ৪টার সময় ষ্টার থিয়েটারে 'অযোধ্যার বেগম' দেখিতে যাইব স্থির হইয়াছে।"

২৩-১-২২ : "কাল বৈকালে থিয়েটারে গিয়েছিলাম, দাদাও সঙ্গে ছিলেন...। থিয়েটার দেখিয়া তিনি ভারী খুসী, আমাদেরও মন্দ লাগিল না।... অনেক ভক্ত নিত্য আসিয়া থাকেন।"

২৫-১-২২ : "এইমাত্র রামকৃষ্ণপুর হইতে আসিলাম।...সঙ্গে নারায়ণ আয়েঙ্গার প্রভৃতি ছিল।"

শরৎ মহারাজকে স্বামিজীর জন্মোৎসবের দিন মহারাজ বলিয়াছিলেন, একদিন উদ্বোধনে মাদ্রাজী রান্না ভোগ দিতে হবে। শরৎ মহারাজ বলেন, তুমি যেদিন বলবে সেদিনই হবে, তোমায় কিন্তু উপস্থিত থাকতে হবে। ২৯শে জানুয়ারী মহারাজ মায়ের বাড়ীতে শুভাগমন করিলে আনন্দের হাট বসিল। সেবকেরা মাদ্রাজী খাদ্যসমূহ প্রস্তুত করিতে লাগিয়া গেলেন। ভোগ নিবেদনের পর দুই গুরুভ্রাতা একত্র বসিয়া প্রসাদ পাইলেন।

পরদিন মঠে মহারাজের জন্মোৎসব। তাঁর ছোট ঘরখানি পত্রপুষ্প ও মালায় সুশোভিত করা হইয়াছে। ভক্তেরা তাঁহাকে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া ফুলের মালা ও মুকুটে সাজাইয়াছেন, তিনি বালকের মত মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন। শরৎ মহারাজ আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন।

এই আনন্দের দিনে বিবিধ ভোগরাগের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নিজে ফরমাশ দিয়া মহারাজ প্রচুর পরিমাণে রাধাবল্লভী ও লেডিকেনি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। একবার যাইয়া সকলের খাওয়া দাওয়া কেমন হইতেছে দেখিয়াও আসেন। বিশ্রামান্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতে আসিয়া স্ত্রীভক্তেরা কহিলেন, এবার যা আমরা আনন্দ পেয়েচি, কখনো তা পাই নি—খাওয়া দাওয়া ও আপনার দর্শন, সব মিলিয়ে এমন অপূর্ব ভাব আর কখনো পাই নি।[২]

---

২ সেইদিন কোথা হইতে এক মসীবর্ণা ভীষণদর্শনা ভৈরবী আসিয়া মেয়েদের খাবার জায়গায় বসিয়া পড়ে। ভৈরবী রক্তবস্ত্রপরিহিতা, ত্রিশূলধারিণী, এলোকেশী · গলায় ত হার

২-২-২২ : "কাল সন্ধ্যার সময় মঠ হইতে এখানে [ বসু-ভবনে ] আসিয়াছি। ...শ্যামাপূজা বেশ ভালভাবে হইয়া গিয়াছে, নীরদ পূজা করিয়াছিল।"

৬-২-২২ : "কাল নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম।...৩৷৷০টা নাগাদ চলিয়া আসি ও ম্যাডান থিয়েটারে যাই।...দাদা, মহাপুরুষ, কালী মহারাজ, হরিপ্রসন্ন মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি সকলেই কাল নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন।"

২১-২-২২ : আঁটপুর : "আজ আহারান্তে রওনা হইয়া বৈকালে সকলে নিরাপদে এখানে আসিয়াছি।...আমরা প্রায় ২০ জন এখানে আসিয়াছি, সঙ্গে দাদাও আছেন।"

---

বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে রুদ্রাক্ষবলয়, সমস্ত কপাল জুড়িয়া সিন্দূরের ফোঁটা ; বৃহৎ চক্ষু দুইটি যেন ক্রোধে আরক্ত ও দাঁতগুলি কিয়ৎপরিমাণে বহিরুদ্গত। ঈশ্বর ভৈরবীকে স্থানান্তরে বসিতে বলিলে সে সক্রোধে দাঁতমুখ খিঁচাইয়া কহিল, আমি এখান থেকে উঠব না, এখানে বসেই খাব। 'আপনাকে উঠতেই হবে, মেয়েরা ভয় পেয়েচেন, আপনার সঙ্গে বসে এঁরা খাবেন না।' ভৈরবী ত্রিশূলটি নিক্ষেপের ভঙ্গীতে ধরিয়া বলিল, জানিস আমি কে ? আমি তোকে খেয়ে ফেলতে পারি, তোর হাড় মাথা আমি কড়মড় করে চিবিয়ে খাব। যা আমার কাছ থেকে সরে যা। 'আপনাকে উঠতেই হবে, না উঠলে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যাব। আপনার সাধ্য নাই আমার কিছু করতে পারেন।' ভৈরবী তখন সরিয়া বসিতে বসিতে বলিল, তোর হাড়মাস আমি এইরকম করে চিবিয়ে খাব, তোকে আর বাঁচতে হবে না। খাইতে খাইতে কিন্তু ভৈরবীর ভাবের পরিবর্তন ঘটিল। ঈশ্বরের পরিবেশিত অনেকগুলি রাধাবল্লভী ও লেডিকেনি খাইয়া সে তাঁহাকে পুত্রসম্বোধন করিল, আর তিনিও মাতৃসম্বোধন করিয়া দুইএক কথা কহিলেন। 'মহারাজ, আজ ছেলেকে এক ভৈরবী বলেচে, তোর মাথা হাড়গোড় আমি চিবিয়ে খেয়ে ফেলব, তুই মরবি মরবি।' রানুর মুখে এইকথা শুনিয়া মহারাজ বলিলেন : মরবি বল্লেই কি মানুষ মরে, ভগবান যখন মারেন তখন সে মরে। ভৈরবী তো বিধাতাপুরুষ নন যে, যা বলবেন তাই হবে। ( একটু হাসিয়া) হ্যাঁ, ভৈরবীকে ঈশ্বর খাওয়াচ্ছিল দেখছিলুম, ঈশ্বরের সঙ্গে তো খুব ভাব দেখলাম। ও তো মা মা করছিল তাকে। রানু, তোমার ছেলের তো আবার একটি মা হয়ে গেল ! ভাগীদার হয়ে গেল যে তোমার !

২২-২-২২ ঃ "আজ সকালে ১০॥০টার সময় এখানকার স্কুলের ভিত্তিস্থাপন হইয়াছে, ইহার জন্য আমার এখানে আসা।"

২৭-২-২২ ঃ "আজ ২॥০টার ট্রেণে রওনা হইব···মঠে চলিয়া যাইব। কাল ঠাকুরের তিথিপূজা।"

১৮-৩-২২ ঃ "আজ একটু বিশেষ কাজের জন্য হাওড়া কোর্টে একবার গিয়াছিলাম।"

১৯-৩-২২ ঃ "আজকাল গরম পড়াতে দুবেলা ভাত খাইয়া থাকি, সহ্যও হইতেছে।"

শেষের দিনগুলিতে মহারাজের মধ্যে একটা সর্বজনীন প্রেম পরিলক্ষিত হইত। বেলুড় মঠে অবস্থানকালে সকালবেলা যখন বেড়াইতে বাহির হইতেন, সেবককে কিছু ফলমিষ্টি সঙ্গে নিতে বলিতেন। দক্ষিণদিকের ফটক দিয়া বাহির হইয়া কিয়দ্দূর গেলেই মুসলমানপাড়া, তিনি মুসলমান বাচ্চাদের মধ্যে ফলমিষ্টি বিতরণ করিতেন। তারপরে গ্রামের দিকে আরো অগ্রসর হইয়া, পাড়ার লোক কে কেমন আছে খবর লইয়া মঠে ফিরিতেন।

গোকুলদাস দে লিখিয়াছেন ঃ "মহারাজ তাঁহার পরিচিত ও ভাব-রাজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত সামান্যক্ষণ কথা কহিতে পারিতেন এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন লোকদের মধ্যে শভচেষ্টাতেও থাকিতে পারিতেন না।[৩] কিন্তু তাঁহার দেহাবসানের কিছুদিন পূর্ব হইতে দেখিলাম, তাঁহার নিজস্ব ভাব সংরক্ষণ করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই, সকলরকম ব্যক্তিদের সহিতই অবাধে মেলামেশা করিতেছেন!"

---

৩ বিরুদ্ধভাবাপন্ন লোকদের সহিত মহারাজ দেখা করিতেও চাহিতেন না। একদিন বেলা প্রায় ৮টার সময় (১৯১৮) কার্তিক উদ্বোধনের তেতলার ঘরে বসিয়া পড়িতেছিলেন, এমন সময় মহারাজ হন্তদন্ত হইয়া সেই ঘরে ঢুকিলেন ও বলিলেন, তুই চলে যা, আমি এঘরে আছি কেউ এলে বলিস নি। কার্তিক বাহির হইয়া যাইতে তিনি দরজায় ছড়কা দিলেন। কোন সঙ্গতিপন্ন বিষয়ী লোকের তাঁহার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। মিশনের স্বার্থ যেখানে, তিনি বলিতেন, শরতের সঙ্গে দেখা করুক।

## (৪) স্বধামে প্রয়াণ

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই কথাটি মহারাজ মাঝে মাঝে বলিতেন, অথচ জাগতিক খুঁটিনাটি ব্যাপারে মনঃসংযোগ করিতে ও জগতের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় নিয়া আলাপ আলোচনা করিতে তাঁহাকে দেখা যাইত। আপনি ছোট ছোট বিষয়ে এত মন দেন কেন?—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, তোরা যাকে ছোট বলিস তাকে বড় করে ভাবতে শেখাবার জন্যে। সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন—এই উপনিষদ্‌বাক্যটিও তিনি কখন কখন উচ্চারণ করিতেন। জগৎ মিথ্যা ও 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই দুই কথার অর্থসঙ্গতি করিতে না পারিয়া সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয় ও শাস্ত্রকারদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি বর্ষণ করে। পরে দেব-গুরু-প্রসাদে জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে সেই মানুষই বুঝিতে পারে যে, জগতের জগদ্‌রূপটি বা জগদ্‌রূপে প্রতীত হওয়াটাই অসত্য বা অনিত্য, আর উহার প্রকৃত রূপ বা ব্রহ্মরূপটিই সত্য বা নিত্য। গীতাভাষ্যের এক জায়গায় শ্রীশঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন, 'সদাত্মনা সত্যমিদং জগৎ।' জগতের আপাতপ্রতীয়মান রূপটির সঙ্গে যাঁহারা ব্রহ্মরূপটিও দেখিতে পান, যুগপৎ দুইটি রূপই দেখেন, তাঁহারাই ব্রহ্মের জগৎলীলা সন্দর্শন করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্মাণ্ড চিন্ময়। ইহা কবিকল্পনার দর্শন নহে—প্রত্যক্ষ দর্শন, যে দর্শন কালী-মন্দিরে পূজা করিতে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হইয়াছিল—যে দর্শনের উত্তরাধিকারী করিয়া তিনি তাঁহার মানসপুত্রকে ইহলোকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, আমাদের মত অধম অধিকারীকেও ব্রহ্মলোকে উন্নীত করিবেন বলিয়া।

মহারাজ বলিয়াছিলেন: কেউ কেউ নিত্য আর লীলা এই দুটোই দেখেন। ...রাসলীলা যখন হচ্ছিল তখন এক সখী আর এক সখীকে বলেছিল, সখি বেদান্তসিদ্ধান্তো নৃত্যতি। বেদান্তসিদ্ধান্ত কিনা সেই পরব্রহ্ম অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। এখানে নিত্য আর লীলা এক।[১]

এক প্রিয়শিষ্যাকে মহারাজ লিখিয়াছিলেন: "এমন করিয়া মন ঠিক কর

১ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

যাহাতে মনের অগোচর কিছু না থাকে, অর্থাৎ সেই অন্তর্যামী মহান পুরুষের চিন্তা করিয়া মন সম্পূর্ণভাবে তাঁহাতে লয় করিয়া দাও। তাহা হইলে মন মহাশক্তিতে পূর্ণ হইয়া যাইবে। তখন মনের অগোচর আর কিছুই থাকিবে না। সেই মহান পুরুষের দুইটি ভাব লইয়া জগৎ বিকশিত—নিত্য ও লীলা। তিনি কখনও নিত্যেতে অবস্থিতি করিতেছেন এবং কখনও লীলায় পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্ভোগ করিতে থাকেন। একথাটি পড়, শোন, ভাব।"

মহারাজ কলিকাতায় থাকিলে শরৎ মহারাজ প্রায় প্রতিদিনই বসু-ভবনে যাইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতেন। সকালবেলা বেড়াইতে বাহির হইয়া মহারাজও কোন কোন দিন উদ্বোধনে আসিয়া পড়িতেন। মঠ হইতে চলিয়া আসিবার পরদিন (২৩শে মার্চ) তিনি উদ্বোধনে আসেন ও শরৎ মহারাজ তাঁহাকে উপরতলায় নিজের ঘরে লইয়া যান।

ইহার পরদিন, ২৪শে মার্চ শুক্রবার, মহারাজ বিসূচিকারোগে আক্রান্ত হন। সকালবেলা যথারীতি বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন, কিয়দ্দূর গিয়াই শরীরে অস্বস্তি বোধ করায় ফিরিয়া আসেন। সেবককে বলিয়াছিলেন, ডাক্তার যাই বলুক, এ রোগকে বিশ্বাস নাই; শিবনাম কর, শিবনাম কর। ইহাতে অনুমিত হয়, যাহা ঘটিতে যাইতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন রোগের সূচনাতেই। তথাপি একএক সময়ে তাঁহার কথাবার্তায় বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছাই প্রকাশ পাইয়াছে। ছেলেমানুষের মত ডাক্তার নীলরতন সরকারকে বলিয়াছিলেন, আমায় ভাল করে দিন, আমি ভাল হব। কখনো বলিতেন, আমাকে ভুবনেশ্বরে নিয়ে চল, সেখানকার কুয়োর জল খেলে ভাল হয়ে যাব। দেহরক্ষার ঠিক চারিদিন পূর্বে বলেন, কলকাতার বদ্ধ বাতাস ভাল লাগচে না, ভুবনেশ্বর চল, সেখানে মুক্ত বাতাস। আপনি এখনো বড় দুর্বল—সেবকের এই কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন, আর তিনচার দিন পরে

২ ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

বেশ যেতে পারব। দেহরক্ষার দুইদিন আগে সকালবেলা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট গুরুভ্রাতাকে, কতকটা যেন অনুযোগের সুরে বলিয়াছিলেন, শরৎ, তুমি থাকতে আমাকে যেতে হল? শরৎ মহারাজ হতবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কেন যে মহারাজ এই কথাটি বলিয়াছিলেন তাহা অনেক দিন পরেও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। অসুখের মধ্যেও তাঁহার দেব-প্রকৃতির বিশেষত্বগুলি পূর্ণভাবে প্রকট ছিল দেখা যায়। ১লা এপ্রিল তাঁহাকে অন্নপথ্য দেওয়া হয়। পরদিন তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সেবকেরা যখন তাঁহাকে বড় হলঘরে বহিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাঁহার রোগজীর্ণ শরীরও তাঁহাদের ভারী ঠেকিতেছে বুঝিতে পারিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, ওরে, মরা হাতী লাখ টাকা। দুইদিন ভালয় ভালয় কাটিয়া যাইবার পর হঠাৎ বহুমূত্রের উপসর্গ—বহুমূত্র পূর্ব হইতেই ছিল—অত্যন্ত বাড়িয়া যায় ও ডাক্তারেরা তাঁহার জীবনাশা পরিত্যাগ করেন। এই অবস্থায় শরৎ মহারাজ কবিরাজী চিকিৎসার প্রস্তাব করিয়াছেন শুনিয়া তিনি সকৌতুকে বলিয়া উঠেন, হকিমীটা বাকী থাকে কেন? কবিরাজী চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে ও বিজ্ঞ কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি চিকিৎসা করিতেছেন। দেহরক্ষার পূর্বদিন রবিবার বেলা প্রায় এগারটায় কবিরাজ দেখিতে আসেন ও নাড়ী টিপিয়া দেখিয়া গালে হাত দিয়া বসেন। এইদিন সকাল পর্যন্ত মহারাজ কথা বলিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে চক্ষু চাহিয়া স্থিরনিশ্চলভাবে পড়িয়া থাকেন। সকলেই ভাবিয়াছিল তাঁহার কথার ঘর বন্ধ হইয়াছে। কবিরাজের বিমর্ষভাব লক্ষ্য করিয়া মহারাজ তাঁহার স্বাভাবিক ভঙ্গীতে হাসিমুখে কটাক্ষপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, কেমন দেখছেন? আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেই উত্তর দেন, এখন আর কিছু করবার নাই, এখন ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ। ডাক্তার বিপিনবিহারী ঘোষকে সেই দিনই সকালে বলিয়াছিলেন, ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা। পূর্বে একদিন কবিরাজ মহাশয়কেও বলিয়াছিলেন, শিবই সত্য, ঔষধ মিথ্যা।

৮ই এপ্রিল শনিবার তাঁহার পিপাসা ও গাত্রদাহ অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, সমস্ত দিনমান ও রাত এগারটা পর্যন্ত তিনি লেমনেড বরফ পান করিয়া ছটফট

করিয়া কাটান। ঐদিন দিবা দ্বিপ্রহরে বলরামবাবুর বাড়ীর মেয়েদিগকে কাঁদিতে দেখিয়া বলেন, তোমাদের ভয় কী, আমি আশীর্বাদ করচি।[৩] সন্ধ্যার পর ডাক্তার দুর্গাপদ ঘোষ তাঁহার দেহকষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেন, সহনং সর্বদুঃখানাম্ অপ্রতিকারপূর্বকম্—আমার অবস্থা এখন এইরূপ, তোমরা এটি ধারণা কর।

মধ্যরাত্রে হঠাৎ তিনি তাঁহার সন্ন্যাসী শিষ্যগণকে তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া বসিতে বলেন, অতিকোমল স্নিগ্ধ কণ্ঠে আহ্বান করিয়া—'আমার বাবারা, তোরা কোথায়? আয় আয়, কাছে আয়।' আর তাঁহারা কাছে আসিয়া বসিতেই আবেগজড়িত কণ্ঠে 'ভয় কী বাবা তোমাদের?' ইত্যাদি কথা বলিয়া সকলকে অভয় ও ভরসার বাণী শুনাইতে থাকেন। তারপর শরৎ মহারাজকে নাম ধরিয়া আহ্বান করেন। শরৎ মহারাজ আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমার বিবেক—বিবেক—বিবেকানন্দদাদা।' বাবুরামকে চিনি, শ্রীরামকৃষ্ণচরণ জানি।'[৪]

শরৎ মহারাজ প্রায় সমস্ত দিনই মহারাজের কাছে থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্বে উদ্বোধনে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। পূর্বদিন সকাল হইতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত প্রায় সর্বক্ষণ তিনি মহারাজের কাছেই বসিয়াছিলেন। গভীর রাত্রে মহারাজ আহ্বান করিয়াছেন জানিয়া তিনি সীতাপতি (রাঘবানন্দ) ও ঈশ্বরকে সঙ্গে

---

৩ এই সময়ে তিনি আশেপাশে কাহাকেও যেন খুঁজিতে থাকেন ও বলেন, রামের মাকে কেন দেখচি না? রামের মা (বলরাম বসুর স্ত্রী) পূর্বেই কাশীপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন (জুলাই, ১৯১৯)। কাশীতে থাকা কালে মাঝে মাঝে তিনি বৃন্দাবনে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু যাওয়ার সকল বন্দোবস্ত হইয়া গেলে আর যাইতে চাহিতেন না। স্বামী জগদানন্দ একদা লেখককে বলিয়াছিলেন: বলরামবাবু ঠাকুরের কাছে সন্ন্যাস চাহিয়াছিলেন; তাঁহার স্ত্রীকে ঠাকুর নির্বাণমুক্তি দিলেন, অন্তরঙ্গ সেবকের মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন বলিয়া।

৪ 'নরেন—বিবেকানন্দ—বিবেকা—বিবেক ব্রহ্ম।' 'বাবুরামকে দেখতে পাচ্চি।'—এই কথাগুলি এক মুদ্রিত বর্ণনায় আছে।

নিয়া বসু-ভবনে আসিলেন। ঐ সেবকদ্বয়ের জ্বর হওয়ায় উদ্বোধনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। শরৎ মহারাজকে দেখিয়াই মহারাজ বলিয়া উঠিলেন, 'ভাই শরৎ, এসেচিস—ওরে, আমার যে ব্রহ্মবস্তু গোল হয়ে গেল! তুই ব্রহ্মজ্ঞানী, আমায় একটু ব্রহ্মজ্ঞান দে না, সব গুলিয়ে যাচ্চে যে আমার!' শরৎ মহারাজ কহিলেন, 'ভাই, তোমাকে ঠাকুর যা কিছু দেবার সব নিজেই দিয়ে গেছেন, তোমার কি আর কিছু বাকি আছে?' মহারাজ বলিলেন, 'আমি প্রায় গিইচি, কেবল একটু পাচ্চি নি, ব্রহ্মতিমির!'

তিনি লেমনেড খাইতে চাহিলেন ও মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, একি হল, ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলচি, আবার লেমনেড লেমনেডও করচি! তারপর বলিতে লাগিলেন, 'ফাদার ইন হেভেন—দেখ, এও খুব সুন্দর, এও ভগবানের এক ভাব।' শরৎ মহারাজ তাঁহাকে লেমনেড খাইয়া ঘুমাইতে বলিলে কহিলেন, 'মন যে ঐ ব্রহ্মলোকে—নাবতে চায় না—দে লেমনেড ব্রহ্মে ঢেলে!' এক ঢোক লেমনেড খাইলেন ও আবার বলিতে লাগিলেন, 'আহাহা, ব্রহ্মবস্তু, ব্রহ্ম সমুদ্দুর! বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে চলেচি। ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ পরমাত্মনে নমঃ।' সচ্চিদানন্দসাগরের শান্তশীতল স্পর্শ সমবেত সন্ন্যাসী-মণ্ডলীর হৃদয়কেও স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল যেন, সকলের অন্তরে তখন এমনই একটা প্রশান্তির অনুভূতি।

অতঃপর এই অন্তর্মুখ অবস্থা হইতে ব্যুত্থিত হইয়া, মহারাজ তাঁহার উপস্থিত শিষ্যসেবকগণের কাহাকেও কাহাকেও অভয় দিয়া নানাকথা বলিয়াছিলেন। ঈশ্বর এই সময়ে তাঁহার কাছে বসিয়া তাঁহার একখানা হাত নিজের হাতের উপর রাখিয়া মৃদুভাবে তাহাতে হাত বুলাইতেছিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কেবে? শরৎ মহারাজ কহিলেন, ও ঈশ্বর। 'ঈশ্বর —ঈশ্বরা? তোর ভয় কী, তুই আমার সেবা করেচিস। (কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া) আমাদের কষ্টের কেষ্ট নয় রে, আমাদের কেষ্ট আঁলাদা। (আবার খানিক চুপ থাকিয়া, ধীরে সুমিষ্টসুরে—যে প্রণামমন্ত্র তিনি নিজেই শিখাইয়া-ছিলেন—) যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি, পরং প্রধানং পুরুষং তথান্যে।

বিশ্বোদ্‌গতেঃ কারণমীশ্বরম্বা তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশনায় ॥ (কয়েকবার ঈশ্বরা ঈশ্বরা বলিয়া আস্তে অতি মিষ্টকণ্ঠে) আমাকে একটু ভালবাসিস।'[৫]

আবার অবস্থার পরিবর্তন হইল। আধো আধো ভাষায় তিনি বলিতে লাগিলেন, 'দেখ্ দেখ্ কৃষ্ণ এসেচে। ওরে, আমায় মল পরিয়ে দে, আমি তার হাত ধরে নাচব—ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ করে নাচব। আমি যে ব্রজের রাখাল।'

'আমার কেষ্ট কষ্টের কেষ্ট নয় রে, গোপের কেষ্ট।' 'তমসঃ পরস্তাৎ।'[*]

'কমলে কৃষ্ণ। আহা, তোদের চোখ নেই, দেখতে পাচ্চিস নে। পীত-বসনে কৃষ্ণ।'

'একটি ছোট ছেলে তার কচি হাত আমার পিঠে বুলুচ্চে, আর বলচে, আয় আয়। তোরা সব্, আমি যাই। ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ।'

'জীবনের লেখা, এবারের লীলা শেষ হল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ।'

---

৫ পরদিন সকালেও ব্যক্তিগতভাবে ও সাধারণভাবে অনেক আশীর্বাণী তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল। উহাদের কয়েকটি এইরূপ: অমূল্য মহারাজের হাতে অতি ধীরে নিজের হাত বুলাইতে বুলাইতে) 'অমি, তোকে অনেক ঘুরিয়েচি, অনেক কষ্ট দিয়েচি। তোর ভালর জন্যেই করেচি, কিন্তু তার জন্যে আমিও কম কষ্ট পাই নি বাবা। (আস্তে আস্তে) অমি—অমি—আমার অমূল্যে বাবা।' 'শর্বা, তুই জীবনে মরণে আমার।' নীরদ (অম্বিকানন্দ), তোর ভয় কী, তোর তো হয়েই আছে, আমি তো আছি।' (নির্বাণানন্দের প্রতি) 'তুমি আমার অনেক সেবা করেচ, আমার আশীর্বাদে তুমি নির্বাণ লাভ করবে।' 'তোরা ভগবানকে ভুলিস না।' 'রামকৃষ্ণঃ রামকৃষ্ণঃ রামকৃষ্ণঃ—তোরা ভগবানের নাম কর্, তোরা সব তাঁর।'

কোনও ভক্ত (ননীলাল ঘোষ?) লিখিয়াছেন: দেহ রাখবার কিছু পূর্বে ছেলেরা সব ঘিরে বসে কাঁদচে। তিনিও সাধারণ মানুষের মত কেঁদে বলে উঠলেন, 'তোরা সব কাঁদচিস কেন রে? তোদের ভাবনা কী, ভয় কী? তোদের ঠাকুর রইলেন।' আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলুম না।

* 'একি আমার কষ্টের কেষ্ট রে, এ রামকেষ্ট—পূর্ণচন্দ্র।' 'ঠাকুরের পা দুখানি কী সুন্দর! দেখি দেখি।'—এই কথাগুলিও এক মুদ্রিত বর্ণনায় পাওয়া যায়।

উদ্বোধনে আসিয়া শরৎ মহারাজ কহিলেন, মহারাজকে আর ধরে রাখা যাবে না, কমলে-কৃষ্ণ দর্শনের কথা আজ ওঁরই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—যেকথা ওঁকে বলতে ঠাকুর আমাদের মানা করেছিলেন।

কালে-বিস্মৃত বৃন্দাবনের প্রেমসম্পুট 'উঘাড়িয়া' দেখাইয়া ও সেই প্রেমে সকলকে কাঁদাইয়া, ১০ই এপ্রিল, ২৭শে চৈত্র, সোমবার রাত্রি ৮টা ৪৫ মিনিট সময়ে ব্রজের রাখাল ঘরে ফিরিলেন—একবারের খেলা শেষ করিয়া—আবার নূতন খেলা খেলিতে আসিবেন বলিয়া। রজনী তখন হাস্যময়ী হইয়াছে, শুক্লা চতুর্দশীর চন্দ্র ধরণীর বুকে অজস্র কিরণসুধা ঢালিতেছে। ওঁ শম্।

# পরিশিষ্ট

## শ্রীশ্রীমহারাজের স্মৃতি

[ কন্যাকুমারীর পথে আলওয়া—হরিপাদ—কোল্লম্—অনন্তশয়ন ]

শ্রীমহারাজ কন্যাকুমারী দর্শনার্থ কেরলপ্রদেশে আসেন চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে। আলওয়া শহরে তিনি প্রথম পদার্পণ করেন। স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিশেষ আনন্দিত হন ও বলেন, কাল অপরাহ্নে আমি কিছু বলিব।...ভক্তসভায় ইংরাজীতে একঘণ্টাকাল অনর্গল বলিলেন (২৭শে নভেম্বর, ১৯১৬)। তীর্থযাত্রার প্রয়োজন, তীর্থমাহাত্ম্য, গুরুর আবশ্যকতা, ধ্যান.সমাধি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক উপদেশ তিনি সরল অথচ শক্তিপূর্ণ ভাষায় প্রদান করিলেন।[১] সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিলেন।...পরে তিনি কোট্টয়ম্ প্রভৃতি শহর দেখিয়া হরিপাদে আসিলেন। কেরলপ্রদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম সর্বপ্রথম সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই আশ্রমে তিনি দুইএক দিন বিশ্রাম করিলেন। কয়েকজনকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন, তন্মধ্যে একজন পুরুষোত্তমানন্দ।

মহারাজকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হরিপাদে ব্রাহ্মণগণ পূর্ণকুম্ভ লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ ও সরল স্বভাব মহারাজের ভাল লাগে। তাঁহার জন্য পালকী আনয়ন করিলে তিনি রহস্য করিয়া বলেন, আমার কি বিবাহ? আমি বরের ন্যায় পালকীতে যাইব না। তিনি মোটরগাড়ীতে গেলেন। এক অপরাহ্নে তিনি আশ্রমের পশ্চিমভাগে বসিয়া ছিলেন, এমন সময় কয়েকজন হরিজন আশ্রমের পূর্বভাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি উঠিয়া স্বয়ং তাহাদের নিকট গিয়া বসিলেন এবং শিষ্যদের দেওয়া কাপড়গুলি তাহাদিগকে দিতে আদেশ করিলেন। তাহারা কৃতার্থ হইল। হরিপাদে আমার বৃদ্ধ পিতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী মহারাজের দর্শন লাভ করেন। পিতা প্রণাম করিলে মহারাজ

---

১ আলওয়া শহরে প্রদত্ত ভাষণের কিয়দংশ :

দ্বৈতভাব থেকে সাধন আরম্ভ করাই প্রশস্ত। এই পথে কিছুদূর অগ্রসর হলে তোমরা আপনা আপনি সহজেই অদ্বৈতে পৌঁছুবে। ঈশ্বরকে প্রথমে বাহিরে দেখাই ঠিক; পরে তোমাদের অন্তরেও তাঁকে দেখতে পাবে। আনন্দের অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত ধ্যানের অভ্যাস ছাড়বে না। সেই অবস্থা লাভ না করা পর্যন্ত দ্বৈতভাবই অবলম্বন করতে হবে। সমাধি-অবস্থায় কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই দেখতে পাবে। তখন মন ঈশ্বরময় হয়ে যাবে। সমাধির স্বরূপ বর্ণনা করতে পারা যায় না।

বলিলেন, আপনি বৃদ্ধ, শুধু নামজপ করিবেন ; আপনার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। ভগিনী প্রণাম করিলে তাঁহাকে প্রসাদ দিতে বলিলেন।

হরিপাদ হইতে মহারাজ কোল্লম্ শহরে যান। সেখানে যাঁহারা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন একজন নাস্তিক। ঐ ভদ্রলোক প্রণাম করিবামাত্র মহারাজ অতিশয় জোরের সহিত তাঁহাকে বলিলেন, ঈশ্বরকে স্মরণ করিও, ঈশ্বরকে স্মরণ করিও। তাঁহার বন্ধুরা ইহাতে বিস্মিত হন।

কোল্লম্ হইতে মহারাজ মোটরগাড়ীতে অনন্তশয়নে শুভাগমন করেন। ত্রিবান্দ্রমের নামান্তর অনন্তশয়ন ; স্থানীয় লোকেরা দুই নামই ব্যবহার করিয়া থাকে। এখানকার য়ুনিভার্সিটি কলেজের দক্ষিণপশ্চিম দিকের এক দ্বিতলবাটী তাঁহার বাসের জন্য ঠিক করা হয়। দর্শনার্থীদের মধ্যে আমিও ছিলাম। মহারাজের মুখ দেখিয়া মনে হইল, ইহা যেন নির্মল মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায় প্রশান্ত, গম্ভীর, নির্বিকার ও ভাবময়। এইরূপ আকৃতি আমি এই পর্যন্ত আর দেখি নাই।...আমি হরিপাদের অধিবাসী শুনিয়া রহস্য করিয়া বলিলেন, হরিপাদের লোক—ভক্তলোক! তুলসী মহারাজ বলিলেন, এরা আপনাকে এক মানপত্র দিতে চায়। মহারাজ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, আমি বৃদ্ধ হয়েচি, ইউরোপীয় ফ্যাসান আর ভাল লাগে না। 'এদের বড়ই আগ্রহ আপনি সেই পত্রের উত্তর দেন।' মহারাজ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, তুমি তো জান যে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই নাই, ঠাকুরের কৃপাই আমার একমাত্র অবলম্বন, একমাত্র সম্বল।...সেদিন অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা থাকায় সকল হিন্দুগৃহের দ্বারদেশে অসংখ্য দীপ জ্বালা হইয়াছিল দেখিয়া মহারাজ খুবই আনন্দিত হন।

'কাল আশ্রমের ভিত্তিস্থাপনের জন্য কী কী জিনিসের দরকার হইবে?' আমার এই কথা তুলসী মহারাজের মুখে শুনিয়া মহারাজ প্রসন্নগম্ভীর স্বরে বলিলেন : গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র লইয়া ঠাকুরের ধ্যানপূর্বক তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি কৃপা করিয়া সেইস্থানে লোক-কল্যাণের জন্য অধিষ্ঠান করিবেনই করিবেন। বেলুড় মঠে স্বামিজী কী করিয়াছিলেন তাহা তো তোমার জানা আছে, আর কোন জিনিসের দরকার নাই।

পরদিন রবিবার সকাল হইতেই অনন্তশয়ন শহরের অনেক ভক্ত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি আশ্রমে আসিতে লাগিলেন। মহারাজ গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র লইয়া কিছুক্ষণ মুদ্রিতনেত্রে ধ্যান করিয়া ঠাকুরের পূজা করিলেন। তাঁহার তৎকালীন মুখভাব অবর্ণনীয়। এত অভাবনীয় দিব্যকান্তি ও দীপ্তি তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইয়াছিল যে উহা দেখিয়া সকলে অভিভূত হইলেন।...দর্শকগণের মনে উচ্চভাবের উদয় হইল।

মানপত্র প্রদানের সময় কেবলমাত্র মহারাজ এক কেদারায় বসিলেন, আর সকলেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। মানপত্র যখন পঠিত হইতেছিল তখন মহারাজের মুখ একেবারে

নির্বিকার। নির্মলানন্দজী ইংরাজীতে শুধু বলিলেন, শ্রীশ্রীমহারাজ আপনাদিগকে তাঁহার আশীর্বাদ জানাইবার জন্য আমাকে আদেশ করিয়াছেন।...

আশ্রমের জন্য যিনি জমিদান করেন সেই অরুণাচলম্ পিল্লে পঙ্গু বলিয়া দ্বিতলে উঠিতে অপারগ। মহারাজ নীচে আসিয়া মধুরবাক্য ও স্নেহদৃষ্টিতে আশীর্বাদ করিয়া প্রসাদ দিতে বলেন।...এই ভদ্রলোক বঙ্গদেশে টেলিগ্রাফ মাষ্টারের কাজ করিতেন, তখন হইতেই ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বঙ্গমহিলাদের ভক্তি-বিশ্বাস ও ধর্মানুরাগ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন।...ইহা উল্লেখযোগ্য যে, একজিকিউটিভ ইনজিনীয়ার হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ই আশ্রমের পরিকল্পনাপ্রস্তুতি এবং ইহার সাফল্যের জন্য অনেক আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন।... তাঁহাকে দেখিলেই মহারাজের মুখ প্রফুল্ল হইত, তাঁহার সঙ্গে তিনি অনেক কথা কহিতেন। এই বিদ্বান ও ভক্তিমান ব্যক্তি আশ্রমনির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই অকালে দেহত্যাগ করেন।...

মহারাজের সঙ্গে কন্যা কুমারী যাইতে পারিলাম না। সেখানে তাঁহার অবস্থানের কথা বন্ধুদের মুখে শুনিয়াছিলাম।...প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় তিনি ভক্তগণ সহ মন্দিরে যাইতেন। মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন, তাঁহার মুখমণ্ডল অত্যুজ্জ্বল ও প্রফুল্ল দেখাইত। 'মা ব্রহ্মময়ী' বলিয়া অতিমধুরস্বরে জগদম্বাকে ডাকিতেন, কখনও কখনও সঙ্গী সাধুদিগকে মায়ের গান গাহিতে বলিতেন। একদিন অনেক কুমারী মেয়েকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষপূর্বক আহার করাইলেন, প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র দিয়া প্রণাম করিলেন—এক অপূর্ব দৃশ্য! মন্দিরে যাইবার সময় দরিদ্রদিগকে পয়সা দিতে সেবকগণকে আদেশ করিতেন।...

মহারাজের পুণ্যস্মৃতি লইয়া আমি তাঁহার দর্শনের আশায় কাল কাটাইতেছিলাম। এত স্বল্পভাষী কোন মহাপুরুষকে আমি কখনও দেখি নাই।...বালকদিগকে দেখিলে মহারাজের বিশেষ আনন্দ হইত। তাহাদের সহিত তাহাদেরই একজন হইয়া তিনি হাস্য কৌতুক খেলা করিতেন, লড়াই করিতেন।...

৪ঠা পৌষ বৈকালে মহারাজ কোল্লম্ প্রত্যাগমন করেন।...কোল্লম্ শহরে দশদিন ছিলেন। একদিন বিকালে তুলসী মহারাজের আদেশে আমি মহারাজের ঘরে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি হস্ত সঞ্চালন করিয়া তাঁহার সামনে বসিতে আমাকে বলিলেন। অদূরে বসিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল দেখিতে চেষ্টা করিলাম। তাঁহার মুখমণ্ডল তখন এক অপূর্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল—মধ্যাহ্ন তপনের ন্যায় প্রখর তেজঃপুঞ্জ বিকিরণ করিতেছিল। কিছুক্ষণ দেখিবার চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পারিলাম না।...অনন্যোপায় হইয়া উঠিয়া তাঁহার চরণে আবার প্রণত হইলাম। তিনি মাথা নাড়িলেন।

প্রতিদিন বিকালে ভ্রমণ-করা তাঁহার অভ্যাস ছিল। সেই সময় নির্মলানন্দজী সম্মুখের বারান্দায় জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যস্ত থাকিতেন, মহারাজ অন্যপথে বাহিরে যাইতেন।...এক বিকালে মহারাজ হঠাৎ সেইস্থানে উপস্থিত হইলে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মহারাজ কেদারায় বসিয়া সকলকে বসিতে বলিলেন। একব্যক্তি মহারাজের উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে নির্মলানন্দজী উত্তেজিতভাবে বলিতে লাগিলেন : নূতন বিষয়ের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার আগ্রহই তোমার কথায় প্রকাশ পাইতেছে। এক নূতন লোক আসিয়াছেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর কেমন, ইহা জানিতেই তুমি এই প্রকার বলিতেছ। কিন্তু তোমার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য মহারাজ এখানে আসেন নাই। তিনি আমাদের মহামহিমান্বিত মহর্ষিগণের ন্যায় এক মহাপুরুষ।...তোমাদের জন্য ইংরাজী ভাবের সহিত পরিচিত আমরাই যথেষ্ট। আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে যথার্থ জিজ্ঞাসু এবং মহারাজের কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতে কৃতসংকল্প যাহারা তাহারা দাঁড়াও, মহারাজের নিকট আমি তোমাদিগকে পরিচয় করাইয়া দিব। কে আছ? উঠ। কাহারও উঠিতে সাহস হইল না। তখন অতিতীব্রস্বরে নির্মলানন্দজী বলিলেন, এই কি তোমাদের আন্তরিকতা? ছি, ছি! আমার কথা যে সত্য তাহা এখন বুঝিয়াছ কি?

এইরূপ কথাবার্তার সময় মহারাজ একেবারে নির্বিকারই ছিলেন, যেন আর কাহারও সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

একদিন এক ভদ্রলোক আসিয়া অনেক তর্কবিতর্ক করিয়া নাস্তিক্যবাদ স্থাপন করিতে চেষ্টা করিলেন। মহারাজ হঠাৎ সেইস্থানে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, ঈশ্বর আছেনই আছেন, আর তর্ক করিও না। তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি শান্ত হইলেন এবং মহারাজকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

এখান হইতে মহারাজ স্পেশ্যাল মোটরবোটে এর্নাকুলম্ যান।...ত্রিকুন্নপ্পুলৈ নামক স্থানে পৌঁছিয়া আমি চলিয়া যাইব, আমাকে বাড়ী যাইতে হইবে। আমার বাড়ী হরিপাদে শুনিয়া মহারাজ বলিলেন, তোমাকে দেখিয়া আমারও হরিপাদ যাইবার ইচ্ছা হইতেছে; আমাকে সর্বদা পত্র দিও। ইহাই তাঁহার শেষকথা।

—পি শেষাদ্রি (এম্-এল)

# মহারাজের শিষ্যস্নেহ

## ভুবনেশ্বর মঠ ( জানুয়ারী, ১৯২০ )

সেবার নীরোদ, দ্বিজেন, অমিয়, সুরেনবাবু, হরিপদ প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য নিতে মহারাজের কাছে আসে। আমি বিবাহিত, যেদিন ওদের ব্রহ্মচর্য হয় সেদিন আমার মানসিক অবস্থা বুঝে তিনি বল্লেন, তোর সমস্ত ভার আমি নিলুম, আর তোর কী ভাবনা? কিন্তু দুর্বল মন কিছুতেই শান্ত হয় না, কত প্রশ্ন করতে লাগলুম। তিনি একটুও অসন্তুষ্ট না হয়ে সেই এক কথাই আবার বল্লেন।

পরদিন প্রত্যুষে তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে বহুদূর গেলুম। পথে কত প্রসঙ্গ, কত কথা। একটা কুণ্ড থেকে জল নিয়ে এসে তাঁর হাতে দিলুম হাত ধুবেন বলে। কুণ্ডে নাববার সময় ত্রস্ত হয়ে কত সাবধান করলেন, যাতে না পড়ে যাই।

প্রায়ই বলতেন, এখানে কিছুই খাবার নেই, কীই বা খাবি, বাবা, কিছুই খাওয়াতে পারলুম না। আরো কত কী। সেবার একেবারে কোলে টেনে নিয়েছিলেন। আমারও তাঁর কাছে কোন কথা বলতে একটুও সঙ্কোচ হত না। বিদায়ের দিন কত আশীর্বাদ করলেন!

## মাদ্রাজ মঠ ( অক্টোবর, ১৯২১ )

শ্রীযুত রামলালদাদা, আমি ও বঙ্কিম ঘোড়ই কলকাতা থেকে ৺দুর্গা-প্রতিমা নিয়ে মাদ্রাজ যাই। আমরা যেদিন মাদ্রাজ পৌঁছুলুম তার পরদিন মহারাজ বাঙ্গালোর থেকে মাদ্রাজ আসেন ( ৫ই অক্টোবর )। আমি, শ্রীযুত রামু আর শর্বানন্দস্বামী তাঁকে আনতে ষ্টেশনে যাই। আমাকে দেখে হেসে বল্লেন, এসেচিস বেশ—ভাল আছিস তো?

একদিন বাঙ্গালোরের কথা পেড়ে বল্লেন: ওরে, তোর যাবার ইচ্ছা নেই? যা না একবার বাঙ্গালোরটা দেখে আয়। এতদূর এসে বাঙ্গালোর দেখে যাবি নি? আমরা এতদিন সেখানে থেকে এলুম, তোরা একবার দেখে আয়। যা ঘুরে আয়। সৃজ্জি, পরেশকে কুড়িটা টাকা দে তো।

ললিত চাটুজ্যের মৃত্যুসংবাদ এসেচে। মহারাজ বেশ শোক অনুভব করেচেন, সেদিন সন্ধ্যায় সকলকে তাঁর কথা অনেক বল্লেন, আর কত পুরানো কথা।

যেদিন তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে কলকাতা যাত্রা করি আমাকে বল্লেন, ওরে শর্বানন্দ বলছিস তুই প্রতিমা নিয়ে এসেচিস, তোকে যাওয়ার খরচটা দেবে।

বেলুড় মঠ

স্বামিজীর জন্মোৎসবের পরদিন প্রাতে মহারাজের ঘরে গেলুম প্রণাম করতে। দেখেই বল্লেন, ওরে, তোর কথা ভাবছিলুম, কাল কোথায় ছিলি? আমি বল্লুম, আমি তো একবার এসে আপনাকে প্রণাম করে গেছি! 'আরে তুইও যেমন, অত লোকের ভিড়ে কখন এসে প্রণাম করে গেছ, আমি কি মনে করে রেখেচি?'

দোলের দিন বৈকালে মঠে গেছি। মহারাজ দুইএকটি ভক্তের সঙ্গে কথা বলতে বলতে মঠের জমিতে বেড়াচ্ছিলেন, খানিক পরে মঠবাড়ীর সামনের খোলা জায়গায় এসে দাঁড়ালেন, সঙ্গে রামলালদাদা। গঙ্গার ধারে বসবার ইচ্ছে প্রকাশ করায় একখানা বেঞ্চ এনে দিলুম। বসেই বল্লেন, আজ সমস্ত দিন বকে বকে গলা জ্বলচে; আর না, এরা এত বকায়! সন্ধ্যা হয়ে এল। মহারাজ একটু গঙ্গাজল হাতে নিয়ে, গঙ্গামুখী হয়ে হাত জোড় করে বারবার প্রণাম করতে লাগলেন।

খানিক পরে তিনি উপরে গেলেন। আমরাও তাঁর পিছু পিছু উপরের বারান্দায় গিয়ে উপস্থিত হলুম। তিনি সেবককে বল্লেন, ওরে, ঢাকা থেকে অমৃতি এসেচে, হরিপ্রসন্নকে দে। বিজ্ঞানানন্দস্বামীকে বল্লেন, কিহে, কখানা খাবে?—কত খেতে পাব? তিনি উত্তর দিল্লেন দিন না যত পারেন। তাঁকে আর রামলালদাদাকে দেওয়া হল, আমাদেরও দেওয়া হল। মহারাজ বলেছিলেন, পরেশ-ওদের দে।

## বেলুড় মঠে শেষ দর্শন

বেলা প্রায় চারটার সময় মঠে পৌঁছে দেখি মহারাজ নীচের বারান্দায় সিঁড়ির ধারে একটি বেঞ্চে বসে আছেন গঙ্গামুখী হয়ে। বেশ গরম পড়েচে। ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেই সাদর সম্ভাষণ করে আমার সমস্ত অঙ্গে তাঁর দুই পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিলেন। দেহমন আনন্দে ভরে গেল। তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেই বেঞ্চে বসতে বল্লেন।

কিছুক্ষণ পরে বারান্দা ও প্রাঙ্গণ ঠাণ্ডা জলে ধুইয়ে দেওয়া হল। সেই সময় আমি উঠানে নেমে আবার বারান্দার সিঁড়িতে উঠচি দেখে বল্লেন, জল মাড়াস নি, অসুখ করবে। এই সময় পরত, ভগবান প্রভৃতি এলেন। ভগবান জিজ্ঞাসা করলে, আপনি নাকি আঁটপুর যাবেন, কবে যাবেন, বলুন? মহারাজ বল্লেন, দাঁড়া, কলকেতার নেমন্তন্নগুলো সব সেরে নি, আগে থেকে বায়না নিয়ে রেখেচি যে।

তারপরে একটু বেড়াবেন বলে আমাকে একটা লাঠি আনতে বল্লেন। তাঁর ঘর থেকে লাঠি নিয়ে এসে ছুটে গিয়ে তাঁর হাতে দিলুম। তাঁর সঙ্গ ছেড়ে চলে আসতে ইচ্ছা হচ্ছিল

না, ইতস্তত: করচি এমন সময় তিনি পেছন ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, মন ভাল আছে তো? ধ্যানজপ কেমন কচ্চিস? আমি সাহস পেয়ে বল্লুম, মনে বড় কলুষিত ভাব আসে, এর কিছু করতে পারচি না। তিনি বল্লেন, অমন এসময়টা হয়ে থাকে; ভাবচিস কেন, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। স্বামিজীর মন্দিরের কাছাকাছি এসে বল্লুম, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? তিনি উল্লসিত চোখে তাকিয়ে বল্লেন, কী, বল্ না। 'আপনি আপনার ছেলেদের কিরকম হতে দেখতে চান?' '(হাসতে হাসতে) কেন বল্ তো?' 'একএক সময় মনে হয়, আপনার মুখ থেকে শুনে আপনি যেমনটি চান তেমনটি হবার চেষ্টা করতে বেশ জোর পাব।' '(হাসতে হাসতে) আচ্ছা, আর একদিন জিজ্ঞেস করিস, বলে দেব। এখন বৃহস্পতিবারের বারবেলা। আর তো দুএক দিনের মধ্যেই কলকেতা যাচ্চি; তখন একদিন জিজ্ঞেস করিস।' সেদিন আর অদৃষ্টে হল না।

তিনি স্বামিজীর মন্দিরের নির্মাণ কার্য দেখতে লাগলেন। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছি আর প্রাণমন ভরে সেই দেবদেহের সৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করচি। ফিরে এসে বল্লেন, আজ এখানে থাকবি? আমি বল্লুম, থাকতে পারি, হ্যাঁ থাকব। 'তবে যা, গেষ্ট হাউসের ছাদে একটু বসগে যা; বেশ জায়গা; নিজের জপধ্যান করগে যা।'

ঘন্টাখানেক পরে ছাদ থেকে নেমে এসে মঠের দিকে যাচ্চি, পথে ভবানী মহারাজের সঙ্গে দেখা। তিনি হেসে বল্লেন, পরেশকে যে মহারাজ যত্ন করার কথা বলছিলেন—বল্লেন, একটু লাজুক প্রকৃতির ছেলে, খাবার শোবার কষ্ট না হয় দেখিস। একটা দিব্য তৃপ্তি অনুভব করলুম। রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত মহারাজের ঘরের বারান্দায় তাঁর সম্মুখে বসে নানা প্রসঙ্গ শুনতে লাগলুম। বিজ্ঞানানন্দস্বামী, সুধীর মহারাজ, জিতেন মহারাজ, নারায়ণ আয়েঙ্গার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। খেয়ে এসে দেখি, অভেদানন্দজী তাঁকে বাইনোকুলার দিয়ে আকাশের তারা দেখাচ্চেন।

পরদিন প্রাতে তাঁকে প্রণাম করতেই বল্লেন, কোন কষ্ট হয় নি তো রে? কিছুক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞেস করলেন, পরেশ, আজ কি যেতে হবে?—অফিস আছে? আমি বল্লুম, হ্যাঁ মহারাজ। তাঁর পদধূলি নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চলে এলুম।

এর সাতদিন পরেই কলকাতায় তাঁর রোগের সূত্রপাত হয়। সেইদিন সকালের দিকে আমি তাঁকে দর্শন করতে যাই। তিনি তখন প্রাতর্ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেচেন, হাতমুখ ধুইচেন। ঘরে ঢুকে প্রণাম করতেই স্মিতমুখে আশীর্বাদ করে বল্লেন, শরীরটা কিছুতেই ভাল থাকচে না, পরেশ, যা তোরা বাইরে বোস্, আমি শুয়ে পড়ি। ভূমানন্দস্বামীকে বল্লেন, জ্ঞান, দরজা দিয়ে দাও। রাত্রে খবর পেলুম তাঁর কলেরা হয়েচে।

—শ্রীপরেশনাথ সেনগুপ্ত

## শ্রীমতী রানুকে লিখিত কয়েকখানি পত্র

(১)

অদ্বৈত আশ্রম, লাক্‌সা, বেনারস সিটি

৩১।১।২১

...গতকাল ভোরে ২২ জন সন্ন্যাস এবং ১৫ জন ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করিয়াছে। ৺বিশ্বনাথের কৃপায় সকল কাজগুলি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। একটি বেশ সুন্দর দৃশ্য হইয়াছিল।

হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ, যোগীন-মা প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন।

(২)

শ্রীশ্রীগুরুদেব ভরসা ৺কাশীধাম

১২।২।২১

পরমকল্যাণীয়া শ্রীমতী রানু,

তোমার পত্র পাইয়া সকল সংবাদ অবগত হইয়াছি।...আজ ৩।৪ দিন হইল সর্দি ও কাশি হইয়া শরীরে জড়তা আনিয়াছিল, এখন সে ভাবটি অনেক কাটিয়া গিয়াছে।

তিথিপূজার [ মহারাজের জন্মতিথির ] আগের রাত্রে উভয় আশ্রমের সাধু ব্রহ্মচারীরা ঠাকুরের প্রসাদ সব একসঙ্গেই পাইয়াছিল, যথা,—লুচি, তরকারি, ডাল, পায়স, পানতুয়া। মোটামুটি উৎসব সেইদিন হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। রাত্রে ভজনও হইয়াছিল। পরদিন ভোরে ঠাকুরের বাল্যভোগ, যথা—মাখন আধসের, তদুপযুক্ত মিছরি এবং সন্দেশ এক সের ভোগ হইয়াছিল। বেলা প্রায় ১০টার সময় নানাফল, মিষ্টান্ন, সিঙ্গাড়া, কচুরী দিয়া জলখাবার ভোগ হইয়াছিল এবং তাহাই সকলকে ঠোঙ্গায় করিয়া বিতরণ করা হইয়াছিল। পরে বেলা ১২৷৹টায় সময় ভোগ, যথা—পোলাও পঁচিশ সের চালের, লুচি, হিঙ্গের কচুরী, এঁচোড়ের কালিয়া, কপির ডালনা, আলু-কড়াইশুঁটির ঘুগনি, চাটনি, পায়স, দই, খাজা, লেডিকেনি, সন্দেশ, ক্ষীরের দ্রব্য ৬০ প্রকার, পিঠে ইত্যাদি তাহাও প্রায় ২০ প্রকার, নিমকির দ্রব্য ১৪ প্রকার, অপরাপর যে কত প্রকারই না হইয়াছে তাহা আর কত লিখিব —সবশুদ্ধ প্রায় দুইশত প্রকার ভোগ দেওয়া হইয়াছিল। পুরুষভক্ত প্রায় ১৭৫ এবং স্ত্রীভক্তও প্রায় ৪০ জনকে বসাইয়া সকল দ্রব্য তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করান হইয়াছে। গান-বাজনাও হইয়াছিল। রাত্রে মায়ের একখানি নয়পোয়া প্রতিমা আনাইয়া পূজা হইয়াছিল।

—পূজক শর্বানন্দ, বেশ ভক্তির সহিত পূজা করিয়াছে। পূজান্তে ভোরে ৪ জন ব্রহ্মচারী বিরজাহোম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। পরদিন বেলা প্রায় ৯টার সময় তিনটি কুমারীপূজা হইয়াছিল। একটি আমার, একটি তোমাদের, অপরটি ডাক্তার কাঞ্জিলালের। তাহার কুমারী সেই পূজা করিয়াছিল, অপর দুইটি শর্বানন্দ। পূজান্তে কুমারীদের একটাকা করিয়া দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছিল। বৈকালে প্রতিমাখানিকে ব্যাণ্ড বাজাইয়া গঙ্গায় লইয়া যাওয়া হয়, তথায় একখানি বেশ বড় বজরায় করিয়া মা'কে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করাইয়া সন্ধ্যার পর বিসর্জন দেওয়া হইয়াছিল। ঠাকুরের কৃপায় সমস্ত কাজটি সুচারুভাবে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূজার দিন এখানকার বিখ্যাত নহবৎ ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছিল—নানা রাগরাগিণী আলাপ করিয়া তাহারা সকলকে আনন্দ দিয়াছে।···

এখান হইতে যাইবার দিন ২৭শে ফেব্রুয়ারী স্থির হইয়াছে। অন্যান্য সকল সংবাদ ভাল। আমার শুভাশীর্বাদ জানিও। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—ব্রহ্মানন্দ।

( ৩ )

শ্রীশ্রীগুরুদেব ভরসা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ময়লাপুর, মাদ্রাজ
২।৫।১৯২১

কল্যাণীয়া রানু,

······তুমি রসম এবং কড়ম্বর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। রসম এদেশের একটি পানীয়, কি গরীব কি বড়লোক প্রত্যহ দুই বেলাই খাইয়া থাকে। ইহা উপকারী, দাঁতটি পরিষ্কার রাখে, ইহাতে লঙ্কাবাটা ও লঙ্কাফোড়ন বেশী পরিমাণে থাকে; কিন্তু আমাদের এখানে বেশী লঙ্কা দেওয়া হয় না। রসম ছয় প্রকার, যথা,—পরপো রসম, অর্থাৎ ডালের জল লইয়া তেঁতুল দিয়া পানীয় তৈয়ার করে। জিরগ রসম—জিরে দেওয়া তেঁতুলগোলা জল। মেন্দী রসম—মেথী ফোড়ন দেওয়া তেঁতুলগোলা জল। মড়গ রসম—গোলমরিচ, তেঁতুলজল। ইহা রোগীদের প্রথমে পথ্য দেয়। বেপন্ত রসম—নিমফুলের সঙ্গে মসলা দেওয়া তেঁতুলজল। এবং ধনিয়া রসম—ধনে ফোড়ন দেওয়া তেঁতুলজল। ইহা সকল আহারের শেষে গরম গরম খাইতে হয়, খাইতে বেশ মুখরোচক।

কড়ম্ব—২।১ প্রকারের; ডালের সঙ্গে মসলা দেওয়া, তেঁতুল দেওয়া, এবং তরিতরকারি দেওয়া থাকে। ইহাও লোকে নিত্য খাইয়া থাকে। সকলেই লঙ্কা বেশী খাইয়া থাকে। আমাদের মঠে অল্পে কাজ সারিয়া লয়।

হাঁ, ঈশ্বর আমার সঙ্গে আসিয়াছে এবং ভাল আছে। আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—ব্রহ্মানন্দ।

( ৪ )

বুল টেম্পল রোড, বাঙ্গালোর সিটি

২২।৮।১৯২১

...আমার ১৪ই তাঃ লেখা পত্র তুমি ১৮ই পাইবে। কারণ, সেইদিন আমরা এখানে আসিয়াছি বটে, কিন্তু পত্রখানি লিখিয়া পোষ্ট করিতে দেরী হইয়া যায়।...

তোমার মায়ের স্বপ্নের কথা যাহা লিখিয়াছ ঠিক ঐপ্রকার আমি মাদ্রাজে থাকিতে ভবানী ইত্যাদিকে বলিয়াছিলাম যে—চল, মাদ্রাজ আর ভাল লাগিতেছে না, ভুবনেশ্বরে যাই। দেখ, কত পূর্ব্বে আমি একথা বলিয়া দিয়াছি। এখন বল আমায় কি খাওয়াবে?

( ৫ )

বাঙ্গালোর সিটি

২৬।৮।১৯২১

...আজ ৺জন্মাষ্টমী বলিয়া ঠাকুরের নানাবিধ সামান্য প্রকারের ভোগ হইয়াছিল। সামান্য প্রসাদও আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। তা ছাড়া আজ হবিষ্যান্ন খাইয়াছি। আগে আগে উপবাস করিতাম, এখন করিতে পারি না, তাই হবিষ্যান্ন খাই। বলে—যাহারা উপবাস করিতে অক্ষম, হবিষ্যান্ন করিলেই কাজ হয়।

হরি মহারাজের আজ সংবাদ পাইয়াছি যে ঘা-টি তাঁহার অনেক ভাল। ইহা শুনিয়া বড় আনন্দ হইল, তাঁহার এই প্রকার অবস্থা শুনিয়া বড় ভাবিত হইয়াছিলাম।

( ৬ )

বাঙ্গালোর সিটি

৩০।৮।১৯২১

...মহাপুরুষ ও ঈশ্বর মাইসোর হইতে ফিরিয়াছেন। তাঁহারা তথায় ৫ দিন ছিলেন। মহারাজ এবং যুবরাজের সঙ্গে মহাপুরুষের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তাঁহারা আলাপাদি করিয়া বড় আনন্দ পাইয়াছেন।

দাদা এবার যে আমার্কে পত্র দিয়াছেন তাহাতে আমার পূর্ব পত্র পাঠ করিয়া আমায় বড় সার্টিফিকেট দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন: "এমত চিঠি লিখিতে কেহই পারিবে না ও কেহ দিতেও জানে না। আপনি রসময় ও রসিকশেখর এবং সর্বজ্ঞ রসিকচূড়ামণি। প্রভুদেবের অপার করুণা আপনাতে সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছে, তাই আপনার তুলনা আপনাতেই। সাধারণ হইতে একেবারেই তফাৎ।" এখনও এ পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, শীঘ্রই দিব।*

আজকাল এখানে রামনামের শেষে নূতন এই কয়টি পদ যোগ করা হইয়াছে: ভয়হর মঙ্গল দশরথ রাম।...পতিতপাবন জয় সীতারাম॥

রবিবার দিন আশ্রমে জন্মাষ্টমীর জন্য প্রতি বৎসর ছোটখাট একটি করিয়া উৎসব যেমন হইয়া থাকে তাহা হইয়াছিল। অনেকগুলি ভক্ত আসিয়াছিল। ভজন, রামনাম ইত্যাদি হইয়া শেষে প্রসাদ বিতরণ হয়।

(৭)

ময়লাপুর, মাদ্রাজ
২২।১০।১৯২১

...দাদার সঙ্গে রোজই প্রায় খুব রঙ্গরহস্য হয়, তিনি খুব আনন্দে থাকেন। গান রোজই সন্ধ্যার সময় হয়।...

গতকাল শাঁখারীটোলার ঠিকানায় বুড়ীকে এক রঙ্গরহস্য করিয়া পত্র দিয়াছি। বুড়ী পড়ে রাগ করলে, না আনন্দ করলে বা কি বললে—জানিও ও জানাইও।

(৮)

ভুবনেশ্বর
২২।১১।২১

...গতকাল রাত্রি প্রায় ১২টার সময় আমরা সকলে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। অনেকটা রাস্তা একটানা আসিয়াছি বটে, কিন্তু কাহারও কোনপ্রকার কষ্ট হয় নাই। মাদ্রাজ হইতে এখান পর্যন্ত একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ী রিজার্ভ করা হইয়াছিল, তাহাতে ৫ জন ছিলাম। বাকি ৯ জন থার্ড ক্লাশে আসিয়াছে। মাদ্রাজ হইতে রাত্রে রওনা হইয়া পরদিন

---

*বাঙ্গালোর হইতে রামলালদাদাকে মহারাজ ৺বিজয়ার পত্র (১৯।৬) লিখিতেছেন: 'দাদাগো, তোমার জন্য কোলা ব্যাঙ আর কুলি বেগুন পাঠাইলাম, অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিবে।' [ কৃষ্ণময়ী দেবী হইতে প্রাপ্ত ]

সকালে রাজমহেন্দ্রীতে আসিলে ভক্তরা আসিয়া কফি, লুচি ইত্যাদি দিয়া যায়। তখন বেলা ৭টা হইবে। পরে ৯৷৷০ টার সময় কোকনদের একটি ভক্ত গাড়ীতে সকলের জন্য অপর্যাপ্ত পরিমাণে ভাত ইত্যাদি সকলপ্রকার দ্রব্য দিয়াছিল। সময় মত চারটি ভাত খাওয়াতে সকলেরই শরীর ভাল ছিল। পরে রাত্রি প্রায় ৭৷৷০টার সময় বহরমপুর ষ্টেশনে ভক্তরা আসিয়া নানাপ্রকার খাবার দিয়া যায়।...সঙ্গে আসিয়াছেন—মহাপুরুষ, দাদা, বাঙ্গালোরের নারায়ণ আয়েঙ্গার, ঈশ্বর, সূর্য, ভবানী, আরও ৭জন—তুমি তাহাদের চেন না।...

আমার শরীর বেশ ভাল আছে। অন্যান্য সকল সংবাদ ভাল। আমার ভালবাসা আশীর্বাদ জানিও। ইতি— শুভানুধ্যায়ী—ব্রহ্মানন্দ।

## মহারাজ ও বৈষ্ণব গোস্বামী

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের কতিপয় তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া, ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে, শান্তিপুরে হরিশ্চন্দ্র ভাগবতভূষণের সঙ্গে দেখা করি। তিনি তখন অদ্বৈতবংশীয় গোস্বামিপ্রভুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। লেখককে তিনি বলিয়াছিলেন: ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্বে একদিন ভোরবেলা স্বপ্ন দেখি, পরমহংসদেব আমাকে বলিতেছেন, গোস্বামী, আমাকে ভাগবত শোনাও। আমি জানিতাম, পরমহংসদেব দেহরক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং কেমন করিয়া তাঁহাকে ভাগবত শুনাইব ভাবিতে লাগিলাম। হঠাৎ মনে হইল, বেলুড় মঠে তাঁহার প্রতিকৃতি রহিয়াছে, উহারই সম্মুখে পাঠ করিব। এইরূপ স্থির করিয়াই আহারাদি সারিয়া কলিকাতায় এক শিষ্যের বাড়ীতে চলিয়া গেলাম এবং তথা হইতে সন্ধ্যায় মঠে আসিলাম। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, আদর করিয়া ডাকিয়া নিলেন ও একহাঁড়ি রসগোল্লা আনাইয়া খাওয়াইলেন। তিনি পূর্বে শান্তিপুরে ৺মদনগোপাল-দর্শনে আসিয়াছিলেন। স্বামিজীর ভাই মহিমবাবু ও শিষ্য শরৎ চক্রবর্তী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, শরৎবাবু দৈবপ্রেরিত হইয়াই যেন ঠাকুরকে ভাগবত শুনাইতে অনুরোধ করিয়া বসিলেন।* পরদিন ঠাকুরের জন্মমহোৎসব। সেই মহোৎসব-প্রাঙ্গণে, ঠাকুরের তৈলচিত্রের সম্মুখে, বেলা ৯টা হইতে প্রায় তিনঘণ্টা বসুদেবের কংসের প্রতি তত্ত্বোপদেশ যে অংশে আছে ভাগবতের সেই অংশ ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলাম। উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমেরিকার ব্রহ্মচারী গুরুদাসও ছিলেন এবং হাসিমুখে স্তুতি সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

*মহারাজের ইচ্ছাশক্তি এইরূপে অপরের ভিতর দিয়া কার্য করিত

# এই গ্রন্থ সম্বন্ধে

"বাংলা জীবনীসাহিত্যে—বিশেষভাবে জননী সারদাদেবীর প্রথম জীবনীকাররূপে লেখক চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথায় তাঁর লেখনীর সরল অথচ গভীর বক্তব্য নিবেদনের ভঙ্গীটিও পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করবে। বিভিন্ন কাহিনী স্মৃতিকথা ও পত্রাবলীর সমন্বয়ে লেখক ব্রহ্মানন্দ মহারাজের শিশুসুলভ সরল অন্তর, সহজ কৌতুকপ্রবণতা, দিব্য অন্তর্দৃষ্টি, সহজাত নেতৃত্বশক্তি এবং এসব কিছুর ঊর্ধ্বে তাঁর লোকপাবনী অধ্যাত্মশক্তির অমেয় মহিমার সার্থক পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন।" —উদ্বোধন

"আলোচ্যগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় গ্রন্থকারের মহাপুরুষগণের জীবনের মর্মবাণী উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য। পাণ্ডিত্যের গভীরতা এবং বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতা যত অধিকই হউক না কেন, তদ্দ্বারা মহাপুরুষগণের দুরবগাহ অনুভূতির নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু গ্রন্থকার তাহার নাগাল পাইয়াছেন।...সাধন সহায়ে তাঁহার বুদ্ধির স্বচ্ছতা, যাহাকে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি বলা হয়, তাহারই অধিকারী তিনি। রাখাল মহারাজের জীবনের যেসকল গুহ্যাতিগুহ্য রহস্য তাঁহার ব্যাখ্যায় পরিস্ফূর্তি লাভ করিয়াছে তাহার তুলনা বিরল।" —শ্রীসুদর্শন

"রামকৃষ্ণলীলার পার্ষদদিগের সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহে ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য তাঁহার পূর্ব পূর্ব গ্রন্থে যে সতর্ক ও অনাড়ম্বর তথ্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন আলোচ্য গ্রন্থে তাহা অক্ষুণ্ণ আছে। ...ব্রহ্মজ্ঞান এবং উপলব্ধিতে যাঁহার ব্যক্তিত্ব দুরবগাহ এবং সমুদ্র অপেক্ষাও অতলস্পর্শী তাঁহাকে সাধারণতঃ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে সকলে দেখিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে তিনি দূরের মানুষ। লীলাসুলভ আচরণে যখন তাঁহাকে আমরা পাই তখন তিনি আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ। আলোচ্য গ্রন্থখানির কথাসংগ্রহে 'মহারাজ'কে আমাদের কাছে আনিয়া দিয়াছে। এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়া সাধারণ সংসারী মানুষ মহারাজের উপদেশ ও শিক্ষা আপনাদের জীবনে ও আচরণে গ্রহণ করিতে পারিবে।

"গ্রন্থখানির আর একটি বিশেষ মূল্য আছে।...রামকৃষ্ণসংঘের ইতিহাস রচনার উপাদান ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।...লোকোত্তর পুরুষ হিসাবে মহারাজের স্থান কেবল সংঘে নহে, দেশের সমসাময়িক ইতিহাসে অতি উচ্চে।" —জনসেবক

ব্রহ্মানন্দ-শিষ্য, ভাষাবিৎ পণ্ডিত পি শেষাদ্রি : "...How happy I am to get your valuable gift, 'Brahmananda Lila Katha', which I got last noon. I read it through at one sitting, as it was so very charming and sweet. You have succeeded, in this most difficult work, remarkably well and you have made the almost impossible, possible···I felt entranced while reading many portions and the living presence of Sri Maharaj was evident through out. Blessed, blessed indeed are you...It is a most fitting memorial for the centenary celebration···"